যাযাবর

প্রণীত

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

কলকাতা

প্রথম মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৫৩

প্রথম প্রকাশ—পৌষ, ১৩৫৩

দ্বিতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৪

সাড়ে তিন টাকা

প্রচ্ছদপট —পি, দেব

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে

জে, এন, সিংহ রায় কর্তৃক প্রকাশিত

২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলকাতা-১

আর্থিক জগৎ প্রেস, ১২২, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বাগচী কর্তৃক মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের বিশ্বাস, 'দৃষ্টিপাত' বাংলা সাহিত্যের প্রথম বেলে-লেটার্স,—Belles Lettres। এর আগে বাংলায় ঠিক এই ধরণের কোন বই বেরিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

খণ্ডিতাকারে এই রচনাটি মাসিক বসুমতীতে বেরিয়েছিল। ১৩৫২ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকরূপে ১৩৫৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম এগারোটি পরিচ্ছেদ এবং ১৩৫৩ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় তেরো ও চৌদ্দ পরিচ্ছেদ দু'টি ছাপা হয়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদটি এই বইতে নতুন যোগ করা হয়েছে। যে-পত্র সমষ্টি থেকে এই শেষোক্ত পরিচ্ছেদটি সংকলিত, মাঝখানে তা হারিয়ে যাওয়ার ফলে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করা যায়নি।

এই পুস্তক প্রকাশে আমরা যাঁর কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী, অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেই তাঁর নাম প্রকাশে বাধা আছে। তাঁর ব্যক্তিগত পত্রগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে সেই আত্মগোপন-ইচ্ছুক মহিলা আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন।

গত এক মাস ধরে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের ফলে কলকাতায় মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মে বিশৃঙ্খলার শেষ নেই। তাতে পুস্তক মুদ্রণকার্যেও বহু বাধা বিঘ্ন ঘটেছে। সংকলয়িতা ও আর একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা যে-সহায়তা পেয়েছি, তার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সর্বদা উৎসাহ এবং পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বইয়ের আগাগোড়া প্রুফ দেখে দিয়ে যাঁরা এ-সময়ে এই পুস্তক প্রকাশের পথ সুগম করেছেন, শুধু মামুলী ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের সেই বন্ধুঋণ পরিশোধ করা যাবে না বলেই তাঁদেরও নামোল্লেখে বিরত রইলাম।

পুস্তকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিহিত বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

মহালয়া, ১৩৫৩ — নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

'দৃষ্টিপাতে'র প্রথম সংস্করণ গত ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ উহা প্রকাশের তিন মাস মধ্যেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়। কিন্তু কাগজের অভাব, ছাপাখানার বিভ্রাট, ধর্ম্মঘট ও সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ইত্যাদির ফলে এতদিন উহার পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা যায়নি। তা' ছাড়া, যে সকল কারণে প্রথম সংস্করণ ছাপাখানার জঠরমুক্ত হয়েও প্রায় দু' মাস বাজারে বের হতে পারেনি—প্রচ্ছদপরিকল্পনা, ব্লক নির্ম্মাণ, বাঁধাই-সমস্যা প্রভৃতি—সেগুলি এখনও অল্প বিস্তর বর্ত্তমান আছে। সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত হ'লেও এই বিলম্বের জন্য বাঙ্গালী পাঠক সমাজের কাছে, বিশেষতঃ যাঁরা পত্রদ্বারা এই বইটির দ্রুত পুনঃপ্রকাশের জন্য একাধিকবার তাগিদ দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সকলেই জানেন, সম্প্রতি বাংলা মুদ্রণব্যয় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে; পুস্তক প্রকাশের অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয় ও অনেক বেড়েছে। তাই নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এই সংস্করণে 'দৃষ্টিপাতে'র দাম সামান্য কিছু বাড়াতে হলো।

আষাঢ়, ১৩৫৪ — নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

সংকলয়িতার নিবেদন

এই রচনাটির একটু ভূমিকা আবশ্যক।

১৯৩৬ সালে একটি বাঙালী যুবক লণ্ডনে ব্যারিস্টরি পড়িতে যায়। যুদ্ধ স্থুরু হওয়ার পরে গাওয়ার স্ট্রিটের ভারতীয় আবাসটি জার্মান বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইলে আত্মীয়বর্গের নির্বন্ধাতিশয্যে যুবকটি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে। সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আলোচনার প্রাক্‌কালে বিলাতের একটি প্রাদেশিক পত্রিকা তাহাকে তাঁহাদের নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে পাঠান। লণ্ডনে অবস্থানকালে ঐ পত্রিকায় সে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিত।

দিল্লীতে যাইয়া যুবকটি তাহার এক বান্ধবীকে কতগুলি পত্র লেখে। বর্তমান রচনাটি সেই পত্রগুলি হইতে সংকলিত। পত্রলেখক ও পত্রাধিকারিণীর একমাত্র একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ ব্যতীত পত্রগুলির আর কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই, যদিও পত্রে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের যথার্থ পরিচয় গোপনের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম ধামের পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়াছে।

এই স্বল্পপরিসর পত্ররচনার মধ্যে লেখকের যে সাহিত্যিক প্রতিভার আভাস আছে, হয়তো উত্তরকালে বিস্তৃততর সাহিত্যচর্চার মধ্যে একদা তাহা যথার্থ পরিণতি লাভ করিতে পারিত। গভীর পরিতাপের বিষয়, কিছুকাল পূর্বে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার অকালমৃত্যু সেই সম্ভাবনার উপরে নিশ্চিত যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

দৃষ্টিপাত

দৃষ্টিপাত

এক

সাত ঘণ্টা আকাশচারণের পরে উইলিংডন এয়ারপোর্টে ভূমি স্পর্শ করা গেল। বিমানঘাঁটিটি আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু গুরুত্বে প্রধান। পূর্ব গোলার্ধে যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর থেকে ইঙ্গ মার্কিণ ও চৈনিক সমর-বিশারদদের এটা আগমন ও নিক্রমণের পাদপীঠ। প্রাত্যহিক পত্রিকার সংবাদস্তম্ভে এর বহুল উল্লেখ।

আমাদের বাহনটি ডগ্‌লাস্‌ ডাবল-এঞ্জিন জাতীয়। খেচর কুলপঞ্জীতে ফ্লাইং ফোর্ট্রেস ও লিবারেটার প্লেনের পরেই এর স্থান। নিকষ না হলেও ভঙ্গ-কুলীন বলা যেতে পারে। এর আকার বিশাল, গর্জন বিপুল ও গতি বিদ্যুদ্‌প্রায়। পুরাণে পুষ্পকরথের কথা আছে। তাতে চেপে স্বর্গে যাওয়া যেত। আধুনিক বিমান রথের গন্তব্যস্থল মর্তলোক। কিন্তু সারথি নিপুণ না হলে যে-কোন মুহূর্তে রথীদের স্বর্গপ্রাপ্তি বিচিত্র নয়।

বিমানঘাঁটির কর্মকর্তা বাঙালী। ভদ্রলোক বয়সে তরুণ এবং ব্যবহারে অমায়িক। এর স্ত্রী মণিকা মিত্রের সৌন্দর্য-খ্যাতি নয়াদিল্লীর অনেক বঙ্গ ললনার মর্মবেদনার কারণ।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মাটিতে নামতে হয়। বিস্ময়কর এক অনুভূতি। এই তো সকাল বেলায় ছিলাম কলকাতায়। দমদমের পথে গ্যাসের অলোগুলি সব তখনও নেভেনি। ফুটপাথে খাটিয়ার উপরে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানী দোকানদারেরা নিদ্রামগ্ন, কর্পোরেশনের উড়ে কুলীরা জলের পাইপ থেকে গঙ্গোদকের

দ্বারা রাজধানীর বহুজনমর্দিত পথগুলির ক্লেদমুক্তির আয়োজনে ধাবমান; সাইকেলের হাতলে স্তূপীকৃত খবরের কাগজ চাপিয়ে হকাররা যাচ্ছে এ দুয়ার থেকে ও দুয়ার।

সদ্য গত রজনীর সুষুপ্তির রেশ ধরণীর বুক থেকে তখনো নিঃশেষে মুছে যায়নি। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডিত চাঁদ দূরবর্তী তরুশ্রেণীর শীর্ষে রুগ্না রমণীর নিষ্প্রভ মুখের মতো দ্যুতিহীন। মিট্ মিট্ করে জ্বলছে গুটি কয়েক মুমূর্ষু তারা। পথের পাশে গাছের ডালে ডালে পাখীদের কাকলী সুরু হয়েছে ধীরে ধীরে। দমদম বিমানঘাঁটির দূরবর্তী পাটকলের উত্তুঙ্গ চিম্‌নীটা আকাশের পটে আঁকা আবছা ছবির মত দেখাচ্ছে। বিমান কোম্পানীর সাদা ধবধবে য়ুনিফর্ম পরিহিত শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা টিকিট পরীক্ষা ও মাল ওজন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্তসমস্ত। দূরে বারাসতের রাস্তা দিয়ে চলেছে সারিবন্দী মন্থরগতি গরুর গাড়ি, বাতাসে ভেসে আসছে তাদের তৈলতৃষিত চাকার ক্ষীণ আর্তনাদ।

দেড়টা বাজতেই নয়াদিল্লী। মাঝে শুধু বামরৌলীতে ঘণ্টা খানেকের বিশ্রাম,—প্রাতরাশের প্রয়োজনে। ব্যবস্থা থাকলে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পুনরায় দিল্লী থেকে সন্ধ্যা নাগাদ কলকাতায় ফিরে মেট্রোতে সিনেমা দেখা যায়। রেলযোগে প্রায় দেড় দিনের পথ। দূরকে নিকট এবং দুর্গমকে সহজাধিগম্য করেছে যে-বিজ্ঞান, তার জয় হোক।

মনে আছে শৈশবের কথা। দুপুরে গৃহকর্তারা কর্মস্থলে। আহারাদির পরে প্রাত্যহিক দিবানিদ্রার অব্যর্থ ঔষধ বঙ্কিমের উপন্যাস হাতে মা পাশের ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শয়ান। তাঁর সেই স্বল্পায়ু বিশ্রামক্ষণটি যাতে চপলস্বভাব বালকের সশব্দ দৌরাত্ম্যে খণ্ডিত না হয় সেজন্য পিতামহী নাতিকে নিয়ে বসেছেন। বৃদ্ধা তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষুর উপরে নিকেলের চশমা জোড়াটা এঁটে মৃদু স্বরে পড়ছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। খানিকক্ষণ এপাশ, ওপাশ, উসখুশ করে মাথার বালিশটা নিয়ে লোফালুফির পরে হঠাৎ এক সময়ে কানে আসতো

রাবণ বসিল চড়ি পুষ্পক রথেতে।
বিদ্যুতের সম গতি আকাশ পথেতে॥

অমনি স্তব্ধ উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম। অরণ্য, পর্বত, সাগর, জঙ্গম অতিক্রম করে রথ চলেছে শূন্যপথে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো, দূর হতে দূরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। মধ্যাহ্নদিনের কর্মহীন অলস প্রহরগুলি শিশুমনের নিরঙ্কুশ কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। দশাননের সৌভাগ্যে ঈর্ষা জন্মাত। এক লক্ষ পুত্র ও ততোধিক পৌত্র সংখ্যার জন্য নয়, তার যদৃচ্ছ আকাশভ্রমণের ক্ষমতার জন্য।

সেদিনের বৃদ্ধা পিতামহী তাঁর ভক্তি, বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে দীর্ঘকাল গত হয়েছেন। তাঁরই নাতি-নাতনীরা যে অদূর ভবিষ্যতে লঙ্কাধিপতির সমকক্ষ হয়ে উঠবে সে-কথা কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দণ্ডকারণ্য থেকে স্বর্ণলঙ্কা নিকষাতনয় কয় দণ্ডে পৌঁছেছিলেন তার উল্লেখ কৃত্তিবাসে আছে কিনা মনে নেই, কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লী;—ন'শ' তিন মাইল পথ আমরা সাত ঘণ্টায় অতিক্রম করেছি। এতে উত্তেজনা আছে, কিন্তু উপভোগ নেই। কমলালেবুর বদলে 'ভাইটামিন সি' ট্যাবলেট খাওয়ার মতো।

প্রাগ্‌বিমান যুগে পথ অতিক্রমণটাই ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; নানা জনের সংস্পর্শে আসবার একটা সুপরিসর অবকাশ তাতে মিলতো। মন্দগতি গরুর গাড়ির কথা থাক; রেলভ্রমণেও মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা যোগাযোগ ঘটে, বিমানযাত্রায় তার সম্ভাবনা মাত্র নেই। যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষেও বিমান চলাচল বহুলতর হবে। রাত ন'টায় গ্রেট ইস্টার্ণে ডিনারের পর দমদমে প্লেনে উঠে পরিপাটি নিদ্রা দিলে পরদিন সকালে বম্বের তাজে ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাবে। সেদিন না থাকবে ঘুষ অথবা মুষ্টির জোরে টিকেট কেনার হাঙ্গামা, না থাকবে কুলীর কলহ বা সহযাত্রীর কোলাহল। জানালার কাছে 'চা-গ্রাম' হেঁকে কেউ ঘুম

ভাঙাবে না, পানিপাড়ে তার বালতি থেকে তৃষ্ণার্ত যাত্রীর অঞ্জলি ভরে দেবে না এবং টিনের চালার ঘুমটি ঘরের ফটক আটকে যে পয়েন্টসম্যান সবুজ নিশান দেখিয়ে গাড়ি 'পাশ' করে তারও আর দর্শন মিলবে না। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েস।

বিমানঘাঁটির বাইরে এসে দেখা গেল, যানবাহনের চিহ্নমাত্র নেই। বেলা প্রায় দেড়টা। মার্চের রৌদ্রদগ্ধ আকাশ পাণ্ডুর এবং বাতাস প্রচুর ধূলিকীর্ণ। সামনে এ্যাসফালটমের রাস্তা জনবিরল। রুক্ষ প্রান্তরের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঊর্ধ্ব অধঃ,—যে-দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে উত্তপ্ত বাতাসের একটা কম্পমান নিঃশ্বাস ছাড়া আর কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর নয়। রুদ্র বৈশাখ কথাটা এতকাল রবি ঠাকুরের কাব্যে পড়া ছিল; কিন্তু 'লোলুপ চিতাগ্নি শিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর' বলতে সত্যি যে কি বোঝায় দিল্লীর নিদাঘ মধ্যাহ্নে তারই খানিকটা আভাস পাওয়া গেল। সহযাত্রীদের সাতজন বিদেশীয়। তাদের খাকী অঙ্গাবরণে যথাযথ সামরিকগোত্রের নিঃসন্দেহ নির্দেশ। ত্রিপলঢাকা বৃহদাকার এক মোটরলরীতে মাল ও মালিকেরা একই সঙ্গে বোঝাই হয়ে অন্তর্হিত হলো।

হোটেলে স্থান নির্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং গন্তব্যস্থল অজ্ঞাত, পথ অপরিচিত অথচ ভরসা একমাত্র নিজের আদি ও অকৃত্রিম চরণযুগল। তারই শরণ নিয়ে পথে বিচরণ সুরু করব কিনা ভাবছিলাম।

"আপনি কোথায় যাবেন, চলুন, নামিয়ে দিচ্ছি।"

গভীর রাত্রিতে নিশি ডাকে বলেই ত শুনেছি। তবে কি দিনেও? না; পিছনে তাকিয়ে দেখি নিজের মোটরের দোর খুলে দাঁড়িয়ে আছেন একমাত্র বেসামরিক যাত্রাসহচর এ. এস. বোখারি,— ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের ফুয়েরার।

রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নের নিরুপায় পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হলো,—

স্বয়ং উর্বশী 'লহ লহ জীবন বল্লভ' বলে পায়ে লুটিয়ে পড়লেও বোধ হয় এত খুশি হতেম না।

সংবাদপত্র ও বেতারজগতে বোখারি সাহেবের নিন্দা ও প্রশংসা দুইই সমপরিমাণ। যদিও সরকারী সুখ্যাতির সোপানে সোপানে, দুর্গম প্রমোশনের শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর তিনি আজ সর্বাধিনায়ক। বেতার-পূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ছদ্মনামে রসরচনা দ্বারা উর্দু সাহিত্যেও একদা তিনি বহুবিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভদ্রলোক অসাধারণ বাকপটু এবং পরিহাসরসিক। লাওনেল ফিল্‌ডেন তাঁকে অধ্যাপনার ক্ষেত্র থেকে বেতার জগতে আমদানি করেন। কলেজের লেকচার রুম থেকে রেডিওর স্টুডিও। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের শিশির ভাদুড়ীর তিনি সগোত্র। শুধু তিনি একাই নন, তাঁর অনুজ জেড. এ. বোখারিও ফিল্‌ডেনের অনুগ্রহপ্রচ্ছায় অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর অঙ্গনে বাসা বেঁধেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে, এককালে ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের কৌতুক-আখ্যা ছিল, ইণ্ডিয়ান বি. বি. সি., —বোখারি ব্রাদার্স কর্পোরেশন।

নয়াদিল্লীর রাস্তাগুলি নয়নাভিরাম। ঋজু, প্রশস্ত এবং ছায়াচ্ছন্ন। মসৃণ পীচের আস্তরণ, ডাস্টবিন থেকে উপচীয়মান জঞ্জালস্তূপের দ্বারা পঙ্কিল নয়। যানবাহনের সংখ্যা পরিমিত; পদাতিকদের পক্ষে অনেকটা নিরাপদ। ভারতের অন্যান্য সহরের ন্যায় সতত সঞ্চরমান নির্ভীক বৃষভকুল এখানকার রাজপথে দৃশ্যমান নয় এবং পথপার্শ্বের কোন গৃহের অলিন্দ থেকে অকস্মাৎ তাম্বুলরাগ নিরীহ পথচারীদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। মাঝে মাঝে গোলাকৃতি ক্ষুদ্রাকার পার্ক, সেখান থেকে সাইকেলের চাকার স্পোকের মতো একাধিক পথ নানাদিকে প্রসারিত। পার্কগুলির নাম প্লেস, আকৃতি একই। উইণ্ডসর প্লেসের সঙ্গে ইয়র্ক প্লেসের তফাৎ যা, সে শুধু নামে। সবগুলিই সযত্নে রচিত এবং রক্ষিত।

রাস্তার পরিচয় আমলাতান্ত্রিক। সরকারী দপ্তরখানার পূর্বতন বহু ইংরেজ কর্মচারীদের নাম পথের প্রান্তসীমায় সুস্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত। মোগল বাদশাহ বাবরের চাইতে চীফ-কমিশনার বেলী সাহেবের নামের গুরুত্ব এখানে অধিক। তাই নুরজাহান লেন অপেক্ষা বেয়ার্ড রোড অধিকতর অভিজাত। বোঝা গেল, নয়াদিল্লীর নগরপালদের আর যাই থাক, বিনয়ের অপবাদ নেই। প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, একটি রাস্তার নামকরণ রবীন্দ্রনাথের নামে, তাঁর জীবদ্দশায়ই হয়েছে, কবির জন্মস্থানে আজও যা সম্ভব হয়নি। গাঁয়ের যোগীর পক্ষে ভিখ্ পাওয়া সত্যি সহজ নয়।

বোখারি সাহেব যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন, তার নাম কুইনসওয়ে। নামটি ভালো। বাংলা রাণীরদীঘির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নাম নিয়ে কবিত্ব করার মতো মনের অবস্থা তখন নয়। ক্ষুৎ, পিপাসা ও ক্লান্তি নামক যে ক'টি অসুবিধাজনক অবস্থা মানবদেহকে বিব্রত করে থাকে আপাততঃ তাদের নিরসন প্রয়োজন।

যুদ্ধের হিড়িকে গভর্নমেণ্টের দপ্তরখানার বিস্তার ঘটেছে অভাবনীয় বেগে। কেরানী, দপ্তরী, সাহেব সুবোয় সহরের ঘরবাড়ি পরিপূর্ণ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে আছে সেক্রেটারিয়টের বহু তিন-হাজারী, চার-হাজারী মনসবদার। নানা দিগদেশ থেকে এসেছে খবরের কাগজের রিপোর্টার। হোটেল, বোর্ডিং-হাউস সর্বত্রই এক রব,—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ বাড়ি। প্রচুর দক্ষিণা কবুল করেও সাতদিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় একটা মাথা রাখবার স্থান সংগ্রহ করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—বহুদিন মনে ছিল আশা; রহিব আপন মনে, ধরণীর এক কোণে, ধন নয়, মান নয় একটুকু বাসা। অনুমান হয়, কবি এককালে দিল্লীতে ছিলেন।

যিনি আতিথ্য দিলেন, তিনি একটা বেসরকারী কোম্পানীর স্থানীয় কর্ণধার। নিজের কর্মকুশলতায় কোম্পানীকে এখানে

সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নয়াদিল্লী সহরটা সৃষ্টি হয়েছে সরকারী প্রয়োজনে ; কপালে তার জয়পত্র আঁটা,—"অন্ হিজ ম্যাজেস্টি'স্ সার্ভিস"। জামসেদপুরকে যদি বলি স্টীল-টাউন, তবে নয়াদিল্লীকে বলা যেতে পারে স্টীলফ্রেমের টাউন। সহরের জনসংখ্যা গড়ে উঠেছে সেক্রেটারিয়টকে কেন্দ্র করে। চাপরাশী, দপ্তরী, কেরানী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আকীর্ণ এই সহরে বেসরকারী ব্যক্তিদের কল্কে পাওয়া ভার। এখানকার সম্মান ও প্রতিপত্তির উৎস থাকে ইণ্ডিয়া গেজেটের পাতার মধ্যে। যে-অল্পসংখ্যক বেসরকারী লোক এখানকার সেক্রেটারী, জয়েন্ট-সেক্রেটারী প্রভাবান্বিত সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তাঁরা যথার্থই শ্রদ্ধার যোগ্য। আমার হোস্ট সেন মহাশয় স্থানীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতির সভাপতি, কালীবাড়ির সম্পাদক, বাঙালী ক্লাবের কর্মকর্তা এবং আরও একাধিক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য।

ভদ্রলোকের আলমারিতে সারিবাঁধা 'সবুজপত্রের' বাঁধানো খণ্ড দেখে বোঝা যায় তাঁর রুচি। ভোজনপর্বে সেটা অধিকতর পরিস্ফুট হলো। শুক্তো, ভাজা, ডাল, তরকারি, মাছ, টক, ও একটু দৈ। সাধারণ ভদ্র বাঙালী পরিবারের যা প্রাত্যহিক আহার,—অতিথির জন্যও সেই ব্যবস্থা। অপরাহ্নে নারকেলের কুচি সহযোগে চিঁড়ে ভাজা বা বাড়ীতে তৈরী খানকয়েক লুচি। চায়ের সঙ্গে পান্তুয়া রস-গোল্লার সমারোহ এবং ভাতের সঙ্গে চপ-কাটলেটের বাহুল্য দ্বারা প্রত্যহই অতিথিকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা নেই যে, এ গৃহে সে একজন বহিরাগত আগন্তুক মাত্র। (সহজ হওয়ার মধ্যেই আছে কাল্চারের পরিচয় ;—আড়ম্বরের মধ্যে আছে দম্ভের। সে-দম্ভ কখনও অর্থের, কখনও বিদ্যার, কখনও বা প্রতিপত্তির।)

দুই

বৈষ্ণবকাব্যের শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে একদা 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর' বলে আক্ষেপ করেছিলেন। দিল্লীর কনট প্লেসকে বৃন্দাবনের কুঞ্জগলি বলে কোন মতেই ভুল করবার সম্ভাবনা নেই, তার পুরনারীরা কেউ বৃষভানুনন্দিনী নন। কিন্তু এখানকার শ্রীমতীরাও নিদাঘ রজনীতে ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করেছেন।

না-করে উপায় ছিল না। সমস্ত দিন ধরে মার্তণ্ডদেব এখানে যে প্রচণ্ড কিরণ বিকিরণ করেন, তাতে ঘরের ভিতরটা প্রায় টাটা কোম্পানীর অগ্নিগর্ভ বয়লারের মতো তেতে থাকে। মাথা গুঁজতে গেলে মাথা কুটতে ইচ্ছে হয়। পাখা খুলে দিলেও আগুনের হল্কা লাগে। সুতরাং বাইরে ঘুমানো ছাড়া গতি নেই।

শুধু মেয়েদের নয়, ছেলে বুড়ো বাচ্চাকাচ্চা সবারই এক অবস্থা। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনের জমিতে ঘটি ঘটি জল ঢেলে উত্তপ্ত ধরণীকে করা হয় শীতল। তার উপর খাটিয়া বিছিয়ে পড়ে সারি সারি বিছানা। দেখে মনে হয়, যেন সরকারী হাসপাতালের তিন, পাঁচ বা সাত নম্বর ওয়ার্ড। স্বামী, স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, ভাজ, পুত্র কন্যা সবাই শুয়েছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। মাথার উপরে নেই আচ্ছাদন, শয্যা ঘিরে নেই কোন আবরণ। অনভ্যস্ত চোখে হঠাৎ যেন একটু দৃষ্টিকটু ঠেকে।

কিন্তু পৃথিবীতে অন্য আর পাঁচটা নীতিবোধের ন্যায় আমাদের শালীনতা জ্ঞানটাও আপেক্ষিক। দেশাচারের দ্বারা তার রকমফের ঘটে, প্রয়োজনের খাতিরে হয় রদবদল। কলকাতার বড়বাজারের রাস্তায় দেখা যায়, খাটো কাঁচুলী আর আঠারো গজি ঘাগড়ার মধ্যপথে মেদবহুল দেহের অনেকখানি অনাবৃত রেখে অসঙ্কোচে চলেছেন

মারোয়াড়ী মহিলা। আমাদের বাঙালী তরুণীদের মধ্যে কারও মতি হবে না সে সজ্জারীতিতে। হাঁটুর ওপরে-ওঠা স্কার্ট পরে ইংরেজ ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা যাচ্ছে যত্র তত্র। কিছু খারাপ লাগছে না তো চোখে। অথচ আমাদের অতি-আধুনিকাদের মধ্যেও কোন দুঃসাহসিকা তাঁর ক্রেপ শাড়ির ঝুল পায়ের গোড়ালি থেকে জানু পর্যন্ত উন্নীত করতে পারবেন না। যদি বা পারেন, লজ্জায় চোখ তুলে তাঁর দিকে কেউ তাকাতে পারব না।

একই বস্তু কেমন করে শুধু মাত্র আবেষ্টন, ভাষা ও পরিবেশের তফাতে শ্লীল এবং অশ্লীল ঠেকে তার আরও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আছে সিনেমায়। শ্বশুর, ভাসুর, পুত্রবধূ ও কন্যা-জামাতা একসঙ্গে মেট্রোতে বসে গ্রেটা গার্বো ও চার্লস বোয়ারের দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন আর আলিঙ্গন দেখতে যাঁরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকার নিরামিষ প্রণয় নিবেদন দৃশ্য তাঁদেরই অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে দেখেছি। শরীরতত্ত্বের আলোচনায় যে-কথা বাঙলায় বলতে বাধে, ইংরেজীতে তা' নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে তর্ক করা হয় অনায়াসে।

গরমকালে ঘরে শুলে যে-দেশে জ্বরে ধরে, সে-দেশে মেয়ে পুরুষকে বাইরে ঘুমোতেই হয় এবং তিন-চারটে করে আলাদা উঠান যখন শতকরা নিরানব্বুই জনের বাড়িতে রাখা সম্ভব নয়, তখন শ্বশুর, জামাতা, মা ও মেয়ে এক জায়গায় খাট না বিছিয়েই বা করে কী? নয়াদিল্লীটা সার্বজনীন শহর। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চি, কোশল থেকে এখানে ঘটেছে জনসমাগম। আহারে তারা যদি বা নিজ নিজ রুচিকে রেখেছে বজায়; শয়নে মেনে নিয়েছে একই নীতি। পাঞ্জাবী মেয়েদের বসন এ রকম কমিউনিটি শ্লিপিংএর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোড়ালির কাছে আঁট পায়জামা। শিথিলবন্ধন শাড়ীর মতো অলক্ষ্যে নিদ্রিত দেহের উপর অবিন্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই!

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল সে হচ্ছে ফিরিওয়ালার ক্যাভেলকেড্। দুধ, সব্জি, মাছ, মাংস, ডিম, সবই এখানে ঘরে বসে পাওয়া যায়। পসারিণী যদিও বা নেই, পসরা আসে দরজায়। মাথায় চেপে নয়, সাইকেলে। ঐ জিনিষটা এখানে অসংখ্য। কলকাতায় সাইকেল চাপতে দেখি খবরের কাগজের হকারকে। কিন্তু নয়াদিল্লীতে গয়লা, ধোবা, নাপিত, জেলে, কসাই, ব্লাউজের ছিট, গায়ের সাবান-বিক্রেতা আসে সাইকেলের পিছনে মস্ত ঝুরি বা বাক্স চাপিয়ে। মহানগরীর সওদাগরেরাও পদাতিক নয়।

প্রভাতে উঠিয়া যে-মুখ দেখিনু, তার বেসাতি দুধ। ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো হাড়গোড় বেরকরা জীর্ণদেহ সাইকেল, তার পিছনের ক্যারিয়ারে দুপাশে বাঁধা দুধের দুটি টব। টিনের তৈরী, তলায় জলের কলের মতো ট্যাপ, ঘোরালে দুধ বেরোয়। সামনের হাতলে ঝুলছে অনুরূপ গুটি দুই পাত্র। আশ্চর্য বহন ও চলন-ক্ষমতা এই দ্বিচক্ররথের। আশ্চর্যতর তার চাকা, চেন ও দুগ্ধভাণ্ডের সম্মিলিত ঐক্যতানবাদন। টিনের টবগুলির উপরের দিকে ঢাকনি আছে, তাতে তালা আঁটা। বলা বাহুল্য দুগ্ধের বিশুদ্ধতা এবং গয়লার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ক্রেতাকে আশস্ত করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা অসাবধানী লোকের ছাতায় ঘটা করে নাম লেখার মতো। নীরং ত্যক্ত্বা ক্ষীরং গ্রহণ করতে হলে পাঁচ সের দুধকে দু'সেরে দাঁড় করাতে হয়।

গয়লার পরে "কলকাত্তাকা হিল্‌শা লো, করাচীকা চিংড়ি" হাঁক দিয়ে এলো মাছওয়ালা। বলা বাহুল্য, সে-ইলিশ বেশীর ভাগই বঙ্গজ নয়, এলাহাবাদের। তবে অনেক মানুষের মতো তারাও চেহারায় সব সময়ে ধরা পড়ে না, পড়ে স্বাদে। মাছওয়ালার সাইকেলের পিছনে ঝুড়ির উপরে মিহি জালের আবরণ, মাছির অত্যাচার নিবারণের জন্যে।

সব্জিওয়ালা আসে একে একে। কেউ হাঁকে লেউকী লো, কেউ

হাঁকে পালং অথবা গোবী। কারো বা ঝুড়িতে আছে টিমাটো, ভিণ্ডি, হরা ধনিয়া এবং সীতা ফল অর্থাৎ কুমড়ো। রজক বাইসিকেলের পশ্চাতে যে পর্বতপ্রমাণ কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে আসে তা দেখে ত্রেতাযুগের পবননন্দনেরও বিস্ময়ের উদ্রেক হতে পারত।

মেয়েদের চুল ও ছেলেদের দাড়ি দুয়েরই সমান প্রসাধন প্রয়োজন, সমান সময় সাপেক্ষ। তফাৎ শুধু এই যে, প্রথমটির যত্ন বৃদ্ধিতে, দ্বিতীয়টির বিনাশে। চুল রোজ বাঁধতে হয়, দাড়ি রোজ কামাতে। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে এবং যে আপিস করে সে ক্ষুরও চালায়,—এ কথা সত্য। তবুও বেণীরচনায় ভ্রাতৃজায়া বা ননদিনীর সহায়তা পেলে মেয়েরা খুশি হন; ক্ষৌরকার্যে নরসুন্দরের সাহায্য পেলে অনেক ছেলেরা আয়েস বোধ করে। তাই সকাল আটটা থেকে দ্বারে দ্বারে হানা দেয় হাজাম। তার সঙ্গে আছে খুব ছোট্ট পিতলের একটি পোর্টেবল চুল্লী, অনেকটা ইক্‌মিক্ কুকারের মত আকৃতি। তাতে শীতের দিনে সর্বদা জল গরম হয়। শীতের দেশের বাসিন্দারা জানেন, ডিসেম্বরের ৩৭ ডিগ্রির শীতে গালে ঠাণ্ডা জল দেওয়ার চাইতে চড় দেওয়া ভালো।

সাড়ে ন'টা থেকে সুরু হয় আপিস-অভিযান। প্রথমে চাপরাশী দল। গায়ে খাকী রংএর উর্দি, মাথায় পাগড়ি ও কটিতে লাল সর্পাকৃতি তিন চার ফেরতা কোমরবন্ধ। দু' একজনের কোমরবন্ধে সুদৃশ্য খাপের মধ্যে হাতীর দাঁতের বাটওয়ালা ক্ষুদ্র ছুরিকা। মোগল বাদশাহের আমলের খোজা প্রহরীদের অনুকরণ। তারা অনারেবল মেম্বর বা সেক্রেটারীদের চাপরাশী। আর্দালী বাহিনীতে মেজর জেনারেল। তাদের সাইকেলের পিছনে লাল খেরো কাপড়ে বাঁধা এক গুচ্ছ ফাইল, যা সাহেবরা প্রত্যেক শনিবারই বাড়ি নিয়ে যান কাজ করার জন্যে এবং বেশীর ভাগই সোমবারে ফিরিয়ে আনেন একবারও না ছুঁয়ে।

চাপরাশীদের পরে যায় কেরানী, এ্যাসিস্ট্যান্ট ও সুপারিণ্টেণ্ডেন্টরা।

সাইকেল, সাইকেল, সাইকেলের পরে সাইকেল। ঠিক যেন একটা সাইকেলের প্রসেশন। তার সঙ্গে আছে টাঙ্গা। সেও দ্বিচক্রযান। ঘোড়ায় টানে। সামনে ও পিছনে চারজন বসা যায়,—কিন্তু মুখোমুখি নয়, পিঠোপিঠি। মাথার উপরে সামান্য একটু ক্যাম্বিসের আচ্ছাদন; তাতে রৌদ্রতাপ বা বৃষ্টিধারা কোনটাই পুরাপুরি নিবারিত হয় না। আরোহণ ও অবরোহণের কালে পুরুষদের পক্ষে হয় জিম্‌ন্যাস্টিকের পরীক্ষা, শাড়ীপরিহিতাদের পক্ষে ভব্যতার। একটু সতর্কতার অভাবেই পতন ও মূর্চ্ছা অসম্ভব নয়।

টাঙ্গার গতি মন্থর, আসন আরামহীন এবং পরিবেশ নাসারন্ধ্রের পক্ষে ক্লেশকর। সম্প্রতি আমেরিকানদের দাক্ষিণ্যে দক্ষিণার হার হয়েছে বৃদ্ধি। আগে যে-রাস্তাটুকুর মাশুল ছিল চার আনা, তার জন্য এখন বারো আনার কমে টাঙ্গাওয়ালারা কথাই বলে না; কিম্বা এমন কিছু বলে, যা না শোনাই ভালো। তবে দশটা পাঁচটায় সেক্রেটারিয়টের পথে সহযাত্রী মেলে। টাঙ্গাওয়ালা "দপ্তরকো, দপ্তর যানেবালা আইয়ে" বলে চেঁচিয়ে সংগ্রহ করে সওয়ারী। তাতে ভাড়ার অংশ বিভক্ত হয়ে পকেটের পক্ষে সুসহ হয়। ভাগের মা গঙ্গা পায় না; কিন্তু ভাগের টাঙ্গা গন্তব্যস্থল অবধি গিয়ে পৌছয়।

সাড়ে দশটার মধ্যে গোটা সহরটার সমস্ত পুরুষেরা নিষ্ক্রান্ত হলো পথে। সব পথের একই লক্ষ্য—সেক্রেটারিয়ট। বাবু পালালো পাড়া জুড়ালো, গিন্নি এলো পাটে।

ইম্পিরিয়ল সেক্রেটারিয়টটি নবর্মিত। শুধু সেক্রেটারিয়ট নয়, এখানকার বাড়িঘর, পথঘাট, হাটবাজার সবই নতুন। নয়াদিল্লী শহরটা আপস্টার্ট, বারাণসী, প্রয়াগ, এমন কি কলকাতা মুর্শিদাবাদের মতোও এর পশ্চাতে কোন ট্র্যাডিশন নেই। সে হঠাৎ-টাকা-করা ওয়ার কনট্রাক্টর, সাত পুরুষের বনেদি জমিদার নয়। কিন্তু যুগটাই যে ভুঁইফোড়দের। এযুগে জুড়ি গাড়ির চাইতে বেবী-অস্টিন, সাত

লহরীর চাইতে মফ্‌চেন এবং খেয়াল গান অপেক্ষা গজলের আদর বেশী। বিত্ত হলেই হলো, নাই বা রইল বৈভব।

মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত পথ কিংসওয়ে, ভাইসরয়'স হাউসের লৌহদ্বার অবধি প্রসারিত। তারই দু'পাশে সেক্রেটারিয়টের দুই মহলা,—নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক। আকৃতি, রং, রেখা, গঠনভঙ্গি হুবহু এক। যেন ময়রার দোকানে 'আবার খাবো' বা জলতরঙ্গ ছাঁচে গড়া এক এক জোড়া সন্দেশ। নর্থ ব্লকের সিঁড়ির মাথায় প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ পরিকল্পনাকার সার হার্বার্ট বেকারের নাম।

নয়াদিল্লীর প্রায় সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বাড়িগুলিই মুখ্যতঃ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থাৎ গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণ, যদিও পুরাপুরি নয়। থাম আর গম্বুজ। আর্চের সংখ্যা কম। যা আছে তাও রোমান ধরণের অর্ধবৃত্তাকার, মুসলিম পদ্ধতির সূক্ষ্মাগ্রভাগের নয়। থামগুলি চতুষ্কোণ নয়, গোলাকার। নয়াদিল্লীর পত্তনে গ্রীক স্থাপত্যকে গ্রহণের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা বলা শক্ত। তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা এই যে, জলবায়ু ও আবহাওয়ার দিক দিয়ে গ্রীস উত্তর ভারতের সমতুল্য, যদিও তার গ্রীষ্ম অপেক্ষাকৃত সহনযোগ্য এবং শীত অপেক্ষাকৃত কঠোরতর। উত্তর ভারতের মতো গ্রীসেরও বাতাস অনার্দ্র, আকাশ নির্মেঘ এবং রৌদ্র নির্মল। সুতরাং গ্রীক স্থাপত্য নয়াদিল্লীর পক্ষে স্থায়িত্বের দিক দিয়ে অধিকতর উপযোগী হবে, স্থপতিদের মনে এ বিশ্বাস দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়।

কিন্তু নয়াদিল্লীর স্থাপত্যকে পুরাপুরি কোন একটা বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া ঠিক নয়। সেটা ক্ল্যাসিক্যাল বটে কিন্তু একেবারে নির্ভেজাল নয়। সেক্রেটারিয়ট দালানে হিন্দু পদ্ধতিরও চিহ্ন আছে,—সারনাথে দৃষ্ট অশোকস্তম্ভের অনুকরণে গঠিত স্তম্ভগুলিতে। আছে প্রবেশ-তোরণ ও অন্যান্য অংশে হস্তী, ঘণ্টা প্রভৃতি অলঙ্করণে। তারই সঙ্গে আছে মুসলিম স্থাপত্যরীতির পাথরের জালি, ফতেপুর সিক্রিতে চিস্তির কবরে যার বহুল নিদর্শন। রাজমিস্ত্রিরা বেশীর

ভাগই এসেছে জয়পুর, রাজপুতানার অন্যান্য স্থান এবং আগ্রা থেকে। জনশ্রুতি এই যে, তাদের মধ্যে অনেকে ছিল তাজ নির্মাতাদের উত্তরপুরুষ। নর্থ এবং সাউথ, দু' ব্লকেরই মাথায় বিরাট গম্বুজ, অনেকটা রোমের সেণ্ট পল গির্জার অনুরূপ, যদিও এতে কিছুটা মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। চোখে দেখে মনে হয় না যে, গম্বুজ দুটির উচ্চতা কুতুবশীর্ষ থেকে মাত্র ২১ ফুট কম। দু'টি ব্লকে মিলিয়ে সেক্রেটারিয়টে কক্ষ আছে প্রায় এক হাজার, সব ক'টি মিলিয়ে বারান্দার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় আট মাইল। ইলাহী কাণ্ডই বটে!

সাধারণতঃ সরকারী দপ্তরখানাটার সঙ্গে আর্টের বড় একটা সম্পর্ক থাকে না। তার নামে যে-দৃশ্যটি আমাদের কল্পনায় আসে তা' এক রাশি নথি, দলিল, দস্তাবেজ ও হিসাব নিকাশ। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত টেবিলের উপর ফাইল ঘাঁটাই যেখানে একমাত্র কাজ, সেখানে গৃহের গঠনভঙ্গি ব পরিবেশ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনে। সে দালানের জানালা কী রংএর বা সিঁড়ি কী ঢংএর সে প্রশ্ন আমাদের মনেই আসে না। পুলিশকোর্টের দেয়ালে অজন্তার ফ্রেস্কো পেণ্টিং আমরা আশা করিনে। কিন্তু দেখলে কি খুশি হতেম না? অন্ততঃ নয়াদিল্লীর সেক্রেটারিয়টকে সুদৃশ্য করার চেষ্টা দেখে আনন্দিত হয়েছি।

লাল পাথরে গড়া বিরাট ভবন। মাঝখান দিয়ে দূরপ্রসারিত পথ। পথের দুপাশে শ্যামল দুর্বার আস্তরণে ঢাকা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মাঝে মাঝে কৃত্রিম ঝিল, তাতে সারিবন্দী ফোয়ারা থেকে অবিরাম উৎসারিত হচ্ছে জলরাশি। পাশে পুষ্পিত মরশুমী ফুলের,—ডেজী, প্যান্সী, এ্যাষ্টর ও হলি-হকের কেয়ারী। নির্বাচিত স্থানে একটি করে কমলালেবুর গাছ। বহু যত্নে বৃত্তাকারে ছাঁটা তার ডালপালা, মনে হয় যেন বাঁটের উপর খোলা দাঁড়িয়ে আছে এক একটি ছাতা।

দালানের ভিতরটাকেও কেবলমাত্র কাজের উপযোগী না করে

দর্শনযোগ্য করার প্রয়াস আছে। নর্থ ও সাউথ ব্লকে কমিটি রুম নামক যে বৃহৎ কক্ষগুলি আছে তার সিলিং এবং দেয়াল চিত্রশোভিত। বম্বে স্কুল অব আর্টের শিল্পীদের আঁকা। চিত্রগুলির বিষয়বস্তু ভালো কিন্তু দুঃখের বিষয় অঙ্কনচাতুর্য প্রশংসনীয় নয়। এই কক্ষগুলিতে নানা রমক কমিটি, কনফারেন্স বসে। সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রথম প্রেস-কনফারেন্সও বসল সাউথ ব্লকের কমিটি-রুমে।

ক্রীপসের বিমান নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এসে পৌঁছল দিল্লীতে, বেলা তখন দুটো। সুতরাং বেলা চারটায়,—মাত্র দু' ঘণ্টার ব্যবধানে,—একটা প্রেস-কনফারেন্স ডাকার মধ্যে তৎপরতার পরিচয় আছে যথেষ্ট। সাউথ ব্লকের সবটাই মিলিটারীর দখলে, বেসামরিক দপ্তরের মধ্যে মাত্র হোম ডিপার্টমেণ্ট আছে একটি টেরে। অবস্থান নৈকট্যের কারণ বোধ হয় স্বভাবসাদৃশ্য। ভারতে পুলিশ আর মিলিটারী প্রায় কাছাকাছি। সগোত্র না হলেও স্বজাতি বটে।

দরজায় কড়া সামরিক পাহারা। সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের জন্য ইনফরমেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে ব্যবস্থা হয়েছে প্রবেশপত্রের।

প্রচুর বক্‌শিশ ও প্রচুরতর তাড়না দ্বারা টাঙ্গাওয়ালাকে উৎসাহিত করা সত্ত্বেও সাউথ ব্লকের দরজায় এসে যখন অবতীর্ণ হলেম, চারটে বাজতে তখন মিনিট খানেক মাত্র বাকী। বেচারার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু টাঙ্গার ঘোড়াগুলি ভারতীয় যোগীপুরুষদের মতো নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত ও নির্বিকার; কোন কিছুতেই তাদের উত্তেজিত করা সহজ নয়, বেগবৃদ্ধি প্রায় সাধ্যাতীত। ঊর্ধ্বশ্বাসে রওনা হলেম কনফারেন্স কক্ষের উদ্দেশে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ সার ফ্রেডারিক পাকল্, ইনফরমেশন বিভাগের কর্ণধার। পরিচিত বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে বললেন ক্রীপসের অপেক্ষা করছেন। গোটা দুই সিঁড়ি উপড়ে যাচ্ছিলেন একটি শ্বেতাঙ্গ, মনে হলো সদ্য আগত ইংরেজ বা মার্কিন রিপোর্টারদের অন্যতম। হঠাৎ পিছিয়ে

নেমে এসে সার ফ্রেডারিককে জিজ্ঞাসা করলেন, "Did you say Cripps? That's me."

এর চেয়ে বজ্রপাত হওয়া ভালো ছিল।

আমরা বিস্মিত, পাক্‌ল্‌ স্তম্ভিত, পারিষদেরা হতবাক।

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্য। ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে এসেছেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রস্তাব নিয়ে। আছেন ভাইসরয়ের প্রাসাদে। সুতরাং প্রেস-কনফারেন্সে আসবেন বড়লাটের ক্রাউন মার্কা গাড়ি চেপে, আগে চলবে লাল মোটর সাইকেলে পাইলট-সার্জেণ্ট, পাশে থাকবে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী বা অনুরূপ কোন হোমরা-চোমরা পথপ্রদর্শক। জমকে, জৌলুসে চিনতে বিলম্ব হবে না এক মুহূর্ত। এইটেই আশা করছে সবাই। হা হতোস্মি; কোথায় প্রাইভেট সেক্রেটারী আর কোথায় বা আগে পিছনে পিস্তলকোমরে সার্জেণ্ট পাহারা! সঙ্গে একটি মাত্র ভাইসরয়'স হাউসের চাপরাশী, বোধ করি সেও শুধু পথ চিনিয়ে দেওয়ার জন্য।

সরকারী কায়দা-কানুন, ফর্মালিটি পরিহার করে আড়ম্বরহীন, সহজ ও সরল একটি পরিবেষ্টন সৃষ্টি করলেন ক্রীপস। তাঁর আন্তরিকতায় ভারতবর্ষের আস্থা গভীরতর হলো, তাঁর চেষ্টার সাফল্য কামনা করল জনসাধারণ, তাঁর সুখ্যাতি অকৃপণ ভাষায় কীর্তিত হলো সর্ব প্রদেশ ও সর্ব ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে।

কনফারেন্সে ক্রীপস আবেদন জানালেন সাংবাদিকদের, তাঁরা যেন ক্রীপস প্রস্তাবের সারমর্ম নিয়ে অযথা গবেষণা না করেন। নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার পূর্বে সংবাদপত্রে মীমাংসা প্রস্তাবের কল্পিত বিবরণ প্রকাশের দ্বারা যেন অবাঞ্ছিত বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি না হয় রাজনীতিক মহলে। বলা বাহুল্য, সে আবেদনের প্রয়োজন ছিল।

সব চেয়ে বিস্ময়কর, প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রীপসের মনে

অবিচলিত আস্থা। ওয়ার ক্যাবিনেটের সর্বসম্মত এই মীমাংসা প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অনায়াসে গ্রহণীয় হবে, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের বিরোধ অপনীত হবে এবং দীর্ঘকাল ধরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে অদম্য অভিলাষে ভারতের অগণিত নরনারী দুরূহ ত্যাগ ও দুঃসহ নির্যাতন বরণ করেছে তার সার্থক পরিণতি ঘটবে, এ বিষয়ে ক্রীপসের মনে সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মনোভাব কারো অজ্ঞাত নয়। জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের প্রতি ক্রীপসের সহানুভূতি, বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ ও তেমনি অতি পরিচিত তথ্য। চার্চিল ইম্পিরিয়লিষ্টদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল। ক্রীপস সোশ্যালিষ্টগোষ্ঠীতেও সব চেয়ে প্রগতিশীল। জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন,—এই সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাব রচনায় প্রধানমন্ত্রী ও সার স্ট্যাফোর্ডের মতৈক্য হলো কী করে? চার্চিল তাঁর মতবাদ ত্যাগ করেছেন, না সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস বদলেছেন?

প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে ক্রীপস উত্তর করলেন, কোনটাই নয়, দু'জনারই মতের মিল হওয়ার মতো একটা নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, যা' এর আগে চোখে পড়েনি।

কনফারেন্স থেকে যখন বাইরে এলেম, ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় ছ'টার কোঠায়। অপরাহ্ণ বেলার শান্তরোষ সূর্যের রশ্মি পড়েছে সেক্রেটারিয়ট ভবনের রক্তাভ প্রাচীরে। সামনের ফোয়ারার উৎসারিত জল কম্পিত ধারায় বিক্ষিপ্ত হচ্ছে বৃত্তাকার প্রস্তর-আধারে। ঋজু, দীর্ঘ কিংসওয়ের প্রান্তভাগে দেখা যায় ওয়ার-মেমোরিয়েল, বিগত মহাযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈন্যদের স্মরণলেখা যার গায়ে উৎকীর্ণ। দূরে ইন্দ্রপ্রস্থের পাষাণদুর্গের ভগ্নাবশেষ রূপসী তরুণীর পাশে পলিতকেশ, বিগতযৌবনা বৃদ্ধা পিতামহীর মতো নয়াদিল্লীর বর্তমান বৈভবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কালের অমোঘ বিধান অপ্রতিরোধনীয় পরিণাম।

পিছনে তাকিয়ে দেখি উন্নতশির ভাইসরয়'স হাউসের বিরাট গম্বুজের শীর্ষে বাতাসে মৃদু আন্দোলিত ইউনিয়ন জ্যাক,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সনাতন গৌরবচিহ্ন। দু'শ বছর ধরে ভারতবর্ষে রয়েছে অচল, অটল ও অনপনেয়। এইমাত্র যে-কনফারেন্স শেষ হলো, তাতে আশ্বাস ছিল ঐ পতাকার বর্ণ পরিবর্তনের। সে বর্ণ গৈরিক হবে কি সবুজ হবে, তাতে চরকা থাকবে কি অর্ধ চন্দ্র থাকবে সে-প্রশ্ন পরের। আপাততঃ এইটিই বড় কথা যে, সে নতুন হবে, ভারতীয় হবে। কিন্তু সে কবে গো, কবে?

তিন

গৃহকর্ত্রীর সাত বছরের মেয়ে রেবা এসে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল, "মিনি সাহেব, ইংরেজ জিতবে কি জাপান জিতবে?"

মিনি সাহেব নামের পিছনে আছে ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নয়, ভাষাতত্ত্বও।

বিলাতে গেলে আমাদের প্রথম রূপান্তর ঘটে বেশে, দ্বিতীয় নামে। দেশে থাকতে যারা পণ্টু, গদাই, সুরেন কিম্বা সুবোধ, বিদেশে তারাই সেন, রয়, মিটার অথবা ব্যানার্জী। নয়াদিল্লীটা খাঁটি বিলাত নয়,—এরসাৎস্। এখানেও ব্যক্তির পরিচয় নামের আদিতে নয়, অন্তে। পি. এল. আস্থানার আদ্য অক্ষর দুটি কিসের সংক্ষেপ তা নিয়ে কারও ঔৎসুক্য নেই, শেষেরটুকু জানলেই হলো। পদমর্যাদার উপরে নির্ভর করে সম্বোধনের বিশেষণ। কেরাণী হলে আস্থানার সাফিক্স বসে বাবু, অফিসার হলে প্রেফিক্স লাগে মিস্টার।

কিন্তু মুখে মুখে কথার ধারা বদল হয়, নামেরও পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে চাকর, বেয়ারা, আর্দালী, পিওনের অশিক্ষিত উচ্চারণে অনেক সময়ে চলতি বিকৃতি থেকে আসল আকৃতি আঁচ করাই কঠিন হয়। ব্যানার্জী বেনারসী হন, মিঃ ম্যাকার্টিস হন মারকুট্টি সাহেব। সেনগৃহের পরিচারিকা বিলাসিয়ার আদি বাস রামগিরি পর্বতের সানুদেশে। ভাষা কিছুটা দ্রাবিড় এবং কিছুটা আর্য, উচ্চারণ মারাত্মক। সুতরাং কবে কেমন করে কোন্ শব্দের অপভ্রংশ ও কোন্ শব্দের অর্ধাংশ মিলিয়ে তার মুখে মিনি সাহেবে দাঁড়িয়ে গেছি সে গবেষণায় সুনীতি চাটুয্যের শরণ নিতে হবে।

"বল না, মিনি সাহেব, কে জিতবে। ইংরেজ না জাপান?" প্রশ্নকর্ত্রী তাড়া দিলেন।

প্রশ্নটা নূতন নয়। ইতিপূর্বে আরও অনেকের কাছে শুনতে হয়েছে এ জিজ্ঞাসা। জবাব অবশ্য দিতে হয়নি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী নিজেই দিয়েছেন উত্তর, চেয়েছেন শুধু সমর্থন। যাঁরা তা দেন নি, তাঁরাও কী শুনলে খুশি হবেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশমাত্র রাখেন নি কখনও, ঠিক যেমন স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, নতুন শাড়ীটায় তাঁকে কেমন দেখাচ্ছে। সুতরাং পাল্টা প্রশ্ন করলেম, "তুমি বল, কে জিতবে।"

"ইংরেজ!" স্বর গম্ভীর, প্রত্যয়ব্যঞ্জক। স্বয়ং চার্চিলের পক্ষেও বোধ হয় এতটা নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ কাছেই ছিল। বোনের উত্তর কানে যেতেই ভাই ছুটে এল! "কী বললি? ইংরেজ জিতবে? জিতবে না হাতি। জাপানীদের সঙ্গে পারবে ইংরেজ? ফুঃ!" বাক্যের সঙ্গে যোগ করল ভঙ্গি। ঠোঁট বাঁকিয়ে মুখে চোখে এমন একটা গম্ভীর তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করল যাতে শ্রোতাদের পক্ষে ইংরেজের জয় সম্পর্কে ক্ষীণতম আশা পোষণ করাও হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য হবে।

বুড্ঢু রেবার চাইতে মাত্র দু' বছরের বড়। কিন্তু অভিভাবকত্বের ধারা প্রায়ই বয়সের অনুপাত মেনে চলে না। বিশেষতঃ বুড্ঢু স্কুলে ভর্তি হয়েছে, রেবার এখনও বাকী। সুতরাং তর্ক-বিতর্কের মাঝপথে বুড্ঢু যখন থার্ড মাস্টার বা অন্য ছাত্রদের নজীর উল্লেখ করে, রেবাকে তখন বাধ্য হয়েই বোবা হতে হয়। "বিশু আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, সে বলেছে। তার চাইতে তুমি বেশী জান কি না?" এ যুক্তির উপরে আর তর্ক চলে না।

কিন্তু আজতো ফার্স্ট বয়ের মতামত নয়। এ যে তার নিজের বিশ্বাস। তাই রেবা দমল না।

"কেন জিতবে না, ঠিক জিতবে।" কিন্তু কণ্ঠে যেন সে দৃঢ়তার আভাস পাওয়া গেল না।

বুড্‌ঢু অপরিসীম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ইংরেজ জার্মানির সঙ্গেই পারে না, আর পারবে জাপানের সঙ্গে। হুঃ; হেরে ভূত হয়ে যাবে।"

"কেন হারবে? ইংরেজের কত কামান বন্দুক কত এরোপ্লেন। আছে জাপানীদের এরোপ্লেন?"

"জাপানীদের এরোপ্লেন নেই? হা হা হা! এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে ইংরেজের রিপালস্ আর প্রিন্স অব ওয়েলস ডুবিয়ে দিল কে শুনি? পারল ইংরেজ জাপানীদের কিছু করতে? ইংরেজের এরোপ্লেন তো সব ভাঙা, কী হয় তা দিয়ে।"

"ইংরেজের এরোপ্লেন ভাঙা, মিনি সাহেব? ভাঙা যদি তবে আকাশে ওঠে কেমন করে?" করুণ কণ্ঠে আপীল জানালেন ইংরেজ-হিতাকাঙ্ক্ষিণী।

কিন্তু আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বুড্‌ঢু বলল, "ওঠে আর পড়ে যায়। কাল পত্রিকায় লেখেনি 'বিমান দুর্ঘটনা'? কলকাতায় এরোপ্লেন আকাশে উড়তে গিয়ে পড়ে গেছে। তাতে মানুষ মরেছে।"

অকাট্য প্রমাণ। শুধু ঘটনা নয়, একেবারে দিন তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ। এর পরে তর্ক করা কঠিন। তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে ক্ষীণ প্রতিবাদ করল রেবা। "দেখো ইংরেজ হারবে না।"

"তুমি কত জানো! হারবে, হারবে, হারবে। জাপানীরা চার্চিলকে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে বেঁধে এনে তার পর ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবে।" বলে এমন বীরদর্পে প্রস্থান করল বুড্‌ঢু যেন জাপানী নয়, সে নিজেই চার্চিলের বন্ধনের উদ্যোগ করতে গেল।

রেবা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, "কখনও নয়, জাপানীরা পারবে না। পারবে মিনি সাহেব?"

তাকে কাছে টেনে আদর করে বললেম, "না, পারবে না। আর পারলেই বা কী? বাঁধুক না চার্চিলকে; আমাদের রেবা দিদিমণিকে তো আর বাঁধতে পারছে না।"

"ইংরেজ হেরে গেলে বিল্‌দের কী হবে? বিলের বাবাকে ধরে

নিয়ে যাবে, মাকে নিয়ে যাবে, জন, লুসী ও এ্যানি সব্বাইকে তো বেঁধে নেবে ?” বিল্ মানে প্রতিবেশী উইলিয়ম। রেবাদের পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সিমস্ দম্পতির বারো বছরের ছেলে জন। লুসী ও এ্যানি তারই দুই বোন।

“তা নিক না ধরে বিল্‌দের। ওদের ট্যাবী কুকুরটা আমাদের বিলাসিয়াকে সেদিন কামড়ে দিচ্ছিল যে।”

মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি প্রকাশ করল রেবা। বলল, “না, ধরে নেবেনা ওদের। বিল্ আমাকে চকোলেট দেয়, টফী দেয়। বলেছে একদিন তার সাইকেলে চড়তে দেবে।”

ও হরি! এতক্ষণে ব্রিটেনবান্ধবীর প্রবল ইংরেজ-হিতৈষণার আসল কারণটা বোঝা গেল। চকোলেট, টফী, তার উপরে আবার সাইকেল চড়তে দেওয়ার আশ্বাস। এর পরেও ইংরেজের পরাজয় কল্পনা করা অত্যন্ত কৃতঘ্নতার পরিচয় হবে। বিস্ময়ের কিছুই নেই। ভারতবর্ষে ইংরেজ অনুরাগী যে কজন আছেন তাঁদের সবারই ঐ এক অবস্থা। চকোলেট, টফী না হোক, কারো চাকরি, কারো প্রমোশন, কারো বা রায় সাহেব, খান্‌বাহাদুর বা সি. আই. ই. নাইটহুড খেতাব।

কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বাধা পড়ল। সস্ত্রীক ঘোষ সাহেব হানা দিলেন। এই দম্পতিটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে মাত্র দিন কয়েক। কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা অল্পকালের মধ্যেই অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করেছে। মিসেস বললেন, “চলুন ওখলায়।”

“সে কোথায় ? পেরু না কামস্কাট্‌কায় ?”

“তার চাইতে কিছুটা কাছে। মথুরার পথে, এখান থেকে মাইল আটেক। ফিরতি পথে নিজামুদ্দিন দেখিয়ে আনব।”

ওখলা জায়গাটা একটা দ্বীপের মতো। যমুনার ধারাকে একটি কৃত্রিম খালের মধ্য দিয়ে ভিন্নমুখী করা হয়েছে সেখানে। সে খাল বেষ্টন করেছে এক টুকরো ভূমিখণ্ড। বৃক্ষবহুল, ছায়াচ্ছন্ন। একপাশে সরকারী সেচ বিভাগের দপ্তর, বাকীটা প্রমোদ-উদ্যান। খালের

মুখ খোলা ও বন্ধ করার জন্য আছে লকগেট, তার উপরে প্রশস্ত সেতু। টাঙ্গা ও মোটর অনায়াসে যেতে পারে। ছুটির দিনে দলে দলে লোক আসে পিকনিক করতে। ওখলা নয়াদিল্লীর বটানিকস্।

স্থানটি মনোরম। চারদিকের ধূসর রুক্ষ ও ধূলিকীর্ণ দেশে একটুখানি স্নিগ্ধ, শ্যামলতার আমেজ মেলে। যমুনার অগভীর প্রবাহ খালের দিকে প্রসারিত করার জন্য দীর্ঘ বাঁধ। তার উপর দিয়ে উপচীয়মান শুভ্র জলধারা গড়িয়ে পড়ছে ওপাশে। বেদীর মতো পাথর দিয়ে বাঁধানো সেখানটা। চাষীদের ছেলেরা কাপড় দিয়ে মাছ ধরায় ব্যস্ত। খালের মুখে ছিপ ফেলে বসে আছেন দু' একজন সাহেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁদের ধৈর্য বিপুল এবং আশা সীমাহীন। গাছের নীচে ফরাস বিছিয়ে বসেছেন কোন শেঠ, প্রসাদ বা গুপ্তজী। চৌরী বাজারে বিরাট লোহার আড়ৎ। সারা সপ্তাহ হন্দর হিসাবে লোহা বেচে অর্থ উপায় করেছেন প্রচুর। রবিবারে এসেছেন প্রমোদ-ভ্রমণে। সঙ্গে এসেছে বিপুলকায়া গৃহিণী, আধ ডজন পুত্রকন্যা, গোটা চারেক বৃহদাকার টিফিনকেরিয়ার, জলের সোরাই, আলবোলা ও ভৃত্য।

এসেছে কাঁধের উপরে পিতলের চাকৃতি বসানো খাকী গায়ে ইংরেজ, ক্যানাডিয়ান বা অষ্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন। বাহুসংলগ্না ফিরিঙ্গী বান্ধবী। স্কন্ধে চামড়ার ফিতে দিয়ে লম্বমান ফটোগ্রাফের ক্যামেরা। প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের প্রণয়কাণ্ডের উৎকট আতিশয্য দেখে মাঝে মাঝে লজ্জিত হতে হয় দর্শকদেরই।

স্বদেশে ইংরেজকে কখনও দেখিনি এমন মাত্রাজ্ঞানহীন। শনিবার বিকেলে পিকাডিলীতে দেখেছি প্রণয়ীযুগলের দল। কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে। তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস ঠিক ভট্টপল্লীর বিধানানুযায়ী নয় বটে, কিন্তু তবুও অদৃশ্য, অলিখিত একটা রেখা টানা আছে যা' লঙ্ঘন করে না কেউ। সে-রেখা সুনীতির নয়, সুরুচির। ডিসেন্সীকে ইংরেজ ভালবাসে মনে প্রাণে। ইনডিসেণ্ট বলার বাড়া গাল নেই।

ইংলণ্ডে। ছাব্বিশ মাইল জল পার হলেই কণ্টিনেণ্টে দেখা যায় না এ রুচিবোধ। শালীনতার অঙ্গুলি নির্দেশকে সেখানে তরুণ তরুণীরা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় অকুণ্ঠিত চিত্তে।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছে যে-ইংরেজ, সে ঐ সুরুচির রেখাটার কথা ভুলে গেছে নিঃশেষে। বৃটেনের বাইরে বৃটিশ কলঙ্কের কদর্য কাহিনী আছে Somerset Maugham-এর গল্পে ভূরি ভূরি। পালামৌ ভ্রমণে সঞ্জীবচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। বৃটেন-জঙ্গলের বাইরে ইংরেজকে দেখলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না ডারুইন তত্ত্বে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের এই নির্লজ্জ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ এই যে, চার পাশের দর্শকদের ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না। আমরা ওদের সম্বন্ধে কী ভাবি না ভাবি তা নিয়ে ওদের কোন মাথাব্যথা নেই, নেই আমাদের সামনে ভদ্র আচরণের দায়িত্ব। আরও একটা কারণ আছে, সেটা গভীরতর। এদেশে ইংরেজ তার পরিবার ও সমাজ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এখানে সে বল্‌গাহীন অশ্ব। সে যেন কলকাতার মেসে-থাকা মফঃস্বলের ধনী জমিদারনন্দন। পিছনে অভিভাবকের এতটুকু নেই রাশ, হাতে টাকা আছে রাশি রাশি।

দুটি ইংরেজ দম্পতি এসেছেন নয়াদিল্লী থেকে সাইকেল চেপে এই দারুণ গ্রীষ্মে। স্নানার্থে। নদীতে জল কোথাও বুকের উপরে নয়, কিন্তু স্বচ্ছ। তারই মধ্যে ঘণ্টা কয়েক ধরে তাদের সন্তরণ অর্থাৎ সন্তরণের চেষ্টা চল্‌ল সোৎসাহে। ওপারে বালুচরে যে মৎস্যার্থী বকের দল ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর ন্যায় নিশ্চল, নিথর, জলের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি দাঁড়িয়ে শিকারের প্রতীক্ষা করছিল, স্নানার্থীদের সশব্দ জলক্রীড়া ও কলহাস্যে তাদের স্থৈর্য ক্ষুণ্ণ হলো। সচকিত হয়ে বারম্বার তারা স্থান পরিবর্তন করতে লাগল।

স্ত্রী-পুরুষের এই মিলিত স্নান পর্বটা তেমন রুচিকর নয় আমাদের

দেশে। প্রাচীনপন্থীদের কথা ছেড়েই দিলাম। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে যাঁরা ইংরেজের অনুগামী, তাঁদের মধ্যেও মেয়েরা এটা খুব স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। ক্লাবে জিন বা ভারমুথ পান করে পরপুরুষের সঙ্গে ওয়লজ নাচ্‌তে যাঁদের বাধে না, তাঁরাও সহস্নানটা খুব প্রীতির চোখে দেখেন না।

স্থির চিত্তে বিচার করলে বোঝা যাবে, এর মূলে আছে আমাদের সংস্কার। কিন্তু সংস্কারের মুক্তি তো যুক্তি দিয়ে হয় না, যেমন বুদ্ধি দিয়ে জয় হয় না ভূতের ভয়। সংস্কার রাতারাতি পরিহার করতে হলে চাই বিপ্লব, রয়ে সয়ে করতে হলে চাই অভ্যাস।

আমাদের প্রাচীন সমাজে নরনারীর একটা সম্মিলিত সত্তা খুব স্পষ্টরূপে স্বীকৃত নয়। উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক, পরিবেশ বিভিন্ন এবং কর্তব্য আলাদা। একমাত্র ধর্মাচরণ ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষের একত্র করণীয় কিছুর উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রে নেই। শ্রীকৃষ্ণের রথে সুভদ্রার সারথিত্যকে বাদ দিলে সমগ্র পুরাণ, কাব্য ও সাহিত্যে স্বামী-স্ত্রীর মিলিত কর্মের দ্বিতীয় উপাখ্যান মিলে না। সাবিত্রী সত্যবানের সঙ্গ নিয়েছিলেন কাঠ কুড়োতে নয়, স্বপ্নে দেখা অমঙ্গলের ভয়ে। সেকালে পুরুষেরা করতো যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, হলকর্ষণ ও বাণিজ্য। মেয়েরা করতো গো-ব্রাহ্মণের সেবা, রন্ধন ও গৃহমার্জনা। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের সময় ও সুযোগ ছিল সঙ্কীর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র নিশীথে শয্যাগৃহের স্বল্পপরিসর অবকাশের মধ্যেই তা নিবদ্ধ ছিল।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবার-প্রথাও স্বামী-স্ত্রীর সর্বব্যাপী যোগাযোগকে বাধাগ্রস্ত করেছে পদে পদে। সেখানে স্বামী এবং স্ত্রী একটা বৃহৎ সংসারযন্ত্রের স্ক্রু বা বল্টু মাত্র, উভয়ে মিলে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটা সৃষ্টি নয়। সারিগমের তারা আলাদা দুটি সুর; দুয়ে মিলে একটি অখণ্ড সঙ্গীত নয়। চৌধুরী বাড়ির মেজগিন্নী পারেন না বাড়ির আর তিনটি জা ও পাঁচটি ননদকে রেখে একা

স্বামীর সঙ্গে সিনেমায়, কিম্বা গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যেতে। বঠ্‌ঠাকুরের মনেও আসবে না একা বড়গিন্নীকে দার্জিলিং কি সিমলা পাহাড়ে বেড়িয়ে আনার কথা।

নরনারীর মিলিত অস্তিত্বের ধারণাটি আমাদের সমাজে অধুনাজাত। স্ত্রী পুরুষের পৃথক সত্তা পুরোপুরি মেনে নিয়েও উভয়ের মিলিত জীবনের একটি সমগ্র রূপ সম্প্রতি আমরা উপলব্ধি করতে সুরু করেছি এবং স্বীকার করতে দোষ নেই যে, এ-জ্ঞান আমরা ইউরোপের কাছ থেকে পেয়েছি। এখনও পুরুষ দশটা-পাঁচটায় আপিস করে, আদালতে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় এবং মেয়েরা ঘরকন্নার তত্ত্বাবধান করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তু'পক্ষের রেস্পনসিবিলিটি আলাদা হলেও পলিসির যোগ থাকে। এ যুগের স্ত্রীরা আদার ব্যাপারী হয়েও স্বামীদের জাহাজের খবর রাখেন।

গৃহ এখন কেবলমাত্র স্ত্রীর প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিচারেই গঠিত নয়। বাইরে পুরুষের বন্ধুত্ব, সামাজিকতা ও অবসর বিনোদনও শুধু স্বামীর নিজস্ব অভিরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবজন্তুর মতো বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবার লুপ্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে। স্বামী, স্ত্রী ও তু'চারটে ছেলে মেয়ে নিয়ে যে নাতিবৃহৎ সংসার, তাতে স্বামীর স্থান গৃহকর্তার। সে স্বনামে পুরুষোধন্য। সে-গৃহে স্ত্রীর পরিচয়ও মেজ, সেজ বা ছোট বউ রূপে নয়, আপন সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীরূপে।

অনেকেই ভুলে যান যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের পরিপূর্ণতাও প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে,—সেটা আকস্মিক নয়। বিবাহ সে পরিপূর্ণতার লাইফ ইনসিওরেন্স নয়, গ্যারাণ্টি তো নয়ই। সে শুধু মীন্‌স্, সে য়েণ্ড নয়। সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনগত অধিকার দিয়ে বিবাহ স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ক্ষেত্রটিকে সুপরিসর ও নির্বিঘ্ন করে মাত্র। তাকে সফল করতে হয় উভয়পক্ষের সযত্ন চেষ্টায়, নিরলস সাধনায়। আগে প্রেম ও পরে বিবাহকে যাঁরা সমস্ত দাম্পত্য সমস্যার সমাধান,

জ্ঞান করতেন, তাঁরা এখন ঠেকে শিখেছেন যে, কোর্টশিপ করে বিয়েও ফুল-প্রুফ নয়, যেমন নয় ইণ্টারভিউ দিয়ে কর্মচারী নিয়োগ।

স্বামী এবং স্ত্রী দিনে দিনে একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে। আপন রুচির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা এবং মতবাদের দ্বারা। পরস্পরকে গঠন করে নিজ অভিলাষানুযায়ী, সৃষ্টি করে পলে পলে। এই দেওয়া নেওয়া, ভাঙ্গা গড়া চলে অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে এবং অনেকটা অবিসংবাদে। সেটা সুগম হয় নিকটতম সান্নিধ্যের দ্বারা। সান্নিধ্য শুধু গৃহে নয়, বাইরেও।

মানুষের মন বহু-বিচিত্র ; তার পরিচয়ের নাই শেষ। তার সত্তা ধ্রুব নয়, পরিবেশের পরিবর্তনে তার প্রকাশ হবে বিভিন্ন। স্ত্রী স্বামীকে চিনবে নানা পরীক্ষায়, উৎসবে ব্যসনে দৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে। স্বামী স্ত্রীকে আবিষ্কার করবে তিল তিল করে নিত্য নব আবেষ্টনে, যেমন মণিকার হীরা, পান্না, মুক্তাকে করে নূতন ডিজাইনের বালাতে, চুড়িতে, চন্দ্রহারে। সুতরাং স্ত্রী যদি জলকেলির সঙ্গিনী হন, তবে তাঁকে এমন একটি বিশিষ্টরূপে পাই, যা সকাল বেলার সধূম চায়ের পেয়ালা-হস্তে প্রতীক্ষমাণা গৃহিণীর মধ্যে নেই। স্ত্রীকে নাচঘরে অপরের বাহুলগ্না দেখে যাঁরা রাগ না করেন, তাঁরা তাঁকে স্নানের সহচরী পেলে দুঃখিত হবেন কেন? নারীদেহ সুইমিং কষ্টিউমে দেখলেই শকড্ হবেন এযুগে মার্কিণ সিনেমা দেখে যাঁরা চোখ পাকিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিশ্চয় এমন কেউ নেই।

ঘোষজায়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ফিরবার পথে মোটর থামালেন নিজামুদ্দিনের দরগায়। দরজা খুলে গেল ইতিহাসের এক অনধীত অধ্যায়ের।

পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজী তৈরী করেছিলেন একটি মসজিদ সেদিনকার দিল্লীর এক প্রান্তে। তার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে একদা এক ফকির এলেন সেই মসজিদে। ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়া। স্থানটি তাঁর পছন্দ হলো। সেখানেই রয়ে গেলেন এই

মহাপুরুষ। ক্রমে প্রচারিত হল তাঁর পুণ্যখ্যাতি; অনুরাগী ভক্ত সংখ্যা বেড়ে উঠল দ্রুত বেগে।

স্থানীয় গ্রামের জলাভাবের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর। মনস্থ করলেন খনন করবেন একটি দীঘি যেখানে তৃষ্ণার্ত পাবে জল, গ্রামের বধূরা ভরবে ঘট এবং নমাজের পূর্বে প্রক্ষালনের দ্বারা পবিত্র হবে মসজিদে প্রার্থনাকারী দল। কিন্তু সংকল্পে বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিতরূপে। উদ্দীপ্ত হলো রাজরোষ। প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান গিয়াসুদ্দিন তোগলকের বিরক্তিভাজন হলেন এক সামান্য ফকির, দেওয়ানা নিজামুদ্দিন আউলিয়া।

তোগলক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দিনের পিতৃপরিচয় কৌলীন্যযুক্ত নয়। ক্রীতদাসরূপে তাঁর জীবন আরম্ভ। কিন্তু বীর্য এবং বুদ্ধির দ্বারা আলাউদ্দিন খিলিজীর রাজত্বকালেই গিয়াসুদ্দিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন বিশিষ্ট ওমরাহরূপে। সম্রাটের 'মালিক'দের মধ্যে তিনি হয়েছিলেন অন্যতম। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে ছয় বৎসর পর পর রাজত্ব করল দুজন অপদার্থ সুলতান, যারা আপন অক্ষম শাসনের দ্বারা দেশকে পৌঁছে দিল অরাজকতার প্রায় প্রান্ত সীমানায়। গিয়াসুদ্দিন তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। এমন সময় খসরু খান নামক এক ধর্মত্যাগী অন্ত্যজ হিন্দু দখল করলো দিল্লীর সিংহাসন। গিয়াসুদ্দিন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে অভিযান করলেন পাঞ্জাব থেকে দিল্লী, পরাজিত ও নিহত করলেন খসরু খানকে, সগৌরবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বাদশাহী তক্তে।

গিয়াসুদ্দিনের দৃঢ়তা ছিল, শক্তি ছিল, রাজ্যশাসনে দক্ষতা ছিল। কিন্তু ঠিক সে অনুপাতেই তাঁর নিষ্ঠুরতাও ছিল ভয়াবহ। একদা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের অসাবধানী রসনায় রটনা শোনা গেল গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর। সুলতানের কানেও পৌঁছল সে ভিত্তিহীন জনরব। কিছুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করে সুলতান আদেশ করলেন তাঁর সিপাহীশালারকে, "লোকে আমাকে মিথ্যা কবরস্থ

করেছে, কাজেই আমি তাদের সত্যি সত্যি কবরে পাঠাতে চাই।”
অগণিত হতভাগ্যের জীবনান্ত ঘটলো নিমেষে নিমেষে; গোরস্থানে
শবভুক পশুপক্ষীর হলো মহোৎসব।

কিন্তু গিয়াসুদ্দিনের বিচক্ষণতা ছিল। সেকালে মুঘলদের আক্রমণ
এবং তার আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ছিল উত্তর ভারতের এক
নিরন্তর বিভীষিকা। গিয়াসুদ্দিন তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পত্তন
করলেন নূতন নগর, তৈরী করলেন নগর ঘিরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং
প্রাচীরদ্বারে দুর্জয় দুর্গ। একদিকে ক্ষুদ্র পর্বত আর একদিকে
প্রাচীরবেষ্টিত নগরী। মাঝখানে খনিত হলো বিশাল জলাশয়।
বর্ষার দিনে শৈলশিখর থেকে ধারাস্রোতে জল সঞ্চিত হতো এই
জলাশয়ে; সংবৎসরের পানীয় সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস থাকতো
প্রজাপুঞ্জের।

ফকির ও সুলতানে সংঘর্ষ ঘটলো এই নগর নির্মাণ, কিম্বা আরও
সঠিকভাবে বললে বলতে হয় নগরপ্রাচীর নির্মাণ, উপলক্ষ্য
করেই।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দীঘি কাটাতে মজুর চাই প্রচুর।
গিয়াসুদ্দিনের নগর তৈরী করতেও মজুর আবশ্যক সহস্র সহস্র।
অথচ দিল্লীতে মজুরের সংখ্যা তখন অত্যন্ত পরিমিত, দু' জায়গার
প্রয়োজন মিটানো অসম্ভব। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, বাদশাহ চাইলেন
মজুরেরা আগে শেষ করবে তাঁর কাজ, ততক্ষণ অপেক্ষা করুক
ফকিরের খয়রাতী খনন। কিন্তু রাজার জোর অর্থের, সেটা পরিমাণ
করা যায়। ফকিরের জোর হৃদয়ের, তার সীমা শেষ নেই। মজুরেরা
বিনা মজুরীতে দলে দলে কাটতে লাগলো নিজামুদ্দিনের তালাও।
সুলতান হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, ‘তবে রে—।’

কিন্তু তার ধ্বনি আকাশে মিলাবার আগেই এত্তালা এলো আশু
কর্ত্তব্যের। বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমন করতে ছুটতে হলো সৈন্য
সামন্ত নিয়ে।

শাহজাদা মহম্মদ তোগলক রইলেন রাজধানীতে রাজপ্রতিভূরূপে। তিনি নিজামুদ্দিনের অনুরাগীদের অন্যতম। তাঁর আনুকূল্যে দিবা রাত্রি খননের ফলে পরহিতব্রতী সন্ন্যাসীর জলাশয় জলে পূর্ণ হলো অনতিবিলম্বে। তোগলকাবাদের নগরপ্রাচীর রইল অসমাপ্ত।

অবশেষে সুলতানের ফিরবার সময় হলো নিকটবর্তী। প্রমাদ গণনা করলো নিজামুদ্দিনের অনুরাগীরা। তারা ফকিরকে অবিলম্বে নগর ত্যাগ করে পলায়নের পরামর্শ দিল। ফকির মৃদু হাস্যে তাদের নিরস্ত করলেন,—"দিল্লী দূর অস্ত্"। দিল্লী অনেক দূর।

প্রত্যহ যোজন পথ অতিক্রম করছেন সুলতান। নিকট হতে নিকটতর হচ্ছেন রাজধানীর পথে। প্রত্যহ ভক্তেরা অনুনয় করে ফকিরকে। প্রত্যহ একই উত্তর দেন নিজামুদ্দিন,—দিল্লী দূর অস্ত্।

সুলতানের নগর প্রবেশ হলো আসন্ন, আর মাত্র একদিনের পথ অতিক্রমণের অপেক্ষা। ব্যাকুল হয়ে শিষ্য প্রশিষ্যেরা অনুনয় করলো সন্ন্যাসীকে, এখনও সময় আছে, এই বেলা পালান। গিয়াসুদ্দিনের ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা অবিদিত ছিল না কারো কাছে, ফকিরকে হাতে পেলে কী দশা হবে তার সে কথা কল্পনা করে তারা ভয়ে শিউরে উঠলো বারংবার। স্মিতহাস্যে সেদিনও উত্তর করলেন বিগতভয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, "দিল্লী হনুজ দূর অস্ত্"। দিল্লী এখনও অনেক দূর। বলে' হাতের জপের মালা ঘোরাতে লাগলেন নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে।

নগরপ্রান্তে পিতার অভ্যর্থনার জন্য মহম্মদ তৈরী করেছেন মহার্ঘ মণ্ডপ। কিংখাবের সামিয়ানা। জরীতে, জহরতে, ঝলমল। বাদ্যভাণ্ড, লোকলস্কর, আমীরওমরাহ মিলে সমারোহের চরমতম আয়োজন। বিশাল ভোজের ব্যবস্থা, ভোজের পরে হস্তিযূথের প্রদর্শনী প্যারেড।

মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে ঈষৎ উন্নত ভূমিতে বাদশাহের আসন, তার পাশেই তাঁর উত্তরাধিকারীর। পরদিন গোধূলি বেলায় সুলতান প্রবেশ করলেন অভ্যর্থনা মণ্ডপে। প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে

আসন গ্রহণ করলেন। সিংহাসনের পাশে বসালেন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে। কিন্তু সে মহম্মদ নয়, তার অনুজ।

ভোজনান্তে অতি বিনয়াবনত কণ্ঠে মহম্মদ অনুমতি প্রার্থনা করল সম্রাটের। জাহাপনার হুকুম হলে এবার হাতীর কুচকাওয়াজ সুরু হয়, হস্তিযূথ নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি নিজে। গিয়াসুদ্দিন অনুমোদন করলেন স্মিতহাস্যে।

মহম্মদ মণ্ডপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো ধীর শান্ত পদক্ষেপে।

কড়্ কড়্ কড়্ড় কড়াৎ।

একটি হাতীর শিরসঞ্চালনে স্থানচ্যুত হলো একটি স্তম্ভ। মুহূর্ত মধ্যে সশব্দে ভূপতিত হলো সমগ্র মণ্ডপ।

চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো অসংখ্য কাঠের থাম। চাপাপড়া মানুষের আর্ত কণ্ঠে বিদীর্ণ হলো অন্ধকার রাত্রির আকাশ। ধূলায় আচ্ছন্ন হলো দৃষ্টি। ভীত সচকিত ইতস্ততঃ ধাবমান হস্তিযূথের গুরুভার পদতলে নিষ্পিষ্ট হলো অগণিত হতভাগ্যের দল। এবং সে-বিভ্রান্তকারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে উদ্ধারকর্মীরা ব্যর্থ অনুসন্ধান করল বাদশাহের।

পরদিন প্রাতে মণ্ডপের ভগ্নস্তূপ সরিয়ে আবিষ্কৃত হলো বৃদ্ধ সুলতানের মৃতদেহ। যে প্রিয়তম পুত্রকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন মনে মনে, তার প্রাণহীন দেহের উপরে সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত। বোধ করি আপন দেহের বর্মে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁর স্নেহাস্পদকে।

ঐহিকের সমস্ত ঐশ্বর্য প্রতাপ ও মহিমা নিয়ে সপুত্র গিয়াসুদ্দিনের শোচনীয় জীবনান্ত ঘটলো নগরপ্রান্তে। দিল্লী রইল চিরকালের জন্য তাঁর জীবিত পদক্ষেপের অতীত।

...দিল্লী দূর অস্ত্। দিল্লী অনেক দূর।

চার

নিজামুদ্দিনের দরগায় প্রবেশ করে আজও প্রথমেই চোখে পড়ে আউলিয়া খনিত পুকুর। তার পাশ দিয়ে আসা গেল এক প্রশস্ত চত্বরে যার মাঝখানে সমাধিস্থ হয়েছে ফকিরের দেহ। সমাধির উপরে ও আশেপাশে রচিত হয়েছে সুদৃশ্য ভবন ও অলিন্দ। উত্তরকালে সম্রাট সাজাহান সমাধির চারদিক ঘিরে তৈরী করেছেন শ্বেত পাথরের খিলান; প্রাঙ্গণ বেষ্টিত করেছেন সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত জালিকাটা পাথরের দেয়ালে। দ্বিতীয় আকবর রচনা করেছেন সমাধির উপরিস্থ গম্বুজ। ফকিরের পুণ্য নামের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করে নিজেকে তাঁরা ধন্য জ্ঞান করেছেন।

গিয়াসুদ্দিনের রাজধানী তোগলকাবাদ আজ বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত; বি. বি. সি. আই রেলওয়ের লাইন গেছে তার উপর দিয়ে। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় এবং টুরিষ্টদের দ্রষ্টব্য হিসাবে আজ তার গুরুত্ব। নিজামুদ্দিনের দরগায় আজও মেলা বসে প্রতি বছর, দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যকামীরা আসে দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। সেদিনের রাজধানী তার অভ্রভেদী অহঙ্কার নিয়ে বহুদিন আগে মিশেছে ধূলায়; দীন সন্ন্যাসীর মহিমা পুরুষানুক্রমে ভক্তজনের সশ্রদ্ধ অন্তরের মধ্য দিয়ে রয়েছে অম্লান। তার আকর্ষণ দূরকালে প্রসারিত।

হিন্দুর অন্তিম অভিলাষ গঙ্গাতীরে দেহরক্ষার ন্যায় শত শত বর্ষ ধরে দিল্লীর বিত্তশালীরা কামনা করেছেন আউলিয়ার কবরের নিকটে সমাধিস্থ হতে, চেয়েছেন জীবনান্তে 'মীর মজলিসের' সান্নিধ্য। তাই তার আশেপাশে আছে সংখ্যাতীত আমির-ওমরাহের সমাধি। তারই মধ্যে একটির গর্ভে আছে কবি আমির খসরুর দেহাবশেষ।

খসরুর প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর ; খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত। দিল্লীর কবিগোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। আলাউদ্দিন খিলিজীর কাব্যরসিক পুত্র খিজির খানের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল গভীর। আপন অনুপম ছন্দে গ্রন্থিত করে খিজির খানের বীরত্বকাহিনীকে তিনি কালজয়ী অমরত্ব দান করে গেছেন।

নিজামুদ্দিনের সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে আর একজন কবি রয়েছেন চিরনিদ্রিত, যাঁর রচনা আজও উর্দু সাহিত্যে অজাতশত্রু। কবি গালিবের সমাধিটি আড়ম্বরহীন, সাধারণ প্রস্তর-বেদিকায় মাত্র আবৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর উর্দু সাহিত্য অম্লান রেখেছে তাঁর স্মৃতি, কাব্যে ও গাথায়। জগতে বহু ঐশ্বর্যময় সৌধ রচিত হয় অক্ষম ব্যক্তিদের সমাধির উপরে। কিন্তু কবি 'পরে ভার থাকে নিজ মেমোরিয়্যালের।

হিন্দু যুগে রেওয়াজ ছিল না স্মৃতিসৌধের। তার কারণ মরলোকের চাইতে পরলোকের দিকে হিন্দুদের দৃষ্টি ছিল বেশী। তাই শ্মশানে দালান খাড়া করে প্রিয়জনের স্মৃতি অক্ষয় করার কথা কখনও তাদের মনে হয়নি। মৌর্যরাজদের আমল থেকে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত কোন হিন্দু রাজা রাখেননি কোন স্মৃতিসৌধ। রাজপুত রাজন্যেরা গড়েননি কোনো এতমদ্দৌলা, সফ্‌দারজঙ্গ বা হুমায়ুন'স্ টুম্ব। তাঁরা জলাশয় খনন করেছেন, মন্দির স্থাপন করেছেন, ভূমিদান, গোদান করেছেন ব্রাহ্মণকে। সমস্তই জগৎ-হিতায়। অশোক যে স্তম্ভ রচনা করেছিলেন, তা নিজ কীর্তি ঘোষণার জন্য নয়, জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে। বুদ্ধ গড়েছিলেন চৈত্য ও বিহার সঙ্ঘের জন্য ; শঙ্করাচার্য স্থাপন করেছেন মঠ বেদান্তচর্চার মানসে।

সে-যুগে হিন্দুর জীবনে শেষ কথা ছিল ভক্তি। সূর্যমুখী ফুলের মতো তার সমস্ত কর্ম, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভগবানের নামে ঊর্ধ্বমুখীন। ঐহিকের সম্পর্ককে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। যখন কা তব কান্তা কস্তে পুত্র, তখন প্রেম দিয়ে আর হবে কী ? মায়াময়মিদম্ অখিলং বিশ্বম্। কাজেই পিতাকে হতে হয়েছে পরমং

তপঃ, স্বামীকে হতে হয়েছে পতিদেবতা, স্ত্রীকে হতে হয়েছে সহধর্মিণী। নারী যে সহমৃতা হয়েছে তার কতটা প্রেমের আকর্ষণে আর কতটা পুণ্যলোভবশে তা বলা শক্ত। স্বয়ম্বরা যাঁরা হয়েছেন, তাঁরা প্রেমে পড়ে নয়। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের গলায় মালা দিয়েছিলেন তাঁর খ্যাতি ও বৈভবের জন্য, যেমন একালের তরুণীরা আংটি পরিয়ে দেন আই, সি, এসের অঙ্গুলিতে।

মুসলমানেরাই আনলো ভিন্ন জীবনাদর্শ। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তাদের নয়। তারা পরকালকে থোরাই পরোয়া করলো; ইহকালকে করলো সর্বস্ব। তারা জীবনকে করলো ভোগ, কাঁদলো, কাঁদালো এবং ভালোবাসলো। তাই নারীর জন্য করলো লুণ্ঠন, প্রেমের জন্য করলো অপহরণ এবং প্রিয়জনের জন্য হনন ও বহু অপকর্ম সাধন। বলা বাহুল্য, এর সবগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু প্রেম কি কারও সমর্থনের অপেক্ষা রাখে? মেনে চলে নীতির অনুশাসন? অহল্যা করেছে সমাজের বা শাস্ত্রের সমর্থনের অপেক্ষা? মহাভারতের অর্জুন করেছে? বৃন্দাবনের কানু করেছে? করেছে রিজিয়া বেগম, মেরী ওয়ালেউস্কা বা লেডী হ্যামিল্টন?

মুসলমানেরা প্রিয়তম-প্রিয়তমার স্মৃতিকে করতে চেয়েছে কালজয়ী। রাখতে চেয়েছে স্মারকচিহ্ন। তাই সৌধ গড়েছে পিতার, পতির, পত্নীর এমন কি উপপত্নীর সমাধিতে। হিন্দুরা তপস্বী, তারা দিয়েছে বেদ ও উপনিষদ। মুসলমানেরা শিল্পী, তারা দিয়েছে তাজ ও রঙমহল। হিন্দুরা সাধক, তারা দিয়েছে দর্শন। মুসলমানেরা গুণী, তারা দিয়েছে সঙ্গীত। হিন্দুর গর্ব মেধায়, মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের। এই দুই নিয়েই ছিল ভারতবর্ষের অতীত; এ দুই নিয়েই হবে তার ভবিষ্যৎ। একটিকে বাদ দিলেই হয় পাকিস্তান,—মিষ্টার মহম্মদ আলী জিন্না না চাইলেও।

যাত্রাসহচরী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একটি ক্ষুদ্র মর্মর সমাধির প্রতি। সেটি সম্রাটদুহিতা জাহানারার।

ইতিহাসে সম্রাট আলমগীরের শাসন বিধর্মী নির্যাতনের দুরপনেয় কলঙ্কে মলিন ; সে-তথ্য স্কুলপাঠ্য পুস্তকে আছে। কিন্তু এই হৃদয়হীন অথচ অমিতবিক্রম যোদ্ধা নৃপতির জীবন যে দু'টি বিশিষ্ট উপক্রুতা বন্দিনীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত ছিল, সে-কথা যথোচিত বিদিত নয় জগতে।

জাহানারা ও জেবুন্নেসা দু'জনেই ছিলেন আওরঙ্গজেবের অতি নিকটতম আত্মীয়া। একজন অনুজা, অপর জন আত্মজা। দু'জনেই ছিলেন রূপসী, দু'জনেই ছিলেন অসাধারণ নির্ভীক ও তেজস্বিনী। দু'জনেই চিরকুমারী এবং দু'জনেরই জীবনের সুদীর্ঘকাল কেটেছে আওরঙ্গজেবের কারাগৃহে।

কিন্তু আরও এক জায়গায় এই দুই দুর্ভাগিনীর মিল ছিল গভীরতর। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন কবি। মুঘল যুগের মহিলা কবি।

জাহানারার সমগ্র রচনা সযত্নে রক্ষিত হয়নি। গহন অরণ্যে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো প্রায় সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে ধূলিতে হয়েছে বিলীন, দু'একটি মাত্র নিদর্শন আছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

জেবুন্নেসার কাব্যখ্যাতি অধিকতর বিস্তৃত। 'জেব-উল্-মুনশোয়াতে' সত্যিকার কাব্যপ্রতিভার চিহ্ন আছে। বিখ্যাত পারশ্য কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ানে মখ্ফীর' রচয়িত্রীরূপেও জেবুন্নেসার উল্লেখ আছে অনেক গ্রন্থে, যদিও পণ্ডিতেরা সম্প্রতি সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন।

জাহানারা আমাকে আকৃষ্ট করেছে শৈশব থেকে। ইতিহাস পরীক্ষার পূর্বক্ষণে সন তারিখে কণ্টকাকীর্ণ মুঘল কাহিনী কণ্ঠস্থ করার দুরূহ প্রয়াস করতেম প্রাণপণে দীর্ঘরাত্রিব্যাপী। ঘুমে চোখের পাতা আসতো জড়িয়ে, দেহ হতো অলস, মাথা ঝিমিয়ে পড়তো ঢুলুনিতে। ওরই মধ্যে জাহানারার উপাখ্যান পড়ে কল্পনায় আঁচ করার চেষ্টা করতাম তাঁর চেহারা।

প্রথম যৌবনে জাহানারা পাদশাহ বেগমের মর্যাদা ভোগ করেছেন বিপুল মহিমায়। হারেমে করেছেন একাধিপত্য। অপ্রতিহত অনুগ্রহ ও শাসন বিতরণ করেছেন দুই হস্তে। কন্যাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সাজাহানের প্রিয়তরা। তাঁরই জন্য সম্রাট তৈরী করেছিলেন দিল্লীর জুম্মা মসজিদ, ভারতের বৃহত্তম মুস্লিম ভজনালয়।

জাহানারার স্নেহভাজন ছিল এক বাঁদী। অতর্কিতে একদিন আগুন লাগল তার বসনে। সে-আগুন নেভাতে গিয়ে সাহ্‌জাদী নিজে দগ্ধ হলেন সাংঘাতিকরূপে। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে এল হাকিম, হলো নানা রকম এলাজ। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। সম্রাটনন্দিনীর জীবনসংশয় দেখা দিল।

বিচলিত সাজাহান এত্তালা দিলেন এক সাহেব চিকিৎসককে। গ্যাব্রিয়েল বাউটন। সুরাটে ইংরেজের কুঠির ডাক্তার। বাউটন বললেন, ওষুধ দিতে হলে রোগিনীকে চোখে দেখা চাই। শুনে সভাসদেরা হতবাক হলেন। বলে কি বেয়াদপ, শাহনশাহ বাদশাহের জেনানা মানে না কম্‌বক্ত? কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতৃস্নেহ জয়লাভ করলো সামাজিক প্রথার উপরে। সাজাহান সম্মত হলেন বাউটনের প্রস্তাবে। অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য লাভ করলেন জাহানারা। তাঁর অনুরোধে সাজাহান বাউটনকে দিতে চাইলেন পুরস্কার, যা চাইবে তাই পাবে।

আভূমিনত কুর্নিশ করে বাউটন বলল, নিজের জন্য কিছুই চাইনে। কলকাতার একশ'চল্লিশ মাইল দক্ষিণে বালাশোরে ইংরেজের কুঠি নির্মাণের জন্য প্রার্থনা করি একটুকরো ভূমিখণ্ড। ইংরেজকে দান করুন এদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার।

বাউটনের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। স্বজাতিহিতৈষণার এত বড় দৃষ্টান্ত আর একটি মাত্র আছে আধুনিক কালে। সেটি ইহুদী বৈজ্ঞানিক ডক্টর কাইম ভাইজমানের।

১৯১৬ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের যখন সঙ্কটজনক কাল, ইংলণ্ডে

বিস্ফোরক উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান অ্যাসিটোনের অভাব, তখন কৃত্রিম অ্যাসিটোন তৈরীর ভার নিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ বললেন, প্রফেসর, সমগ্র ব্রিটেনের ভাগ্য নির্ভর করছে তোমার সফলতা বিফলতার উপরে। আমি চাই তাড়াতাড়ি কাজ, তাড়াতাড়ি ফললাভ।

অধ্যাপক বললেন, তথাস্তু।

দিবারাত্রির অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে আবিষ্কার করলেন কৃত্রিম অ্যাসিটোন। পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন ব্রিটেনকে এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ভাইজমান।

কৃতজ্ঞ লয়েড জর্জ তাঁকে ডেকে দিতে চাইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

ভাইজমান প্রত্যাখ্যান করলেন সবিনয়ে।

লয়েড জর্জ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পিয়ারেজ ? অর্থ ?

"কিছু নয়। একটি মাত্র যাচ্ঞা আছে আমার। আমার স্বজাতির জন্য চাই নির্দিষ্ট একটি দেশ ; ইহুদীদের ন্যাশন্যাল হোম।"

কিছুকাল পরে বালফোর ঘোষণায় ইহুদীদের জন্য প্যালেস্টাইনে নির্দিষ্ট হলো জাতীয় বাসস্থান। অবশ্য কাগজে পত্রে। আজও প্রকৃত অধিকার স্থাপিত হলো না ইহুদীদের। বরং ইদানীং কনসার্ভেটিভরা প্যালেস্টাইনে আরবদেরই করতে চাইছেন সুয়োরাণী, মধ্য প্রাচ্যে ইংরেজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে। কৃতজ্ঞতা কথাটা আছে ইংরেজের ভাষায়, নেই ইংরেজ চরিত্রে!

জাহানারার অনুগ্রহে ইংরেজেরা বাণিজ্য নিরঙ্কুশ করলেন ভারতবর্ষে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করলেন সকলের অলক্ষ্যে। সেই জাহানারার চরিত্রেই কলঙ্ক আরোপ করে ইতিহাস রচনা করেছে ইংরেজ। এতে বিস্মিত হইনে। যে সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের পেন্সনে স্ট্যাফোর্ডশায়ারে বাড়ী হাঁকিয়ে আছেন, তিনিই ভারতের নিন্দা করেন সব চেয়ে জোর গলায়। লিওপোল্ড এমারীই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সব চেয়ে বড় শত্রু, কারণ তাঁর জন্ম গোরখপুরে।

জাহানারার জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যগুলি বেদনাবিধুর।

সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারাশিকো ছিলেন পিতার সর্বাপেক্ষা প্রীতিভাজন। কিন্তু তাঁর আনুরক্তি ছিল খ্রীস্ট ধর্মে। সেটা মুস্লিম সমাজে জনপ্রিয়তার উপায় নয়। পিতার অসুস্থতার সংবাদে সুজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে রওনা হলেন দিল্লী অভিমুখে। বারাণসীর যুদ্ধে দারা তাঁকে করলেন পরাজিত। আওরঙ্গজেব তখন মোরাদকে বললেন, এ ছলনা চাতুরীময়, পৃথিবীর কোন কিছুতেই লোভ নেই তাঁর। তাঁরা দু'জনে মিলে দারাকে পরাজিত করলে সাজাহান যদি পরলোগকত হন—আল্লার দোয়ায় তিনি যেন সেরে উঠেন—তবে দিল্লীর সিংহাসন হবে তাঁর অর্থাৎ মোরাদের।

মদ্যপ মোরাদের প্রতীতি হলো এই আশ্বাসে। দারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন পাঞ্জাবে, এক উৎসব রজনীর অবসানে সুরামত্ত মোরাদ হলো বন্দী, আওরঙ্গজেব নিজকে ঘোষণা করল সম্রাটরূপে, পিতা সাজাহানকে কয়েদ করে আবদ্ধ করল আগ্রা দুর্গের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে।

আওরঙ্গজেব জাহানারাকে দিতে চেয়েছিলেন পাদশাহ বেগমের পদ। কিন্তু জাহানারা প্রত্যাখ্যান করলেন সে অনুরোধ। স্বেচ্ছায় বরণ করলেন সাজাহানের সহ-বন্দীত্ব। পিতার পরিচর্যার জন্য। চতুর্দিকে ক্রূর প্রবঞ্চনা, সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতার ঘন অন্ধকারের মধ্যে সেদিন একমাত্র জাহানারা রইল অচল, অটল, অকম্পিত দীপশিখার মতো দীপ্তিময়। সাজাহানের দ্বিতীয় কন্যা রোশেনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ নিলেন, হলেন তাঁর প্রিয়পাত্রী। দিল্লীর সিভিল লাইনসে আছে তাঁর উদ্যান। সেখানে এ আমলে স্থাপিত হয়েছে রোশেনারা ক্লাব, দিল্লীর মণ্টিকার্লো। দশ টাকা পয়েণ্টে স্টেকে ব্রিজ খেলার খ্যাতি আছে তার উত্তর ভারতে।

দিনের পর দিন গত হয়, মাসের পর মাস। চক্রাকারে আবর্তিত হয় ষড় ঋতু। গ্রীষ্ম গত হয় তার উত্তাপ ও প্রভঞ্জন আহুতি নিয়ে।

বর্ষায় মেঘকজ্জল দিবসের দীর্ঘ ছায়া নামে যমুনার কালো জলে। বর্ষণমুখর রাত্রির বিদ্যুৎ চমকে উৎফুল্ল ভবন-শিখীরা নৃত্য করে প্রাসাদের মর্মর অলিন্দে। শরতের আলো-ছায়া বিজড়িত প্রভাতে নদীতীরে কাশের বনে লাগে দোলা। হেমন্ত আনে কুহেলী; শীত দেয় হুতশ্বাস। বসন্তে ফুলের মঞ্জরী আন্দোলিত হয় শিরীষের শাখা প্রশাখায়। আগ্রার প্রাসাদ প্রাচীরের অন্তরালে জাহানারার বন্দী-জীবনে একটি করে বৎসর হয় বৃদ্ধি, আয়ু থেকে খসে পড়ে একটি করে বছর। কর্মহীন অবসরে শাহ্‌জাদী কবিতা রচনা করেন আপন মনে।

একদা নিশীথকালে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে সাজাহানের কাছে এসে পৌঁছল একটি সুদৃশ্য মোড়ক। পুত্র পাঠিয়েছে পিতাকে উপহার। তবে কি অনুতপ্ত পুত্রের ক্ষমা প্রার্থনার প্রথম নিদর্শন? আগ্রহকম্পিত হস্তে বৃদ্ধ সাজাহান খুললেন মোড়ক। পরতের পর পরত। খুলতে খুলতে শেষকালে হাত থেকে গড়িয়ে পরল সাজাহানের প্রিয়তম পুত্র দারাশিকোর খণ্ডিত মুণ্ড। সম্রাট মূর্ছিত হয়ে পড়লেন জাহানারার অঙ্কে।

সাজাহানের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাহানারা রইলেন তাঁর পাশে। স্থবির পিতার পরিচর্যা করলেন অমিত নিষ্ঠা ও অবিচলিত ধৈর্যে। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রত্যাবর্তন করলেন দিল্লীতে।

অবশেষে রমজানের এক পুণ্য তিথিতে মৃত্যুর শান্ত শীতল ক্রোড়ে মুক্তিলাভ করলো বন্দিনী। তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর দেহ সমাধিস্থ হলো ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির পার্শ্বে। সে সমাধির উপরে না রইল মণ্ডপ, না রইল আচ্ছাদন, না রইল ঐহিক ঐশ্বর্যের লেশমাত্র আভাস। শুধু তাঁরই স্বরচিত একটি কবিতা উৎকীর্ণ হলো তার গায়ে,—

"বেগায়র সবজা না পোশাদ কসে মাজারে মারা
কে কবর পোষে গরিবান্ হামিন্ গিয়াহ বসন্ত।"

"একমাত্র ঘাস ছাড়া আর যেন কিছু না থাকে আমার সমাধির উপরে। আমার মতো দীন অভাজনের সেই তো শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন।"

পুণ্যশ্লোক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অনুগামিনী সাজাহান দুহিতা নশ্বর জাহানারার এইতো যোগ্য সমাধি।

আসন্ন সন্ধ্যার শান্ত নিস্তব্ধতায় শ্রদ্ধানম্র চিত্তে সামনে এসে দাঁড়ালেম আমরা তিন দর্শনার্থী। কারো মুখে ছিল না কথা, কিন্তু মনে ছিল ভাব।

নব শ্যাম দূর্বাদল ছেয়ে আছে ক্ষুদ্র নিরলঙ্কার সমাধি। নির্মল নীল আকাশ থেকে প্রত্যহ নিশীথে সিঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির, প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ অরুণের প্রথম কিরণরেখা, সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে গোধূলি আলোকের সোনালী আভা। তারা কি পায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে সমাধিস্থ সেই অঙ্গের ললিত সুবাস? পায় তাঁর সুকুমার বক্ষের নীচে ভক্তিনত হৃদয়ের মৃদু স্পন্দন ধ্বনি?

পাঁচ

প্রভাতের সব চেয়ে বড় সেন্‌সেশন। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে ক্রীপস প্রস্তাবের সার মর্ম। নিজস্ব সংবাদদাতার বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া বিবরণ। শোনা গেল, গভর্ণমেণ্ট বিচলিত হয়েছেন এ সংবাদ প্রকাশে। গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তারা তদন্ত সুরু করেছেন সংবাদের সূত্র সম্পর্কে।

সাংবাদিক মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। কারণ প্রস্তাবগুলির কিছুটা আঁচ আমরা সবাই পেয়েছিলাম গত ক'দিন ধরেই। প্রকাশ করা হয় নি, জেন্‌ট্‌লমেনস এগ্রীমেণ্ট স্মরণ করে। ইংরেজ ও আমেরিকান সহ-সংবাদদাতারা অনুমান করলেন, ভাইসরয়'স্‌ কাউন্সিলের কোনো মহামান্য সদস্যের কাছ থেকে বেরিয়েছে এ খবর।

জনশ্রুতি এই যে, ক্রীপস যে-দিন এলেন, বেলা সাড়ে বারোটা থেকে অনাহারে ভাইসরয়'স্‌ হাউসে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এই মাননীয় সদস্যগণ। বেলা দুটোয় এলেন ক্রীপস। লর্ড লিনলিথগো আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে সারিবন্দী দণ্ডায়মান নিজ সহকর্মীদের। ক্রীপস করমর্দন করলেন সবার সঙ্গে, নিরাসক্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন "হাউ ডু ইউ ডু?" দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে মুহূর্তে অন্তর্হিত হলেন আপন নির্দিষ্ট কক্ষে।

তাঁরা আশা করেছিলেন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে ক্রীপস তাঁর প্রস্তাব আলোচনা করবেন তাঁদের সঙ্গে, জানতে চাইবেন তাঁদের অভিমত। সেদিক দিয়েও হতাশ হলেন। ক্রীপস প্রস্তাবের সারমর্ম অনুদ্ঘাটিত রইল তাঁদেরও কাছে। আশ্চর্য নয় যে, তাঁরা ক্ষুণ্ণ হলেন। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর হলেও, হাজার হোক, মানুষের শরীর তো! শোনা যায়, অবশেষে ভাইসরয়ের সুপারিশে

বিগত রাত্রে লাট প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক ভোজ সভায় ক্রীপস তাঁর প্রস্তাবের চুম্বক জানিয়েছেন তাঁদের। আজই প্রভাতে সংবাদপত্রের উৎসাহী নিজস্ব রিপোর্টারের জবানীতে ঘটলো তার প্রকাশ। ধূম দ্বারা যদি পর্বতের বহ্নি অনুমান করা সম্ভব হয়, তবে বিদেশী সংবাদদাতাদের সন্দেহ একেবারে অগ্রাহ্য করা কঠিন।

সংবাদ 'স্কুপ' করার অধিকার সাংবাদিকের আছে। কিন্তু তারও একটা অলিখিত মাত্রা আছে। জাতির বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ যেখানে জড়িত, সেখানে সাংবাদিকের আপন বিবেক সেন্সর করে তার কপি। এডোয়ার্ড দি এইট্থের রাজ্য ত্যাগের ঘটনা মনে পড়ছে সুস্পষ্ট। মে মাস থেকে ব্রিটেনের সকল সংবাদপত্র জানতো সিম্পসন-এডোয়ার্ড প্রণয় কাহিনী। ফ্লিট ষ্ট্রীটে কানাঘুষায় শুনেছি বহুবার। কেউ প্রকাশ করেনি মুদ্রিতাক্ষরে। সরকারী দপ্তরে কোনো অনুশাসন ছিল না, ছিল না কোনো আইনগত বাধা। একদিন জার্মানির বিরুদ্ধে সেকেণ্ড ফ্রন্ট হবে। কোথায়, কোনখানে করবে মিত্রশক্তি আক্রমণ সে-তথ্য জানা হয় তো সম্ভব হতে পারে স্টুয়ার্ট গেল্ডার, বা ড্রু পিয়ার্সনের। তাঁরা কদাচ প্রকাশ করবেন না সে সংবাদ, যদিও ক্রীপস প্রস্তাবের চাইতে সে কম বড় 'স্কুপ' নয়।

সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন সততার। ক্রীপস আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন ব্রিটেন এবং ভারতের কল্যাণের নামে। আমরা সবাই সম্মতি দিয়েছিলাম বিনা প্রতিবাদে। পূর্ব প্রকাশের দ্বারা এই ভারতীয় সাংবাদিক ভঙ্গ করলেন সে-প্রতিশ্রুতি। তাই লজ্জিত বোধ করছি আমরা সমস্ত ভারতীয়েরা। জেণ্টলম্যানরা যদি জার্নলিস্ট হতে পারেন, তবে জার্নলিস্টরা জেণ্টলম্যান হতে পারবেন না কেন?

ভাইসরয়'স হাউস থেকে ক্রীপস্ এসেছেন তিন নম্বর কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার এণ্ড্রু ক্লো-র বাংলোয়। ক্লো আসামের আগামী গভর্ণর। গদি দখলের

আগে দু'মাসের ছুটি নিয়ে গেছেন মুসৌরী না আলমোড়ায়, বিশ্রাম মানসে।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের বাড়িগুলি সরকারী। সুদৃশ্য। একতলা দালান। ঈষৎ পীতাভ রং; সামনে অতিবিস্তৃত অঙ্গন। এত বড় যে দু'দিকে গোলপোস্ট খাড়া করে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ খেলা যায়। সবুজ ঘাস, লন্-মোর দিয়ে পরিপাটি ছাঁটা। মাঝখানে বৃত্তাকার ফুলের কেয়ারী। তাকে বেষ্টন করে টক্‌টকে লাল সুরকির রাস্তা; মোটর ঘোরাতে বেগ পেতে হয় না এতটুকুও। ফটকের গায়ে এক পাশে কাচের উপরে বড় হরফে লেখা বাড়ির নম্বর। কাচের একদিকে ছোট্ট একটু খুপরি। রাত্রিবেলায় তাতে লণ্ঠন জ্বেলে রাখা হয়, অনেক দূর থেকেও যাতে বাড়ির নম্বরটা চোখে পড়ে। দালানের সম্মুখে পোর্চ, তার নীচে গাড়ি দাঁড়ায়। বারান্দার দু'পাশে দুটি ছোট কুঠুরি। সেখানে অনারেবল মেম্বারের সেক্রেটারী ও স্টেনোগ্রাফারের দপ্তর।

হুবহু একই ধরণের ছ'টি বাড়ি। সেক্রেটারিয়টের সুমুখ থেকে দুই বাহুর মতো দুদিকে প্রসারিত দুটি রাস্তা—কিং এডোয়ার্ড ও কুইন্ ভিক্টোরিয়া রোডের উপরে। যেন ছ'টি যমজ ভাই, ডিয়োনি কুইণ্টোপ্লেটসের দোসর।

আতিশয্যের দ্বারা অত্যন্ত ভালো জিনিষকেও যে কতখানি হাস্যকর করে তোলা যায় তার দৃষ্টান্ত আছে নয়াদিল্লীর নগর-পরিকল্পনায়। ইউনিফর্মিটির বাতিকে পাওয়া স্থপতিরা সহরটাকে শ্রী দিতে গিয়ে ছাঁচ দিয়েছেন, বাড়ি দিতে গিয়ে ব্যারাক্। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে মূলগত ঐক্যকে প্রকাশ করার নাম সৃষ্টি। গজ, ফুট বা ইঞ্চি মিলিয়ে সামঞ্জস্য বিধানের নাম নকলনবীশী। প্রথমটা যিনি করেন তাঁকে বলি ব্রহ্মা, দ্বিতীয়টা যিনি করেন তাঁর নাম বিশ্বকর্মা। প্রথমটার মধ্যে আছে আর্ট, পরেরটার মধ্যে আছে ক্র্যাফট্।

পুরাকালে নগর-পত্তনের গোড়াতে ছিল নৃপতি। রাজার অবস্থিতি

ও অভিরুচি অনুসরণ করে গড়ে উঠত জনপদ, তাঁর প্রাসাদকে কেন্দ্র করে আমীর ওমরাহেরা তুলতো সৌধ, সাধারণেরা বাঁধতো বাসা, শ্রেষ্ঠীরা সাজাতো বিপণি। রাজশক্তির পতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে রাজধানীর ভাগ্যে এসেছে বিপর্যয়, নগরনগরীর ঘটেছে বিলুপ্তি বা বৃদ্ধি। আগ্রা, আওরঙ্গাবাদ ও ফতেপুরসিক্রিতে আজও রয়েছে তার নির্ভুল নিদর্শন।

একালে রাজ্যের চাইতে বাণিজ্যের কদর বেশী। লেডী ডাক্তারের স্বামীর মতো রাজার মহিমাও এখন আর আপন বীর্যবত্তায় নয়, প্রজাদের বাণিজ্যবিস্তারে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্য দেশেও এখন বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে—কখনও স্বনামে কখনও বা বেনামীতে। তাই এযুগের মহানগরী centre of gravity থাকে ক্লাইভ ষ্ট্রিটে বা হর্নবি রোডে। তাদের প্রেরণার মূল চেম্বার অব প্রিন্সেস নয়, চেম্বার অব কমার্স। তাই ওয়াশিংটনের চাইতে নিউইয়র্কের গুরুত্ব হয় বেশী, লক্ষ্ণৌকে ছাপিয়ে ওঠে কানপুর, পাটনাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় টাটানগর।

আধুনিক ভারতবর্ষে নয়াদিল্লী হচ্ছে একমাত্র সিটি যেখানে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রভুত্ব নেই। সেখানে বৈশ্য নেই। ব্রাহ্মণও না। আছে শুধু ক্ষত্রিয়। অবশ্য তাদেরও আয়ুধের পরিবর্তন ঘটেছে। মডার্ন ক্ষত্রিয়েরা অসিজীবী নয়, মসীজীবী। প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা ব্যূহ রচনা করে হাত পাকিয়েছিলেন। তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ব্যাস সবই রুলমাফিক্। আধুনিক ক্ষত্রবীরেরা ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে হাত এবং চুল দুই-ই পাকিয়ে দেন, তারও নির্দেশ হলো Precedent। সুতরাং নয়াদিল্লীর পথ, ঘাট, বাড়ি, ঘর সব কিছুরই পিছনে আছে কেবলই এক রকম হওয়ার প্রয়াস। দোকান-পাট থেকে সুরু করে রাস্তা, পার্ক, কোয়ার্টার, মায় পথের পাশে জামগাছের সারি পর্যন্ত সব কিছুই যেন খাকী কোর্তা-পরা পল্টনের মতো সঙ্গীন উঁচিয়ে— এটেন্‌শনের ভঙ্গিতে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

নতুন আস্তানায় ক্রীপসের সভা বসলো পাত্র-মিত্র নিয়ে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড, এবং কানাডার সমাজতন্ত্রী গ্রেহাম স্প্রাই আছেন তাঁর দপ্তরে।

কুপল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একবার লণ্ডনের এক বিতর্ক-সভায়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য আছে যথেষ্ট, ঔদার্য আছে কিনা জানিনে।

ক্রীপসের সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করেছেন মৌলানা আজাদ, গান্ধীজি, পণ্ডিত নেহেরু ও মিস্টার জিন্না। আজাদের সঙ্গে দোভাষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আর এক জন কংগ্রেসী মুসলমান। ব্যারিস্টার, মিস্টার আসফ আলী। আসফ আলীর জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশ, কর্মস্থান দিল্লী, শ্বশুরবাড়ি বাংলায়। তাঁর স্ত্রী অরুণা আসফ আলীর পৈতৃক উপাধি ছিল গাঙ্গুলী, অতি নিকট আত্মীয় সম্পর্ক আছে রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরাদেবীর সঙ্গে।

পণ্ডিত জওহরলালের ইংরেজী জ্ঞানের খ্যাতি তাঁর দেশপ্রীতিরই মতো বহুবিদিত। জীবিত ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যেও তাঁর তুল্য ইংরেজী রচনাকুশল বড় বেশী নেই, এ-কথা স্বীকার করেছেন বহু ইংরেজ। গান্ধীজির ইংরেজী জওহরলালের ন্যায় সাহিত্য-প্রধান নয়, কিন্তু তার স্বচ্ছতা ও অলঙ্কারহীন মাধুর্য বহুক্ষেত্রে বাইবেলের ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মিস্টার জিন্না ছিলেন প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী। ইংরেজীতে সওয়ালে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। ক্রীপসের সঙ্গে একটি মাত্র লোক আলাপ করেছেন—ক্রীপসের ভাষায় নয়, নিজের ভাষায়। ইংরেজীতে নয় উর্দুতে। যদিও কাজ চালাবার মতো ইংরেজী তিনি জানেন বলে জনশ্রুতি শুনেছি বহু বার। মৌলিকতা আছে মৌলানা আজাদের। তাঁর জয় হোক্।

ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয়, কিন্তু ইংরেজী আমাদের শিখতে হয়। তাতে ক্ষোভ নেই। হয়তো লাভই আছে।

স্বাজাতিকতার আধুনিক ধারণা, ইংরেজীতে যাকে বলে ন্যাশন্যালইজম, তার বেশীটা আমরা পেয়েছি ইংরেজী শিক্ষার ফলে। কিন্তু এদেশে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্মকুশলতার মাপকাঠিও দাঁড়িয়েছে ইংরেজী বলা ও লেখার কৃতিত্বে। এটা হাস্যকর। কলেজে পরীক্ষার খাতায় যে ছেলে ভালো ইংরেজী লেখে, চাকুরীর বাজার থেকে বিবাহযোগ্যা কন্যার উদ্বিগ্না জননী পর্যন্ত সর্বত্র তার আদর আছে। এ-দেশের নেতাদের সম্পর্কেও তাই বিদেশী পর্যটকেরা যখন বলে যে he speaks faultless English আমরা তখন আনন্দে গদগদ হই। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা সতেজ প্রতিবাদ আছে মৌলানা আজাদের আচরণে। ক্রীপসই হোক, ভাইসরয়ই হোক, কিম্বা স্বয়ং জর্জ দি ফিফ্‌থই হোক, যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভাষা না বলতে চায় বা না পারে তবে আমিই বা তার ভাষা বলতে যাবো কেন? সাবাস্‌!

গান্ধীজি ক্রীপসের কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। তাঁকে বারান্দার সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দিতে সঙ্গে এলেন ক্রীপস্‌। মুহূর্তমধ্যে সাংবাদিকেরা চক্রব্যূহ রচনা করলেন তাঁকে ঘিরে। চোখে তাঁদের জিজ্ঞাসা, মুখে তাঁদের আগ্রহ, উত্তেজনা ও উদ্বিগ্নের ছাপ। স্মিতহাস্যে উদ্বেলিত জনতাকে অভ্যর্থনা করলেন তিনি। বিনাবাক্যে নিরস্ত করলেন বহু উদ্যত প্রশ্ন।

ক্রীপসের রসবোধ আছে। রহস্য করে বললেন, গান্ধীজির হাসি দেখে সাংবাদিকেরা যেন ক্রীপস প্রস্তাবের গুণ বিচার না করেন। ঘর থেকে বেরোবার সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে তিনি গান্ধীজিকে শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রবল হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো এই কৌতুকালাপে।

কিন্তু কাশীর পাণ্ডা, বিয়ের ঘটক ও বীমার দালালের চাইতেও নাছোড়বান্দা আছে জগতে। তার নাম রিপোর্টার। গান্ধীজির আলোচনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তাঁরা। অঙ্গুলি নির্দেশে

ক্রীপসকে দেখিয়ে উত্তর করলেন মহাত্মা, "ওকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার কিছুই বলার নেই।"

"প্রস্তাবটি এমনই চীজ যে, দেখেই আপনি হতবাক্?" প্রশ্ন করলেন এক ঝানু সাংবাদিক।

"You naughty boy" বলে প্রসন্ন হাস্যে সমাপ্তি ঘটালেন আলোচনার। মোটরে উঠে যুক্তকরে অভিবাদন করলেন উপস্থিত জনমণ্ডলীকে। প্রস্থান করলেন বিরলা ভবনোদ্দেশে।

ইনফরমেশন বিভাগের ক্যাম্প হয়েছে পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, সাংবাদিকদের সুবিধার্থে। সেখানে হানা দিচ্ছি আমরা রিপোর্টারের দল প্রত্যহ প্রাতে, দুপুরে, বিকালে ও সন্ধ্যায় অমিত উৎসাহে। যদিও কবে কখন কোন ভারতীয় নেতা ক্রীপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন তার বেশী আর কিছুই জানার উপায় নেই সেখান থেকে।

ক্যাম্প অফিসের কর্তা জগদীশ নটরাজন, ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মারএর প্রতিষ্ঠাতা বম্বের বিখ্যাত সাংবাদিক কে, এস, নটরাজনের পুত্র। পাইওনীয়রের সম্পাদকগোষ্ঠী থেকে এসেছেন গভর্ণমেণ্টে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য জানেন অনেক, ইংরেজী বলেন স্বচ্ছন্দে, উচ্চারণে নেই ভদ্রজনোচিত ধ্বনিবিকৃতি। একদিন নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল তাঁর গৃহে।

নটরাজন গৃহিণী মাদ্রাজী নন,—এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তাঁর পিতৃকুল বৰ্ পরিবারের খ্যাতি আছে টেনিস খেলায়, মাতৃকুলের মূল অনুসন্ধান করা যায় বঙ্গদেশে। তাঁর মাতামহী ব্যানার্জীকন্যা ছিলেন, সে হিসাবে বল্লাল সেনের সৃষ্ট কৌলীন্যে দাবী আছে। পিয়ানো বাজাতে পারেন চমৎকার।

আধুনিক অনেক প্রগতিশীল বাঙ্গালী পরিবারেরও ভারতীয় রূপটি খুব স্পষ্ট নয়। গৃহের কর্তা হয়তো বিদ্যার্জন করেছেন বিদেশে। অক্সফোর্ডে ইংরেজী, গ্লাসগোতে এঞ্জিনীয়ারিং, এডিনবরায় ডাক্তারী বা লিঙ্কনস্ ইনে ব্যারিস্টরী পড়ে দেশে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন

কর্মজীবনে, অর্থার্জন করছেন অজস্র ধারে। তাঁদের বসনে স্যুট, অশনে সুপ এবং আসনে কৌচ। তাদের গৃহিণীরা পার্টি দেয়, ক্লাবে যায়, ব্রিজ খেলে পুরুষ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অসঙ্কোচে। সে গৃহে চাকরেরা বয়, মায়েরা মেমসাব এবং মেয়েরা মিসিবাবা।

বিলাতে না গিয়ে যাঁরা সাহেব তাঁরা আরও দুর্ধর্ষ। কংগ্রেস থেকে লীগে যোগ দেওয়া মুসলমানের মতো, হিরোডকে করেন আউট হিরোড। স্লিপিং পায়জামা না পরে ঘুমানো বা ছুরি কাটা দিয়ে না খাওয়াকে তাঁরা প্রায় মধ্য যুগের গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন বা সতীদাহের ন্যায় রোমহর্ষক বর্বরতা জ্ঞান করে থাকেন।

তবুও একথা মানতেই হবে যে ইংরেজ অথবা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিয়ে করে আমরা আমাদের সংস্কৃতির মূল থেকে যেমন নিঃশেষে উৎপাটিত হই এমন আর কিছুতেই নয়। বাঙ্গালী গৃহিণীরা যতই চুল খাটো করুক, গিমলেট গিলুক, রংকরা ঠোঁটের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ফিরিঙ্গী উচ্চারণে ভুল ইংরেজী বলুক, সংস্কার থাকে Coty বা ম্যাকস্‌ফ্যাক্টর ঘষা চামড়ার তলায়। রক্তে থাকে ঠাকুমা দিদিমাদের অন্ধ বিশ্বাসের রেড কর্পাসল। তাই মেয়ের বিয়ের দিন ঠিক করতে খোঁজ পড়ে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার, স্বামীর অসুখে লুকিয়ে মানত করেন সুবচনীর, ছেলের কল্যাণ কামনায় ষষ্ঠীর দিনে থাকেন উপোস। পুরুষেরা হোটেলে যতই খান স্টেক বা ভিল, মা-বাবার শ্রাদ্ধ করেন গুরু পুরোহিত ডাকিয়ে যথারীতি।

সব চেয়ে দুর্ভাগা ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জনক-জননীর সন্তানেরা। তারা পিতার সমাজ থেকে বিচ্যুত, মাতার সমাজ দ্বারা বর্জিত। তারা না ভারতবর্ষের, না ইংলণ্ডের। কোন্ দেশের প্রতি তাদের দেশাত্মবোধ জাগবে, কোন্ জাতির প্রতি মমত্ববোধ? তারা বাবার কাছে পাবে নামের পদবী, মায়ের কাছ থেকে পাবে গায়ের রং, কার কাছ থেকে পাবে মনোভাব? তারা সত্যিকার বর্ণসঙ্কর, শুধু জন্মে নয়, আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে। ভারতীয়-য়ুরোপীয়ের বিবাহজাত

সন্তানেরা আজ পর্যন্ত হয়নি কোন উঁচু দরের শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা সঙ্গীতজ্ঞ। তাদের দৌড় বড় জোর রেলের বড় সাহেব নয় তো টেলীগ্রাফের ডিরেক্টর।

য়ুরোপের সমাজ অনেকটা সার্বজনীন। ইংলণ্ড থেকে ইটালী পর্যন্ত মোটামুটি তার একই রূপ। ইংরেজ, ফরাসী, চেক, হাঙ্গেরিয়ানের প্রায় একই বেশ, একই পরিবেশ, একই আচার-আচরণ। সমগ্র য়ুরোপে লোক ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার ও সাপারে বসে ঘড়ি ধরে, খায় ছুরি কাটায়। থিয়েটার যায় শনিবার রাত্রে, গির্জায় জানু পেতে ভজনা করে রবিবারে। ভাষার বিভেদ ছাড়া য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সামাজিক মিল আছে সর্বত্র। লণ্ডনে ইংরেজ স্বামীর অষ্ট্রিয়ান স্ত্রীকে দেখেছি অন্য আর পাঁচজন ইংরেজ গৃহিণীর মতো অনায়াসে সমাজে প্রতিষ্ঠিতা। স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে তার গৃহের সঙ্গে অন্য আর পাঁচটি ইংরেজ পরিবারের নেই তফাৎ। ছেলে মেয়েরা বেড়ে উঠছে ঠিক অন্য আর পাঁচটি ডিক, পল বা হ্যারিংটন পুত্র-কন্যার মতো। অবশ্য সমস্যা যে একেবারে নেই, তা নয়। সে সমস্যা প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যক্ষ-গোচর নয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষণে দেখা দেয় স্বামী-স্ত্রীর মনে। যেমন, লর্ডসে টেস্ট ম্যাচের সময় কোন্ পক্ষের এ্যশেজ লাভ কামনা করবে ইংরেজ স্বামী আর অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রী? মহাযুদ্ধে, কার জয়লাভে উৎফুল্ল হবে জার্মান মিষ্টার, কোন পক্ষের পরাজয়ে মুহ্যমান হবেন তাঁর রাশিয়ান মিসেস্?

তবুও দূর ভবিষ্যতে কোনো দিন ইউনাইটেড স্টেট্স অব য়ুরোপ যদি গড়ে ওঠে, যদি সম্ভব হয় এক কথ্য ভাষা, তবে কল্পনা করা কঠিন নয় য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকতর বৈবাহিক যোগাযোগ। তখন স্পেনের তরুণ হামেশা বিয়ে করবে নরওয়ের তরুণী ঠিক যেমন এখন করে স্কচেরা ওয়েলসের। যেমন আমাদের কোন্নগরের কনে'কে ঘরে নিয়ে আসে, বরিশালের বর।

ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জীবনের মর্ম আলাদা, সমাজের গঠন বিভিন্ন। একান্নবর্তী পরিবারের কথা বাদ দিলেও আমাদের সমাজ কেবল ব্যক্তি ও তার স্ত্রী পুত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। বহু আত্মীয় ও পরিজনগোষ্ঠীর প্রতি নানাবিধ দায়িত্ব এবং সম্পর্কের দ্বারা তার প্রভাব ও ক্ষেত্র দূরপ্রসারিত। তাই পূর্ব ও পশ্চিমের বৈবাহিক যোগাযোগে ব্যক্তিগত জীবন সুখের হওয়া হয়তো বিচিত্র নয়, কিন্তু তা দ্বারা কোনকালে ঘটবে না তুই মহাদেশের সামাজিক মিলন। য়ুরোপের স্ত্রীলোক মাত্রই আমাদের পক্ষে 'পরস্ত্রী।

নটরাজনের ভোজ সভায় পরিচয় ঘটলো এক মারাঠী ব্রাহ্মণের সঙ্গে। বয়স চল্লিশের অনেক উপরে, মাথায় কালোর চাইতে সাদার ছোপ বেশী, বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা। সব চেয়ে আশ্চর্য তার চোখ তুটি। দীর্ঘায়ত নয়ন, অবনী ঠাকুরের আঁকা ভারতীয় চিত্রকলার অর্জুনের মতো। তাতে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে বটে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে আছে আষাঢ়ের জলভারনত ঘনমেঘের মতো কালো গম্ভীর ছায়া। সাধারণতঃ চোখে পড়ে না পুরুষের এমন অসাধারণ চোখ।

কিন্তু নয়াদিল্লীর সোসাইটিতে চারুদত্ত আধারকারের খ্যাতি পানীয়ঘটিত। এক বৈঠকে তিনি দশ পেগ হুইস্কি পান করতে পারেন অবলীলাক্রমে। চোখের পাতা কাঁপবে না এতটুকু। সেটা অভূতপূর্ব নয়। আরও তু'চার জন পারেন তা। কিন্তু আধার-কারের কৃতিত্ব শুধু পানীয়ের গ্রহণে নয়, উদ্ভাবনেও। সংখ্যাতীত মিক্সিং জানা আছে চারুদত্তের। ককটেল তৈরীর বহু পদ্ধতি তাঁর নখাগ্রে। ডিনারে, পার্টিতে নিমন্ত্রণকারিণীরা আগে ভাগে পরামর্শ করেন আধারকারের সঙ্গে। মহানন্দে মন্ত্রণা দেন তিনি। "কে কে আসছে, কতজন আসছে? যদি তিন রাউণ্ডেই ঘায়েল করতে চাও, তবে প্রথমে দাও রাম-অরেঞ্জ, তারপরে জিন এণ্ড লাইম। তারপরে হুইস্কি। মেয়েদের জন্য মাঝখানে ব্র্যাণ্ডি দিতে পার

জিঞ্জারেলের সঙ্গে মিশিয়ে। কী বল্‌লে, রাম-অরেঞ্জ কেমন করে' করবে জানো না। হোয়ট এ পিটি! আচ্ছা শিখিয়ে দিচ্ছি। shaker এর মধ্যে সিকি ভাগ দাও ইটালিয়ান ভারমুথ। ইটালীয়ান নেই? আচ্ছা অভাবে ফ্রেঞ্চই দাও। মেশাও সিকি ভাগ কমলালেবুর রস, অর্ধেক ঢালো রাম। বেশী করে বরফ, আর সামান্য একটু দারচিনির রস। ব্যস। আচ্ছা করে মিশিয়ে এবার ককটেল গ্লাসে পরিবেশন কর।"

নটরাজন গৃহিণী বললেন, "মিনি সাহেব, (আমার মিনি সাহেব নামটা সেন সাহেবের অন্দরমহল থেকে বাহির বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে বন্ধুজনের সকৌতুক সম্বোধনে) যদি নতুন নতুন ককটেল চাখতে চান তো মিঃ আধারকারের বুদ্ধি নেবেন।"

স্মিত হাস্যে আধারকার বললেন, "হ্যাঁ, চাকরী থেকে রিটায়ার করে আমার রেসিপিগুলোর পেটেণ্ট নেবো ভাবছি। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো—If it's a drink, consult আধারকার। ঘরে ঘরে মিসেস বিটনের মতো নতুন গৃহিণীদের আলমারীতে থাকবে আধারকার'স্‌ বুক অব ড্রিঙ্কস্‌।"

কিন্তু আমার জন্যে এ সবের চেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ভোজন পর্বের শেষে অতিথিদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বেহালা বাজিয়ে শোনালেন আধারকার। দরবারী কানেড়ার সুর। গৎ নয়, শুধু আলাপ। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে বাজালেন অপূর্ব দক্ষতায়। বাজনা শেষে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, "বলতে পারো কী সুর বাজালেম, মিনি সাহেব?"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেম খানিকক্ষণ, উত্তর দেওয়ার কথাই মনে রইল না। পরিষ্কার বাংলা।

"কী, একেবারে থ' হয়ে রইলে যে?" এবারও বাংলায়।

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, "আপনি আশ্চর্য। বাংলা শিখলেন কেমন করে?"

"এ কি একটা প্রশ্ন? তুমি ইংরেজী শিখেছ কেমন করে?"

"আমি শিখেছি পেটের দায়ে।"

"আমি শিখেছি প্রাণের দায়ে। না, না, আর প্রশ্ন নয়, Curiosity is a feminine vice"

বিদায় নেওয়ার আগে আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন "মিনি সাহেব, 'তুমি' বলচি বলে চটোনি তো মনে মনে? তুমি তো বয়সে অনেক ছোটই হবে। আমি থাকি রটেণ্ডাম রোডে, ২২ নম্বর। এস একদিন সন্ধ্যাবেলা, বাংলা বলবো, বেহালা শোনাবো. আর দেব টপ-হ্যাট। টপ-হ্যাট জানো তো? জানো না? অর্ধেক জিন্, সিকিভাগ ফ্রেঞ্চ ভারমুথ, সিকিভাগ ইটালীয়ান। একফোঁটা বিটার্স, তার সঙ্গে খুব খানিকটা বরফ।

আধারকারের বাড়িতে একদিন গেলাম। টপ-হ্যাটের লোভে নয়, লোকটির আশ্চর্য আকর্ষণে। একদিন গেলাম, দুদিন গেলাম। তারপর প্রত্যহ। কখনও বা সকালে এবং বিকালে। অনেকদিন ব্রেকফাস্ট থেকে সুরু করে ডিনার পর্যন্ত সবই সমাধা হলো তার ওখানে। অল্প সময়ে আন্তরিকতা এত ঘনিষ্ঠ হলো যে, আধারকার পুরুষ না হলে নিন্দুকের কুৎসারটনায় কলঙ্কিত হতে পারতো আমার নাম। তার বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকলে নয়াদিল্লীর গৃহিণীরা সম্ভবপর বর কল্পনা করে মুখরোচক আলোচনায় অবসর বিনোদন করতে পারতেন অলস মধ্যাহ্নে।

কিন্তু কন্যা দূরে থাক; কন্যার জননীর চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না অকৃতদার আধারকারের গৃহে। গোটা তিন চার চাকর, বেয়ারা, খানসামা নিয়ে আধারকারের হোম গভর্ণমেন্ট। তার একমাত্র রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের ভার তার নিজের, বাকী এক্সিকিউটিভ, লেজিস্‌লেটিভ, মায় জুডিশিয়ারী পর্যন্ত সমস্তটাই চাকরদের হাতে। খাঁটি প্রজাতন্ত্র। মজাতন্ত্র বললেও ক্ষতি নেই, ভৃত্যদের পক্ষে।

তর্ক চলে, আলোচনা হয়। রাজনীতি, ধর্ম, ওয়র স্ট্র্যাটেজী,

মায় সিনেমা স্টার পর্যন্ত কোন বিষয়ই বাদ পড়ে না। মাঝে মাঝে হয় কাব্যালোচনা। রবি ঠাকুরের বহু কবিতা ও কবিতাংশ আধারকারের কণ্ঠস্থ। গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করেন—মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে, নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, "বল কোথায় আছে? বলতে পারলে বলেন, সাবাস্! **Now you have earned a drink** নাও একটা অরেঞ্জ গিমলেট—খানিকটা জিন, কমলালেবুর রস। এই বয়, সাবকোবাস্তে—।" কোন দিন বলেন, "আজ পরীক্ষা। বল কোথায় আছে—আমারে যে ডাক দেবে তারে বারংবার এ জীবনে ফিরেছি ডাকিয়া; সে নারী বিচিত্র বেশে, মৃদু হেসে, খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।"

"পারলে না? আচ্ছা আর পাঁচ মিনিট সময় দিলুম। তবু পারলে না, হাঃ, হাঃ, বাঙালী হয়ে বাংলা কবিতার বাজিতে অবাঙালীর কাছে হারলে। লোকে শুনলে বলবে কী হে? আচ্ছা আগে মাথা সাফ্ করে নাও। বয়!—লাও একঠো ব্রুক্লীন। একটা টাম্বলারে অর্ধেকটা বরফের টুকরো, কিছুটা ফ্রেঞ্চস্টাইল ভারমুথ্, কিছুটা ড্রাই-জিন। আচ্ছা করে নেড়ে ছুফোটা অরেঞ্জ বিটার্স। ডিল্লিসস্।"

একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "মিনি সাহেব, প্রেমে পড়েছ কখনও?"

"না।"

"বল কী হে, ইয়ং ম্যান, বিলেতে ছিলে, প্রেমে পড়নি, একথা বিশ্বাস করবে কে?"

"বিশ্বাস করা উচিত। **There are more things in heaven and earth…**"

"কিন্তু **There are more girls in Piccadilly and Licester Square** ওতো বটে।"

আসল কথা কী জানেন? প্রেমে পড়লে চেহারাটা বড্ড বোকা বোকা দেখায়, সিনেমায় দেখেছি। সে ভয়ে এগোতে সাহস করিনি।"

উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লেন আধারকার। "বোকা বোকা দেখায়, হাঃ, হাঃ, হাঃ, **Just imagine** প্রেমে না পড়ার কারণ—বার্নার্ড শ' এর চাইতে ভালো কিছু বলতে পারতেন না। তুমি একটি **genius**। না, তোমাকে আজ নতুন কিছু না দিতে পারলে মান থাকে না। **try** রাম ক্রুইয়ট! চার চামচে রাম, এক চামচে লাইম, এক রত্তি চিনি, আধ পেয়ালা ব্ল্যাক কফির সঙ্গে মিশিয়ে। ওয়াণ্ডারফুল।

দিনের পর দিন বাড়ে বিস্ময়। ক্রমশঃ আকৃষ্ট হই এই মারাঠা ব্রাহ্মণের প্রতি। আশ্চর্য এর জীবন। কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে গভীর এর অনুরাগ, বেহালা বাদনে অসাধারণ এর দক্ষতা। আয় করেন প্রচুর, ব্যয় করেন প্রচুরতর। বেশীর ভাগই মদ খাওয়া এবং খাওয়ানোয়। অথচ অশোভন আচরণ করতে দেখিনি কখনও। দম্ভ করে বলেন, "মিনি সাহেব, তোমাদের শরৎ চাটুয্যে লিখেছেন, —যে মদ খায় সে কোন দিন না কোন দিন মাতাল হয়েছে নিশ্চয়। যে অস্বীকার করে, সে হয় মিছে কথা বলে, নয় তো মদের বদলে জল খায়। শরৎ চাটুয্যে দেখেননি চারুদত্ত আধারকারকে। দেখলে বই থেকে ঐ লাইন দুটি তুলে দিতেন।"

স্ত্রী নেই আধারকারের সে-কথা সবাই জানে। কিন্তু আত্মীয়, পরিজন? কারও জানা নেই কোন তথ্য। হাসিতে, খুশীতে, গল্পে, গুজবে, সরগরম রাখেন মজলিশ, মুখরিত করেন নিজ গৃহের প্রাত্যহিক বন্ধুসমাগম। তবু চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এহ বাহ্য। কী এক গভীর দুঃখের ভার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ঐ ভাবানত নয়নের অন্তরালে, নিঃসঙ্গ জীবনের পশ্চাতে আছে অপরিসীম বেদনার ইতিহাস। কিন্তু কৌশলে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আবৃত্তি করেন আধারকার,—

> আমারে পাছে সহজে বোঝ তাইতো এত লীলার ছল্;
> বাহিরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখের জল

ছয়

ইংরেজীতে একটা চলতি কথা আছে, ছ'জন ইংরেজ একত্র হ'লে গড়ে একটা ক্লাব, ছ'জন স্কচ একত্র হ'লে খোলে একটা ব্যাঙ্ক, ছ'জন জাপানী করে একটা সিক্রেট সোসাইটি। ছ'জন বাঙালী একত্র হলে করে কী? দলাদলি? তা করে এবং বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায়ই করে। কিন্তু তা' ছাড়া আরও একটা জিনিষ করে। স্থাপন করে একটি কালীবাড়ি। উত্তর ভারতের এমন সহর ছুর্ঘট যেখানে বাঙালী আছে কিছুসংখ্যক অথচ কালীবাড়ি নেই একটি।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে কালীমূর্তিটি সুখদৃশ্য নয়। বীণাবাদিনী সরস্বতীর সুষমা বা কমলাসনা লক্ষ্মীর শ্রী নেই তাঁর মসীকৃষ্ণ দেহে। ভগবতী দুর্গার হাত দশটি, প্রহরণ সমপরিমাণ। কিন্তু কালীমূর্তির কাছে তাঁকেও অনেক শান্ত ও সুকুমার মনে হয়। কণ্ঠে তাঁর নরমুণ্ডের মালা, কটিতে তাঁর ছিন্ন বাহুর গুচ্ছ, একহাতে ধৃত মুক্ত কৃপাণ, আর হাতে দোলে খণ্ডিত শির। অতি বিস্তৃত আননের কোনোখানে নেই কমনীয়তার লেশমাত্র আভাস, নয়নে নেই স্নিগ্ধনত দৃষ্টি। নিরাবরণ বক্ষ, নিরাভরণ দেহ, লোলায়িত রসনা। স্বদেশীয় ভক্তরা বলেন, মা ভয়ঙ্করা; ক্যাথারিন মেয়ো বই লিখে বলেন, বীভৎস।

এই রুদ্র ভয়াল মূর্তিকে ভালোবাসে বাঙালী। শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিস্রোত আনলেন তার চিহ্ন রইল একটি মাত্র বিশেষ শ্রেণীতে। কালীর ভক্তরা আছেন দেশব্যাপী। শুধু শাক্তদের মধ্যেই তাঁর পূজারীরা নিবদ্ধ নয়। তাঁর পূজা নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষকের কুটীর থেকে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। পুরাকালে কাপালিকেরা

শবাসনে সাধনা করেছে দেবী কলিকার, তান্ত্রিকেরা আরাধনা করেছে শ্যামামায়ের, দস্যুদল লুণ্ঠন মানসে নির্গত হয়েছে নৃমুণ্ড-মালিনী কালীর অর্চনা করে। আধুনিক যুগেও অসুস্থ আত্মীয়ের আরোগ্য কামনায় বাঙালী মেয়েরা মানৎ করেন মা কালীর কাছে, পল্লীতে মহামারী দেখা দিলে সরলচিত্ত অধিবাসীরা পূজা করে ভক্তিভরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁরই সাধনা করেছেন দক্ষিণেশ্বরে, তাঁরই ধ্যান করেছেন সাধক রামপ্রসাদ; রচনা করেছেন অপূর্ব শ্যামা-সঙ্গীত।

বাঙালীর পক্ষে এই কালীপ্রীতি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বিস্ময়কর মনে হবে। তাঁর শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক গঠন বাঙালীকে আকৃষ্ট করবে কোমলতার প্রতি, স্নিগ্ধতার প্রতি, মাধুর্যের প্রতি,—এইটেই আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙালীকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তার প্রকৃতিকে যাঁরা যথার্থরূপে অনুশীলন করেছেন তাঁরা জানেন এই আপাতবিরোধিতাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কুসুমের মৃদুতা এবং বজ্রের কাঠিন্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার প্রকৃতিতে। তাই ভীরুতার অপবাদ যেমন তার বহু-প্রচারিত, চরম দুঃসাহসিকতার জয়তিলকও তারই ললাটে। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সংঘাত ও সংঘর্ষ আজ বহু-ব্যাপ্ত, আসমুদ্র-হিমাচল তার বিস্তার ও বেগ। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্ব প্রদেশের সর্বসাধারণ। মারাঠী এসেছে, মাদ্রাজী এসেছে, এসেছে গুজরাতী; পার্শী ও বেহারী। ভরেছে জেল, সয়েছে নির্যাতন। কিন্তু স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহায় বাঙালীই সাধন করেছে অগ্নিমন্ত্রের, দিয়েছে দক্ষিণা, জীবন দিয়ে পরিশোধ করেছে দেশমাতৃকার ঋণ। একমাত্র বাঙলা ছাড়া ভারতবর্ষের কোথায় স্কুলের ছেলে বরণ করেছে ফাঁসি, মেয়েরা ছুঁড়েছে পিস্তল, পলিতকেশ অন্তঃপুরিকা বুক এগিয়ে নিয়েছে গুলীর আঘাত?

রিডিং রোডের উপর যে কালীমন্দিরটি স্থাপিত হয়েছে মিলিত

উদ্যোগ ও আর্থিক প্রচেষ্টায়, তার জন্য নয়াদিল্লীর বাঙালী সমাজের গর্ব করার অধিকার আছে। আত্মঘাতী বুদ্ধির কর্মনাশা হঠকারিতায় সে কেবলই করে কলহ, ঘটায় ভেদ, ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠান, —এ অপবাদ বাঙালীর। বোধ হয় একেবারে অমূলকও নয়। একক প্রচেষ্টায় বাঙালীর কৃতিত্ব তুলনাহীন। তার মেধা, তার ঋদ্ধি, তার নৈপুণ্য সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু বহুজনের সম্মিলিত কর্ম দ্বারা একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যথেষ্ট শক্তি দেখায়নি বাঙালী,—একথা গভীর পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। তাই এই কালীবাড়িটি দেখে মন খুশী হয়। কোনো রাজন্যব্যক্তির অনুগ্রহে নয়, নয় কোনো বিত্তশালীর একক অর্থানুকূল্যে, প্রবাসী বাঙালীদের প্রদত্ত ও সংগৃহীত চাঁদায় গড়ে উঠেছে এই মন্দির, স্থাপিত হয়েছে বিগ্রহ।

সরকারী দপ্তরখানায় জীবিকার্জনের তাগিদে উত্তর ভারতের এই মহানগরীতে এসেছে বাঙালী। তাদের কেউ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যরূপে আয় করেছেন প্রচুর অর্থ, কেউ সাধারণ কেরানীর কাজে পেয়েছেন পরিমিত বেতন। তাঁরা সবাই দিয়েছেন দান,- স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধায়। অল্প অল্প করে জমেছে অর্থ, ভরেছে দেবীর ভাণ্ডার। সাধুবাদ দিই তাঁদের। তাঁরা ধন্য।

মন্দিরটির পরিকল্পনা করেছেন যে স্থপতি তাঁর নাম জানিনে, কিন্তু প্রশংসা করি। আড়ম্বরহীন, বাহুল্য-বর্জিত, সহজ, সরল গঠন। বড়বাজারের গন্ধ নেই, নেই মার্কিনী ঢংএর অতি আধুনিক স্ট্রীমলাইন। দূর থেকে দেখে চোখ তৃপ্ত হয়, কাছে গেলে মনে শুচিতার উদ্রেক ঘটে।

গুটি কয়েক সোপান অতিক্রম করে উপরে উঠলে বিস্তৃত অলিন্দ, ঈষৎ উচ্চ জালিকাটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে মন্দির, চারদিক ঘিরে পথ। সেপথে দর্শনার্থীরা প্রদক্ষিণ করে বিগ্রহ, দ্বারে লম্বমান ঘণ্টা-ধ্বনি করে মন্দিরের ধূলি নেয় মাথায়। আপন অন্তরের কামনা

নিবেদন করে ভক্ত নরনারীর দল। আকাশের আলো এবং বাইরের বাতাস আসতে বাধা নেই এতটুকুও। মন্দিরের অভ্যন্তরে নেই অন্ধকার, নেই পুষ্পপত্র ও গঙ্গোদকের দ্বারা আর্দ্র অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়া।

মন্দিরের প্রাঙ্গণটি সুপরিসর। একদিকে আরাবল্লী পর্বতের রীজ। পাথরের খাড়া দেয়াল, সিমেণ্ট দিয়ে জোড়া। অন্যদিকে রাস্তা এবং রেলিং। পিছনে এক কোণে পুরোহিতের বাসস্থান। ছোট্ট একটি কোয়ার্টার, মন্দির কর্তৃপক্ষের তৈরী।

দূরদেশে দেবীর নিয়মিত পূজার আয়োজনে পুরোহিত সংগ্রহ খুব সহজ নয়। বাঙলা থেকে কাউকে এনে রাখতে হলে চাই তাঁর জন্য নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা। তার পরিজন প্রতিপালনের নিশ্চিত আশ্বাস। তাই মন্দির কর্তপক্ষ পুরোহিতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন মাসিক মাসোহারা। তার গ্রেড আছে, ইনক্রিমেণ্ট আছে, ছুটির ব্যবস্থা আছে। আছে প্রণামী, দর্শনীর প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত। এযুগে দেব-সেবককেও চাকুরীর ফাণ্ডামেণ্ট্যাল রুলস্ মেনে চলতে হয়।

মানুষের জীবন যখন জটিল হয়নি, তখন তার অভাব ছিল সামান্য, প্রয়োজন ছিল পরিমিত। সে-দিনে ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক ছিল না বিত্তের। সে বিদ্যা দান করতো ছাত্রকে, জ্ঞান দান করতো শিষ্যকে, ভজন-পূজন করতো নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নে। সে নির্লোভ, নিরাসক্ত শুদ্ধাচারী, সাত্ত্বিক। সে-দিন বিগত, তার সঙ্গে সে ব্রাহ্মণও তিরোহিত। একালে পুরোহিতেরও সংসারযাত্রার উপকরণ হয়েছে বৃদ্ধি। তার স্ত্রীর জন্য চাই সায়া, সেমিজ ও ব্লাউজ, ছেলের জন্য মেলিনস ফুড, মেয়ের জন্য হেজ্‌লীন স্নো। ইহকালের সমাজ, সংসার ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন হয়ে শুধু যজমানের পরকালীন মঙ্গল চিন্তা করলে তার নিজের পরকাল ঘনিয়ে আসে। তাই মন্দিরের পূজারীর জন্য রাখতে হয়েছে বিনাভাড়ায় বাসস্থান, তাতে

বিজলী আলো আছে, কলের জল আছে, আছে ভদ্র স্বল্পবিত্ত বাঙালী পরিবারের উপযোগী সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন।

সিঁড়ির পাশে জুতা খুলে রেখে উঠলাম মন্দিরে। অকৃপণভাবে পুরোহিত দিলেন দেবীর পাদোদক, দিলেন নির্মাল্য ও প্রসাদ-কণিকা।

কলকাতার মতো মন্দির প্রাঙ্গণে সুটপরা বাঙালীর উপস্থিতি এখানকার সমাজে পরিহাসের উদ্রেক করে না। কারণ বসনকে এখানে ব্যক্তির পরিধেয় বলেই গণ্য করে, মনোভাবের পরিচয়রূপে নয়। এটি সম্ভব হয়েছে শুধু সহরে বিভিন্ন পরিচ্ছদের মানুষের অবস্থিতির ফলে। এখানে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, পাঞ্জাবী সিং, মহারাষ্ট্রীয় বাঈ, বাঙালী বিধবা আসে প্রণাম নিবেদনে। তাদের বেশ, ভূষা, এমন কি বস্ত্র পরিধানের রীতিনীতি সমস্তই বিভিন্ন। তারা ভক্ত, এইটেই তাদের একমাত্র পরিচয়, পরিচ্ছদটা তাদের শীত, আতপ ও নগ্নতা নিবারণের উপকরণ মাত্র।

মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। সেখানে শরৎকালে ত্রিপলঢাকা মণ্ডপে দুর্গাপূজা হয় মহা আড়ম্বরে। বাঙালী ছেলেমেয়েদের হাতে গড়া কারুশিল্পের প্রদর্শনী বসে। দিনের বেলায় বালক বালিকারা পায় প্রসাদ, নিশাযোগে থিয়েটারে গোঁফ কামিয়ে মেয়ের পার্ট করে সখের দলের তরুণ সম্প্রদায়।

কালীমন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় কালীকীর্তন হয়। শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্তনের পদ্ধতিতে মূল গায়েন ও দোহার মিলে গাওয়া হয়। রচনা ভক্তিমূলক, সুর বৈচিত্র্যহীন। তাতে মহাজন পদাবলীর লালিত্য নেই, নেই সাধকের একক ভক্তিনিবেদনের গাম্ভীর্য ও আবেগ। জিনিষটা সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত এবং ভক্তিতন্ত্রের দিক থেকে অনাবশ্যক অনুকরণ। সব দিক দিয়েই অসার্থক। কালীর অঙ্গনে রামপ্রসাদী সুরে ভক্তের কণ্ঠে—শ্মশান ভালো বাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি, জাতীয় গানই হচ্ছে শেষ কথা।

গানের আসরে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর পরিচয় ঘটলো তাঁর নাম মোহিতকুমার সেনগুপ্ত। বয়স পঞ্চাশের ওপারে, শরীর অকৃশ, দৈর্ঘ সাধারণ বাঙালীজনোচিত। অডিট একাউন্টস সার্ভিসের লোক। সুদক্ষ অফিসার বলে খ্যাতি আছে সরকারী মহলে। বর্তমানে যানবাহন বিভাগের আর্থিক উপদেষ্টা। বেতন এবং পদমর্যাদা দুইই গুরুত্বপূর্ণ। এঁর আর দু'ভাইর নাম বাংলাদেশে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সুপরিচিত। পরীক্ষার আগে এম সেনের ইকনমিক্স ও মিহির সেনের সিভিকস্ পড়েনি এ-দশকে এমন বিদ্যার্থীর সংখ্যা বেশী নেই। ছাত্রজীবনে সেনগুপ্ত নিজেও প্রথিতযশা ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজীনের তিনি দ্বিতীয় ছাত্র-সম্পাদক।

ভদ্রলোক মৃতদার, অমায়িক এবং নয়াদিল্লীর বাঙালীর সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত। বাঙালীদের সমুদয় ক্রিয়া কর্মে যোগ আছে ঘনিষ্ঠ। কীর্তনের আসরে তাঁর উপস্থিতি দেখা যায় অবধারিত।

ফ্লীট স্ট্রীটে আছে খবরের কাগজ, সেভিল রো'তে দরজি। নয়াদিল্লীর রিডিং রোডেও তেমনি মন্দির। একটি নয়, দুটি নয়, পর পর তিনটি। রাস্তাটার নাম টেম্পল স্ট্রীট হলে ক্ষতি ছিল না।

শ্রীযুগলকিশোর বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি বোধ করি ভারতবর্ষে বর্তমান শতাব্দীতে নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ দেবনিবাস। শুধু আকারে নয়, গঠন পারিপাট্যে ও অর্থব্যয়ের বিপুলতায় এর জুড়ি আছে বলে জানা নেই। দূর দূরান্ত থেকে আসে লোক। শুধু ভক্ত নয়, নিছক দর্শনাভিলাষীরাও। আসে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, পারসিক, খৃষ্টান। আসে য়ুরোপীয় ও এমেরিক্যান টুরিস্ট। সকালে, সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নে নানা ভাবে, নানা দিক থেকে ফটো তুলে খালি করে ক্যামেরার স্পুল।

প্রায় বারো বছর আগের কথা। পিতার স্মৃতিচিহ্নরূপে যুগল কিশোর স্থাপন করতে চাইলেন একটি মন্দির যেখানে হিন্দুমাত্রেরই

থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার। বিড়লাদের আদি বাস জয়পুরে, সেখানে এ-মন্দিরের সার্থকতা সীমাবদ্ধ। বছরে ক'জন লোক যায় সেখানে, কজন খবর রাখে সেখানকার? স্থান নির্বাচিত হলো দিল্লী, ভারতবর্ষের রাজধানী,—শুধু আজকের ভারতবর্ষের নয়, শত সহস্র বৎসর থেকে। এখানে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেছে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব, বাস করেছে সংযুক্তা পৃথিরাজ। শিরিতে ছিল সম্রাট কুতুবুদ্দিন, লাল কেল্লায় রাজদণ্ড ধরেছে বাদশাহ সাজাহান। যমুনার দুই তীরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আরাবল্লীর বনভূমি, অধুনা বিলুপ্ত জনপদের পথধূলিতে কত শক হুনদল, পাঠান, মোগল একদেহে হলো লীন। ভাবীকালের ভারতবর্ষেরও দিল্লী হবে নগরমালিকার মধ্যমণি। আর যাই হোক, স্বাধীন ভারতের রাজধানী হবে না ওয়ার্ধা।

১৯৩২ সালে সুরু হলো মন্দিরের নির্মাণ কার্য। বহু এঞ্জিনিয়র, বহু কর্মী, শত শত রাজমিস্ত্রী, মুটে, মজুর খাটতে লাগলো ছ'বছর ধরে অবিশ্রাম। ১৯৩৮ সালে সম্পূর্ণ হলো মন্দির। লক্ষ্মীনারায়ণের আরাধনার স্থান, ধনকুবের বিড়লা ভ্রাতৃবর্গের পরলোকগত জনক রাজা বলদেও দাস বিড়লার স্বর্গার্থে উৎসর্গীকৃত।

মন্দিরের গঠনভঙ্গিটি ভারতীয় স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। লাল পাথরের চূড়া, ধারগুলিতে আছে গৈরিক। মনে হয় যেন লাল জমিতে গেরুয়া পাড়। রাজপথ থেকে শ্বেত পাথরের অতি বিস্তীর্ণ সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সেখান থেকে উঠেছে মন্দির। মেঝে ও দেয়ালে বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরখণ্ডের সমাবেশে রচিত বর্ণাঢ্য আলিম্পন ও পুষ্পসম্ভার। প্রাচীর গাত্রে আছে অজস্র ফ্রেস্কো পেইণ্টিং। জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের শিল্পীরা অঙ্কন করেছে সে-সব চিত্র। তাদের বিষয়বস্তু ও অঙ্কন চাতুর্য প্রশংসনীয়। জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ—কোশল মুখার্জী—তিনি বাঙালী; নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার উদ্‌ভাবক নন্দলাল, অসিতকুমার, সমর গুপ্ত প্রভৃতির

সতীর্থ। বিড়লা মন্দিরটির পরিকল্পনায়ও আর একজন বাঙালী স্থপতির যথেষ্ট অংশ আছে, এ-কথা জেনে আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে আমাদের।

মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ আছে শ্বেত পাথরের। প্রত্যহ অগণিত নরনারীর কুসুমার্ঘ্যে প্রায় আচ্ছন্ন তার চরণ ও পাদপীঠ। দ্বারে লৌহ-পেটিকা, উপরের ছিদ্রপথে ভক্তেরা রাখে প্রণামী। মন্দিরের বাম পার্শ্বে বিরাট ধর্মশালা, সেটি বিড়লা জননীদের স্মৃতিরক্ষার্থে। ধর্মশালার সংলগ্ন নাট মণ্ডপ। তাতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভজন সংগীত করেন সুকণ্ঠ গায়ক। সহস্রাধিক শ্রোতা অনায়াসে বসতে পারে সে সভায়। মাইক্রোফোনের সাহায্যে বাইরে সর্বসাধারণের শ্রবণায়ত্ত করার ব্যবস্থাও নিখুঁত। মন্দিরপ্রবেশের বহু দূরে থাকতেই কানে এলো সে গান—শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন হরণ ভব ভয় দারুণম।

মন্দিরের পিছনে একটি বৃহদাকার পার্ক। এটি পরবর্তী রচনা। সাধারণ লোকের চমক লাগার মতো অনেক আয়োজন আছে এই পার্কে। পাথরের বিরাটকায় হস্তী, তার শুঁড় দিয়ে ফোয়ারার জল ঝরছে ঝর ঝর ধারায়। আছে পাথরের কুমীর, তারও মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে জল। ফোয়ারা, পুষ্পবীথিকা, কৃত্রিম স্রোতস্বতী ও গিরিগহ্বর প্রভৃতি একাধিক আকর্ষণ আছে বালক, বালিকা ও দেহাতীদের। প্রতি দিন অপরাহ্ণ বেলায় ভীড় জমে তাদের। কেউ বসে বিশ্রামবেদীতে, কেউ দোলে দোলনায়, কেউ বা পরিক্রমণ করে এদিক থেকে ওদিক। অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেননি শেঠ যুগলকিশোর। যুদ্ধপূর্বকালের অর্থ মূল্যে মন্দির ও পার্কের নির্মাণ ব্যয় হবে প্রায় কুড়ি লাখ টাকা।

বিড়লা পরিবারের তিনজন, পাঞ্জাবের আর্য প্রতিনিধি সভার প্রতিনিধি তিনজন এবং স্থানীয় সনাতন ধর্মসভা থেকে তিনজন মিলে

এক ট্রাস্ট। তাঁরাই রক্ষণাবেক্ষণ করেন মন্দির এবং তার সংলগ্ন উদ্যান, ধর্মশালা প্রভৃতি। আধুনিক মনোভাবের পরিচয় আছে পরিচালন ব্যবস্থায়। প্রতিনিধিরা প্রতি তিন বৎসরান্তে নির্বাচিত হন। ছোট খাটো ব্যাপারেও আধুনিকতার ছাপ আছে। মন্দির প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে রাখবার ব্যবস্থাটি চমৎকার। সিঁড়ির ঠিক গোড়াতেই একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। দেয়ালে জুতা রাখার র‍্যাক। সেখানে জুতা জমা দিতে হয়। মালিককে দেওয়া হয় সংখ্যাযুক্ত কার্ডবোর্ডের একটি চাকৃতি। অনুরূপ আর একটি চাকৃতি এঁটে রাখা হয় জুতার গায়ে, যাতে একজনের হাইহিল লেডি'স স্যু'র সঙ্গে অন্যজনের কাবুলী চপ্পল বদল না হয়ে যায়। চাকৃতি ফেরৎ দিলেই ঠিক নিজের জুতাজোড়া এনে হাজির করে জুতাঘরের কর্মচারী, যেমন হ্যাভয়, গ্রভনর বা কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ণে টুপী, ছাতা কিম্বা লাঠি।

১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধী দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন এ-মন্দিরের। তাঁর চাইতে যোগ্যতর পুরোধা ছিল না এ-অনুষ্ঠানের। ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও হরিজনের সমান প্রবেশাধিকার যে মন্দিরে, তার দরজা তিনি খুলবেন না তো খুলবে কে? বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রইল এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাত্মার নাম।

বিড়লা মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে তৃতীয় মন্দিরটি মূলতঃ বিড়লাদেরই অর্থানুকূল্যে নির্মিত। সেটি বৌদ্ধদের। বাঙালী কালীমন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের মাঝখানে এই ক্ষুদ্র মন্দিরটির অবস্থিতি ও গঠন কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান তথাগতের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। পীতবসন ভিক্ষু আছেন কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কবির স্মৃতিচিহ্নরূপে একটি বকুল বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন মন্দিরাঙ্গনে। রবি-বকুল বৃক্ষ রোপণানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন বাঙালী ঐতিহাসিক। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। ভারত সরকারের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষক, কিপার অব ইম্পিরিয়েল রেকর্ডস।

সেন মহাশয় এককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে তাঁর গবেষণার মূল্য ঐতিহাসিক মণ্ডলীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। স্ফীত বেতনের সরকারী চাকুরীতে অনায়াস জীবন যাপন করেও যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাহিত্য চর্চা করেন এবং অক্সফোর্ডের ডিগ্রী পাওয়ার পরেও যে স্বল্পতর ঐতিহাসিক বাংলায় ইতিহাস রচনা করেন, বঙ্গবাণীর সে-সেবকদের মধ্যে ডক্টর সেন বিশিষ্ট। এঁর পৈতৃকবাস বরিশাল জেলায়। বাচন ভঙ্গীতে তার আভাস পাওয়া যায়।

রিডিং রোডের একপাশে মন্দির, অন্য দিকে কোয়ার্টার। গভর্ণমেন্টের কেরানী ও অনুরূপ কর্মচারীদের বাসস্থান। লম্বা একটানা ব্যারাক, কোনটার ইংরেজী L অক্ষরের মতো একপ্রান্ত প্রসারিত, কোনটা বা E'র মতো আকৃতি, শুধু মাঝখানের বাড়তিটুকু বাদ। সামনে খানিকটা মাঠ। মন্দির ও কোয়ার্টার,—সুন্দর এবং কুৎসিতের এত নিকট অবস্থিতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর নয় কোনোখানে। এক একটা ব্যারাকে ত্রিশ, চল্লিশটি পরিবারের বাসব্যবস্থা। অল্প বেতনের কর্মচারীদের জন্য সুলভ সরকারী আয়োজন। এ-পাড়াটা নয়াদিল্লীর ইষ্ট এণ্ড।

দেখতে ভালো না হলেও থাকতে মন্দ নয় এই কোয়ার্টারগুলি। বিশেষ করে সুলভতা বিচার করলে অভিযোগ করার উপায় থাকে না। বেতনের এক-দশমাংশ ভাড়া, মাসের শেষে আপিস থেকেই কেটে নেয় নিয়মিত। সেক্রেটারিয়টের কেরানীদের সর্বনিম্ন বেতন ষাট টাকা। সুতরাং ছ' টাকা ভাড়ায় বাড়ি। দু'খানা শোবার ঘর, একখানা রান্নার, একটি ভাড়ার। ভিতরে একটু উঠান, বাইরে ছোট বারান্দা। জলের কল আছে, বাথরুম আছে, আছে ইলেকট্রিক আলো এবং—চমকে উঠো না যেন,—আছে বড় একটি সিলিং ফ্যান। বাড়িতে রোদ আসে, বাতাস আসে, এবং ধূলিরও বাধা নেই। কলকাতা সহরে এমন ভাড়ায় এমন বাড়ি কোটিকে গুটিক মিলে না।

শুধু বাড়িই নয়। ফার্নিচারও। বিবাহ সভায় সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদানের মতো গভর্নমেণ্টের বাড়িও আসবাবপত্রসহ পাওয়া যায়। সেণ্ট্রাল পি. ডব্লিউ. ডি'র ফার্নিচার। দু' টাকা মাসিক ভাড়ায় পাওয়া যায় দু'খানা তক্তপোষ, একটি আলমারি, একটি টেবিল ও তিনখানা চেয়ার।

এক একটা ব্যারাক ও তার সামনের খোলা মাঠটুকু নিয়ে এক একটা 'স্কোয়ার'। অধিকাংশই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের নামের দ্বারা গৌরবান্বিত। ক্লাইভ স্কোয়ার আছে সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের নামে যিনি পলাশীর আম্রকাননে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। যিনি আশী টাকা বাৎসরিক বেতনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কেরানীরূপে ভারতবর্ষে এসে দেশে ফিরেছিলেন ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনশালীরূপে। ১৭৪৪ সালে মাদ্রাজে আগত খ্যাতিহীন, বিত্তহীন রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬০ সালের ৯ই মে যখন সেনানায়ক ক্লাইভ রূপে প্রত্যাবর্তন করলেন ইংলণ্ডে, জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন পোর্টসমাউথ বন্দরে, তখন ইংলণ্ডের এ্যানুয়েল রেজিস্টারে তার সম্পর্কে মন্তব্য ছিল,—"এই কর্নেলের কাছে নগদ টাকা আছে প্রায় দুই কোটি, তার স্ত্রীর গহনার বাক্সে মণিমুক্তা আছে দুই লাখ টাকার। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়লণ্ডে তার চাইতে অধিকতর অর্থ নেই আর কারো কাছে।"

স্কোয়ার আছে লর্ড ডালহৌসীর নামে, যিনি একে একে পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ যোগ করলেন ভারত সাম্রাজ্যে জোর করে দখল করলেন পেশোয়াদের সাঁতারা, কেড়ে নিলেন ঝাঁসি, নাগপুর, নিজামের বেরার, নবাব ওয়াজেদ আলীশা'র কাছ থেকে অযোধ্যা।

স্কোয়ার আছে ওয়ারেন হেস্টিংসএর নামে, যিনি কাশীনরেশ চেৎসিংহের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন বহু লক্ষ মুদ্রা, অযোধ্যায় বেগমদের পীড়ন করে অর্থ ও মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন ন্যূনাধিক দেড় কোটি টাকার। যার কুশাসন ও কুকার্যের সুদীর্ঘ তালিকা ব্রিটিশ

পার্লামেণ্টের বিচার সভায় অভূতপূর্ব বাগ্মিতায় উদ্ঘাটিত করেছিলেন এড্‌মণ্ড বার্ক। সে অপকীর্তির রোমহর্ষক বর্ণনা শুনে পার্লামেণ্ট-কক্ষে দর্শকের গ্যালারীতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন একাধিক ইংরেজ রমণী।

আর আছে সিপাহী যুদ্ধের ছোট বড় ও মাঝারি ইংরেজ সেনাপতিদের নাম। হেভলক্ স্কোয়ার, আউটরাম স্কোয়ার, উইলসন স্কোয়ার, নিকলসন স্কোয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। স্কোয়ার নেই শুধু মেজর জেনারেল হিউয়েটের নামে যিনি ১৮৫৭ সালের ৯ই মে মীরাট সেনানিবাসে ৮৫ জন ভারতীয় সিপাহীকে হাতে পায়ে লোহার শক্ত বেড়ী পরিয়ে সমস্ত সৈন্যদলের সামনে লাঞ্ছিত করেছিলেন। সেদিন নিরুপায় ভারতীয় সিপাহীরা দাঁড়িয়ে দেখেছিল তাদের সঙ্গীদের এই অবমাননা। তাদের মুখে ছিল না প্রতিবাদ, কিন্তু চোখে ছিল আগুন। সে আগুন সহজে নেভেনি।

পরদিন রবিবার। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসন্ন রজনীর ঈষৎ অন্ধকার নামলো মীরাটের ছাউনীতে। ব্রিটিশ সৈন্যেরা তৈরী হয়েছে চার্চ-প্যারেডের জন্য। ভারতীয় সৈন্যেরা করছে কী? বোধ হয় বিশ্রাম। এমন সময় অকস্মাৎ আওয়াজ এলো,—

গুড়ুম!

পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরছে ব্রিটিশ সেনানায়কদের ঠিক ললাটে। বন্দুকের ঘোড়া টিপছে, ক্লিক্, ক্লিক্, ক্লিক্। আকাশ, বাতাস, প্রাচীর ও প্রান্তর কাঁপিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

উত্তর ভারতে সিপাহী যুদ্ধের সেই হলো প্রারম্ভ।

নেতৃত্ববিহীন অসঙ্ঘবদ্ধ পরিচালনা, পরিকল্পনাহীন পদ্ধতি, বিভিন্ন অংশে যোগাযোগশূন্যতা এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশের অভাবে ব্যর্থ হলেও একথা আজ স্বীকার করতে হয় যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার ও স্বরাষ্ট্র গঠনে ভারতীয়দের সেই প্রথম উদ্যোগ।

মীরাটের সিপাহীরা ঘোড়া ছুটিয়ে পরদিন প্রভাতে এসে পৌঁছল দিল্লীতে। বাদশাহ বাহাদুর শাহ তখন দিল্লীর মসনদে। বাবরের বিক্রম, আকবরের ব্যক্তিত্ব বা আওরঙ্গজেবের রণকুশলতার লেশ ছিল না এই বৃদ্ধ, মুঘল সম্রাটের চরিত্রে। সিপাহীদের শৌর্য, শক্তি ও যুদ্ধোপকরণ কাজে লাগাবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। জনসাধারণের সংগ্রামোন্মুখ ব্রিটিশ বিদ্বেষকে সফল পরিণতি দান করতে পারলেন না তিনি।

দিল্লীর পরিধি সাত মাইল। অধিবাসীরা উত্তেজিত। ইংরেজের শিবিরে শিক্ষিত ও ইংরেজের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চল্লিশ হাজার রণনিপুণ সিপাহী তার পাহারা। নগর প্রাচীরের উপরে ১৪টি বৃহদাকার কামান। দুর্গাভ্যন্তরে বৃহত্তম বারুদখানা। তা' ছাড়া আছে আরও ৬০টি ছোট ছোট কামান। আছে বহু সুদক্ষ গোলন্দাজ;—বেশীর ভাগই দু'দিন পূর্বে ছিল ব্রিটিশ সৈন্যদলভুক্ত। তারা য়ুরোপীয় যুদ্ধ-রীতিতে সুশিক্ষিত, সুনিপুণ এবং সুশৃংখলাবদ্ধ। দিল্লী দুর্গকে সুরক্ষিত করেছে ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারেরা যারা আধুনিকতম এঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান লাভ করেছে ইংরেজের সেনাবাহিনীতে। দিল্লী অধিকারের ক্ষীণতম আশার কারণ ছিল না 'রীজে' সমবেত ব্রিটিশ-বাহিনীর মনে। লেশমাত্র যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা ছিল না দুর্গপতনের।

কিন্তু তবুও সিপাহীরা হারল। দিল্লী দখল করল ইংরেজ। ভারতে মুস্লিম রাজত্বের ঘটল সমাপ্তি। শতবর্ষ পূর্বে নির্মিত সম্রাট সাজাহানের লাল কেল্লার শীর্ষে উত্তোলিত হলো ব্রিটিশ পতাকা।

নগরপ্রান্তে 'রীজে'র ইংরেজ-শিবিরে সৈন্য সংখ্যা ছিল চোদ্দ হাজারের সামান্য কিছু বেশী। এর সবই য়ুরোপীয় নয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছিল ভারতীয় সেপাই। আড়াই হাজার সৈন্য—বলা বাহুল্য, তারাও ভারতীয়—পাঠিয়েছিলেন ইংরেজানুরাগী দেশীয় রাজন্যবর্গ। তাঁদের জন্য আজ একুশ, এগারো বা পাঁচ, সাত করে তোপধ্বনির বিধি আছে।

কর্নাল থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ব্রিটিশবাহিনী এসে শিবির স্থাপন করল 'রীজে', যেখানে এখন দিল্লী ইউনিভার্সিটি। বর্তমান সবজিমণ্ডীতে ঘটেছে দীর্ঘকালব্যাপী অনেক খণ্ড যুদ্ধ। ইংরেজ সৈন্যদের সেই অস্থায়ী আবাস ভূমিতে পরে রচিত হয়েছে পুরাতন ভাইসরিগ্যাল লজ। সেখানে বসে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রীর বা ইকনমিক্সের নোট টোকে। তারই অনতিদূরবর্তী একটি ভবনে ১৯২৪ সালে তিন সপ্তাহের অনশন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী,—দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদকল্পে। প্রথম সর্বদল মিলনের প্রচেষ্টায় সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন পণ্ডিত মালবীয়জী।

ইংরেজ জানতো, অনতিবিলম্বে দিল্লী অধিকার করতে না পারলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হবে চিরতরে। তাই সর্বস্ব পণ করল তারা। জিতি তো বাদশাহ, হারি তো ফকির। ব্রিগেডিয়ার আর্কডেল উইলসন তখন ব্রিটিশ শিবিরের অধিনায়ক। তিনি জয় সম্পর্কে আশান্বিত ছিলেন না।

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা অতীত, শরতের প্রথমার্ধও বিগতপ্রায়। অর্ধেকের উপর ইংরেজ সৈন্য জ্বর, উদরাময় ও অন্যান্য ব্যাধিতে রুগ্ন। পাঞ্জাব থেকে সেনাপতি লরেন্স ক্রমাগত উৎকণ্ঠিত পত্র পাঠাচ্ছেন,—আর কতদিন? দিল্লী বিজয়ের আর বিলম্ব কত? সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র পাঞ্জাবেই সিপাহীরা তখনও আছে অনুগত, আম্বালার সেনানিবাসে দেখা দেয়নি বিক্ষোভ। কিন্তু আর বেশী দিন শান্তি রক্ষা কঠিন হবে। দিল্লী, দিল্লী, দিল্লীর উপরেই নির্ভর করছে ভারতবর্ষে জন্ কোম্পানীর ভাগ্য।

অবশেষে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে ফিরোজপুর থেকে হস্তিপৃষ্ঠে বাহিত প্রচুর গোলা বারুদ ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র এসে পৌঁছল 'রীজে'র ছাউনিতে। ব্রিটিশ সেনানায়কদের প্রাণে ফিরে এল ভরসা, মনে এলো সাহস। সেনাপতি উইলসনকে অতিক্রম করে, যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করল জন নিকল্সন্।

১৪ই সেপ্টেম্বর। রাত্রি প্রায় নিঃশেষিত, যদিও আলোর রেখা দেখা দেয়নি আকাশে। ইংরেজবাহিনী আক্রমণ করল দিল্লী দুর্গ। পূর্ববর্তী ছয় দিন দিবারাত্রি ব্যাপী গোলাবর্ষণের দ্বারা নগর প্রাচীর বিধ্বস্ত করা হয়েছে ধীরে ধীরে,—মূল আক্রমণের মুখবন্ধরূপে। কাশ্মীরী গেটের দিকে খণ্ড খণ্ড দলে হানা দিল ইংরেজের সৈন্য। দুই পক্ষের কামান গর্জনে দুরু দুরু কম্পিত হলো দূর দূরান্তের গৃহগবাক্ষ, তাদের অগ্নিবর্ষণের রক্তিম আভায় সীমন্তিনীর সিঁথির মতো রঞ্জিত হলো প্রভাতের বিস্তীর্ণ আকাশ।

এই মরণপণ যুদ্ধ চলল প্রহরের পর প্রহর। অবশেষে বিকট শব্দে কাশ্মীরী গেটের রুদ্ধদ্বার বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল ধূলায়। এঞ্জিনিয়ার বিভাগের ক্ষুদ্র একটি দল সরীসৃপের মতো বেয়ে উঠেছে প্রাচীরে। বিস্ফোরকে অগ্নি সংযোগের দ্বারা বিচূর্ণ করেছে সুদৃঢ় কাশ্মীরী গেট। তাদের অমানুষিক সাহসের ফলেই জয়লাভ সম্ভব হলো ইংরেজের। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন, এই দলের মধ্যে আটজন ছিল ভারতীয়।

সেই ভগ্নদ্বার পথে জয়দৃপ্ত ব্রিটিশবাহিনী প্রবেশ করল ভীমবেগে। বিপক্ষকে আক্রমণ করল দ্বিগুণ তেজে। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে নিকল্‌সন্ পরিচালনা করছিলেন সেই সৈন্যদল। জনৈক সিপাহী নিশানা করল তাকে। মুহূর্তে আর্তনাদ করে ধূলায় পড়ল নিকল্‌সন্। গুলী লেগেছিল তাঁর কপালে।

পরাজিত বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ পলায়ন করলেন দুর্গ থেকে। আত্মগোপন করলেন দিল্লী প্রাসাদের চার মাইল দক্ষিণে হুমায়ুনের সমাধি সৌধে। সেখানে এক মুসলমান ফকিরের নিলেন আশ্রয়। জনশ্রুতি এই যে, সেই ফকিরই তাঁকে ধরিয়ে দিলেন ইংরেজের গুপ্তচর বিভাগের এক তরুণ কর্মচারী হড্‌সনের হাতে।

হামা আজ দস্তে
গয়ের নালা কুনান্দ,

শাদী, আজ দস্তে
খেশ্‌তান্‌ ফরিয়াদ্‌।

নিজের হাতই যখন নিজের গালে চড় বসিয়ে দেয়, তখন, হে শাদী, অপরের হাতে মার খাওয়া নিয়ে আর খেদ করে লাভ কী!

বন্দী সম্রাটকে হড্‌সন্‌ পাল্‌কী করে নিয়ে এল দিল্লীতে। সেখানে বিচার হলো তাঁর। দণ্ড হলো নির্বাসন। ব্রহ্মদেশে। সেখানে পাঁচ বছর পরে বন্দীদশায় জীবনান্ত ঘটল তাঁর। হতভাগ্য বাহাদুর শাহ,—ভারতের শেষ মুস্লিম সম্রাট!

ঠিক যেখানে বাহাদুর শাহ ধৃত হন, হুমায়ুন'স টুম্বেই পরদিন হড্‌সন্‌ গ্রেপ্তার করল আর তিনটি পলাতক। বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্র। তাঁরা স্বেচ্ছায়ই ধরা দিয়েছিলেন। তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁদেরও বিচার হবে বাহাদুর শাহের মতো।

হড্‌সন্‌ তাঁদের একটি ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এল দিল্লীতে। দিল্লী-গেটের কাছে এসে হড্‌সন্‌ থামাল সে-গাড়ি। বন্দুক নিয়ে নিজ হাতে পর পর গুলী করল বন্দীদের ঠিক বুকের মাঝখানে। রাজরক্ত ঝর ঝর ধারায় গড়িয়ে পড়ল দিল্লীর ধূলি-ধূসর পথে। মৃতদেহ নিয়ে চাঁদনী চকের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকাশ্য প্রদর্শনী রূপে রাখা হলো তিন দিন। সম্রাটবংশধরদের বিকৃত মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠল পথচারীর দল, বারংবার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মার্জনা করল নিঃশব্দে।

সাত

সাধ্বী স্ত্রী, পিতৃভক্ত পুত্র, ভ্রাতৃবৎসল অনুজ এবং প্রভুপ্রাণ সেবকের দৃষ্টান্ত আছে আমাদের পুরাণ ইতিহাসে একাধিক। জনকতনয়া সীতা, দশরথাত্মজ রামচন্দ্র, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং রামানুচর হনুমানের কাহিনী জানে এদেশের আপামর সাধারণ। কিন্তু পত্নী-অনুগত স্বামীর উদাহরণ জানতে চাও তো সর্বাগ্রে দেখে আসা প্রয়োজন ন'মাসিমার বান্ধবী ইন্দুমতী রায়ের বর প্রিয়নাথ বাবুকে। ইন্দুমতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

প্রাগ্‌বৈবাহিক জীবনের পরিচয়লিপিতে ইন্দুমতী ছিলেন দাশগুপ্তা। গোখলেতে পড়েছেন ইংরেজী, সঙ্গীত সম্মিলনীতে শিখেছেন সেতার। ফুল স্লিভসের ব্লাউজ গায়ে দিয়ে মাঘোৎসবের দিনে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় করেছেন গান। তাঁর এক দাদা রেলের অফিসার, অন্য ভাই ব্যারিস্টর।

ইন্দুমতীর বাবার সিন্দুকে রূপা ছিল প্রচুর, কিন্তু নিজের দেহে রূপ ছিল না এতটুকুও। ফলে কয়েক বছর আই. সি. এস., বিলাত ফেরৎ, ডেপুটি প্রভৃতির জন্য অযথা অপেক্ষার পর অবশেষে যৌবনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে এক শুভ মাঘে মাসি শুক্লপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ কণ্ঠলগ্না হলেন প্রিয়নাথবাবুর। বিয়ের পরে কনের বদল হলো পদবী, বরের বৃদ্ধি হলো পদ। এ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। পয় আছে ইন্দুমতীর।

প্রিয়নাথবাবু তাঁর স্ত্রীর নাথ তো নিশ্চয়ই, বোধ করি প্রিয়ও হবেন। হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার পক্ষে—। থাক্ সে-কথা। আমি তো আর তাঁকে জামাই করছিনে।

, মহাদেও রোডে প্রিয়নাথবাবুর বাড়িটি। 'বি' টাইপ কোয়ার্টার। নয়াদিল্লীতে বাজারে ডিম থেকে সুরু করে বসত বাড়ি পর্যন্ত সবই

গ্রেড করা। এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। হীরার বিচার ঔজ্জ্বল্যে, মসলিনের বিচার সূক্ষ্মতায়। সরকারী কর্মচারীর মূল্য নিরূপিত হয় বেতনে। পি, ডব্লিউ, ডি'র খাতায় বেতন অনুযায়ী ভাগ করা আছে বাড়ি। পাঁচ শ' থেকে ছ'শ টাকা মাহিনার কর্মচারীর জন্য 'এ' টাইপ কোয়ার্টার, চার শ' থেকে পাঁচ শ'ওয়ালারা পায় 'বি'। ছ'শর উপরে মাইনে যাদের তারা পায় বাংলো। তারও শ্রেণী বিভাগ আছে। শুধু গঠন বা ব্যবস্থায় নয়, অবস্থানেও। ঠিকানা শুনেই বলে দেওয়া যায় লোকটার বেতনের পরিমাণ। হেস্টিংস রোডের বাসিন্দা পায় তিন থেকে চার হাজার, তোগলক রোডে তার নীচে। এক হাজারের বেশী না পেলে বাংলো মেলে না রাইসিনা রোডে।

নম্বর মিলিয়ে সন্ধান করলেম বাড়ির। বারান্দার পাশের ঘরে আধময়লা গেঞ্জী গায়ে একটি ভৃত্য ইলেকট্রিক ইস্ত্রি দিয়ে একখানা চকোলেট রং-এর বেনারসী শাড়ীর পরিচর্যায় ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করলেম,

"এইটে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি ?"

"হ্যা, মিঃ রায়ের বাড়ি।"

গলার স্বরে বিরক্তি এবং কপালে কুঞ্চিত রেখার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল বাবু সম্বোধনটা শ্রোতার পক্ষে শ্রবণসুখকর নয়। সুতরাং ভ্রম সংশোধন করতে হলো।

"মিঃ রায়কে একটু খবর দিতে পার ?"

"আমিই মিঃ রায়।"

গড সেভ্ দি কিং! মিসেস ইন্দুমতী রায়ের স্বামী যে সকাল আটটার সময় শাড়ী ইস্ত্রি করবেন তা' কল্পনা করব কেমন করে ? কিন্তু এখন তো আর ফিরবার উপায় নেই। ন' মাসিমার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যক্ত করতে হলো, দিতে হলো সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়। মিঃ রায় অন্দর থেকে যথারীতি নির্দেশ লাভ করে ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালেন। 'উনি' চান করছেন, আসতে বিলম্ব হবে না আশ্বাস দিলেন।

ড্রয়িং রুমটির মেঝেতে সতরঞ্চি পাতা, তার উপরে ছোট মির্জাপুরী কার্পেট। টিপাই-এর উপরে পুষ্পহীন ফুলদানী। এক কোণে একখানা ভাঁজকরা কেম্বিসের ইজিচেয়ার। তার মাথার কাছটা উপবেশনকারীদের তৈলসিক্ত শিরের অজস্র চিহ্নের দ্বারা মলিন। দেয়ালে কাঁচ দিয়ে বাঁধানো খান দুই সূচীশিল্পের নমুনা। এই সিবন কারুকর্মের শিল্পীর পরিচয় সম্পর্কে দর্শকের মনে পাছে কিছুমাত্র সংশয় ঘটে সেজন্য বড় বড় হরফে এক কোণে লেখা আছে 'ইন্দু'। একটাতে একটা ঝুরি, তাতে কয়েকটি গোলাপ ফুল। আর একটাতে একটা বিচিত্র বর্ণের কুকুর। লাল, নীল, সবুজ, হলদে রংএর যদৃচ্ছ এবং অকুণ্ঠ ব্যবহার; 'ভিবজিওর' বললেই হয়। কুকুরটির মাথার উপরে ইংরেজী অক্ষরে লেখা,—গড ইজ গুড। বোঝা গেল গৃহস্বামিনী ধর্মশীলা। কিন্তু সেটা প্রমাণের জন্য তো সারমেয়ের প্রয়োজন ছিল না। বোধ করি, লেখার ভুল। ডগ ইজ গুড হবে।

প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে খানিক আলাপ করা গেল। আলাপ অর্থে তিনি বক্তা, আমি শ্রোতা। প্রায় সবটাই 'উনি' প্রসঙ্গ। উনি আবার বিছানায় এক পেয়ালা গরম চা না পেলে উঠ্‌তে পারেন না। উনি রোজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকুরকে চাল ডাল মেপে দেন। বাজারের খাবার উনি বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দেন না। নয়াদিল্লী বঙ্গ মহিলা সমিতির যা কিছু তা তো সব উনিই করেন। লেডী মিত্র তো উনি ছাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইন্দুমতী রায়ের প্রবেশ। মিঃ রায়ের উত্থান। সেটা ইংরেজী রীতি।

গৃহস্বামিনী রায় আসন পরিগ্রহ করলেন। প্রথমে গৃহে স্থানাভাবের বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন। তবে ছ'মাস পরেই গুরুদ্বোয়ারা রোডে বাংলো পাওয়ার আশা আছে। এ বাড়িতে ঘরদোর ইচ্ছেমত সাজাতে পারেননি। তবুও তো সিমলা থেকে যে আসবাব পত্র এনেছেন তার সব এখনও প্যাকিং খোলা হয়নি (সিমলা থেকে

এসেছেন এই পাঁচ মাস হলো)। ফি বছর দিল্লী-সিমলা করেন। গ্রীষ্মকালে দিল্লীতে এই প্রথম। এবার গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার শৈল-বিহার বন্ধ। নতুন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ নাকি বলেছেন, সিমলা গেলে যুদ্ধ জয়ে বিঘ্ন ঘটবে। শোন একবার যত অনাসৃষ্টির কথা! আরও বেশী গরম পড়লে কিন্তু তিনি সিমলা না গিয়ে পারবেন না, তা' বাপু. তোমরা যাই বল না কেন।

বেবী -- অর্থাৎ ন'মাসিমা—এখন আছে কোথায়? তার মেয়ের বিয়ের কত দূর? ছেলে পড়ে কোন্ ক্লাশে? তাঁর নিজের চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস কম' অবসরও পান না। কত ঝামেলা! এই তো আজ চারটায় আছে এক পার্টি। হ্যাঁগা, শাড়ীটা ইস্তিরি করে রেখেছ তো?—প্রিয়নাথবাবুর প্রতি।

হাতের ঘড়ির পানে তাকিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেম।

এখনই উঠবে? হাঁ, তা বেলা হয়েছে বটে। আছ ক'দিন? দিল্লী থেকে যাবে কোথায়? বিলেতের কী হলো? যুদ্ধ না থামলে তো আর যেতে পারছ না! বমিং-এর সময় লণ্ডনে ছিলে বুঝি? সেখানকার অবস্থা কী রকম? বাজারে ড্রিন স্যাম্পু পাওয়া যায়? ট্যাঙ্গি লিপ্‌স্টিক? এখানে তো ছাই কিচ্ছু মিলে না! আচ্ছা, একটু চা টাও তো খেলে না। ওর আবার আপিসের বেলা হচ্ছে। আচ্ছা আর একদিন এসে খেয়ে যেয়ো কিন্তু।

আরও একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার ফরমাস ছিল। ঠিকানা জানা ছিল না। প্রিয়নাথবাবু, থুড়ি, মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেম,—"ভি. আর. ভেঙ্কটশরণের বাড়িটা কোথায় জানেন? কোন্ ডিপার্টমেণ্টের যেন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী?"

"প্রচণ্ড বিস্ফোরণ" বলে একটা কথা বাংলা পত্রিকায় আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। সেটা ঠিক কী রকম জানা ছিল না। প্রিয়নাথ রায়ের অবস্থা দেখে কিছুটা অনুমান করতে পারলেম।

"এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী! ভেঙ্কটশরণ বলেছে বুঝি? চাল,

কেবল চাল। চাল দিতে দিতেই গেল মাদ্রাজীটা। জানে, আপনি নতুন লোক, ধরতে পারবেন না। এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, হুঃ। রিটায়ার করার দু' এক বছর আগে যে হতে পারে সেতো ভাগ্যবান। এখন যুদ্ধের বাজার। তাই সেকেণ্ড ডিভিসন ক্লার্কেরা পর্যন্ত সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হচ্ছে। নইলে মশাই, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হতেই যে চুলে পাক ধরে। আমি যেবার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হলাম, উডহেড সায়েব, —স্যার জন উডহেড, পরে বাংলাদেশের গভর্নর অবধি উঠলো,—ডেপুটি সেক্রেটারী। ডেকে বললেন, রয়, তোমার মতো এমন কাজের লোক—।"

অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেম। অনিচ্ছাক্রমে এবং নিজের অজ্ঞাতেও যে অপর লোকের গভীর মনস্তাপের কারণ হতে হয়, তারই দৃষ্টান্ত।

ভেঙ্কটশরণের গৃহ আছে, গৃহিণী নেই। থাকলে বিপদ ছিল। তিনি প্রাচীনপন্থী হলে তাকে গলায় দড়ি দিতে হতো, আধুনিকা হলে প্রথমে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে পলায়ন এবং পরে বাংলা সিনেমার নায়িকা। মাতাল বর নিয়ে ঘর করা যায়, কলহ করা যায় অন্যানুরাগী স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু উদাসীন ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য নেই জগতে। প্রেম ভালো, বিদ্বেষ দুঃখের, কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক ইণ্ডিফারেন্স—যে কাছেও টানে না, দূরেও ঠেলে না—শুধু ভুলে থাকে।

ভক্তেরা বলেন, ধ্যান, জ্ঞান, নিদিধ্যাসন সমস্তই ভগবানে উদ্দিষ্ট না হলে ঈশ্বর লাভ ঘটে না। বরদারাজলু ভেঙ্কটশরণ ভগবান প্রাপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব নন। কিন্তু ভক্তের ঐকান্তিকতা নিয়েই আরাধনা করছেন সেক্রেটারিয়টের। আপিস, আপিস, আর আপিস। কাজ, কাজ, আর কাজ।

সকালে সাড়ে ন'টায় সবে মাত্র ফরাস যখন ঘর ঝাঁট দিয়ে গেছে তখন এসে বসেন টেবিলে। অপরাহ্ণ গড়িয়ে যায় সন্ধ্যার আঁধারে, ঊর্ধ্ব ও অধস্তন কর্মচারীরা চলে যায় নিজ নিজ বাসায়, সহকর্মীরা

একে একে করে প্রস্থান। একা ভেঙ্কটশরণ কাজ করে যান অনন্যমনা। বাড়ি ফিরেন কখনও রাত আটটায়, কখনও বা তারও পরে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত ঐ একই ধারা। ছুটি নেই, ক্যাস্যুয়েল লীভ নেই। রবিবারে দুপুরে অনেক দিন চলে আসেন আপিসে। ফাইল নিয়ে লেখেন নোট, ফ্ল্যাগ দিয়ে দাগ দেন, "ফ্রেশ রিসিট" অথবা "পি. ইউ. সি.—পেপার আণ্ডার কনসিডারেশন।" বন্ধু বান্ধবেরা ঠাট্টা করে বলে, ভেঙ্কট, কেবল খেটেই গেলে, জীবনটা ভোগ করবে কখন?

ভেঙ্কটশরণ হাসেন আর ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়েন। বোধ হয় মনে মনে বলেন, কী আহাম্মক! হোয়াট্রে ফুল! ভোগ? হুঃ, থার্ড ডিভিসন ক্লার্ক থেকে সেকেণ্ড, সেকেণ্ড থেকে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট থেকে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট থেকে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী। অনেকটা পাল্লা। ভোগের জন্য জীবন তো আছেই পড়ে। চাই প্রমোশন, চাই উন্নতি। চাকরি রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

ভেঙ্কটশরণের এক অনুজ ছিলেন বিলাতে। আই. সি. এস. মানসে। সেখানেই পরিচয়। ভাই-এর অধ্যবসায় লক্ষ্য করেছি তাঁরও চরিত্রে। আশা করি, একদা সিভিল লিস্টের পাতায় নাম ছাপা হবে সগৌরবে।

ভেঙ্কটশরণের স্বজাতীয়েরা নয়াদিল্লীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারত সরকারের দপ্তর গোড়াতে ছিল কলকাতায়। লালদীঘির কাছে যে বাড়িতে এখন বাংলার লাট থাকেন, সেখানে বসতি ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে লর্ড হার্ডিঞ্জের। তখন সেক্রেটারিয়টে বাঙ্গালী ছিল বহু। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিল্লীতে। তখন থেকে তাদের সংখ্যা হয়েছে হ্রাস। অতঃপর পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটি নানা জাতি এসেছে ধীরে ধীরে। দখল করেছে চাকরির মসনদ। সে অভিযানে মাদ্রাজীরা সর্বাগ্রে। তারা খাটে বেশী, ফাঁকি দেয় কম।

নয়াদিল্লীতে মাদ্রাজীদের ক্লাব আছে, সঙ্ঘ আছে, স্কুল আছে। বোর্ডিং হাউসও আছে একাধিক। সেখানে স্কুলের ডেস্কের মতো ছোট ছোট টেবিল। তার উপরে কদলীপত্রে আহার। চার আনায় মিলে স্বাথম, কুটু, সম্বর ও আপ্পালম। একজন মদ্রদেশীয়ের নিয়মিত খাদ্য। কোনদিন ওর সঙ্গে পাওয়া যায় তৈয়রপত্ চত্তি অর্থাৎ নারকেলের কুঁচি সহযোগে দৈ। সেদিন তো রীতিমতো ভূরিভোজন।

শুধু অশনে নয়, বসনেও যথেষ্ট মিতাচারী দাক্ষিণাত্যের লোক। একখানা চাদর দ্বিখণ্ডিত করে হয় পরিধেয়, একটি সাধারণ ফতুয়া গাত্রাবরণ। কাঁধে একটি তোয়ালে, পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডেল। ব্যস্। আপিস ছাড়া সর্বত্র স্বচ্ছন্দচিত্তে চলাফেরা করে এই বেশে। আর যাই হোক, পোষাক নিয়ে শোক করে না মাদ্রাজী কোনদিন।

তাদের মেয়েদেরও সজ্জা বাহুল্যবর্জিত। ভূষণ পরিমিত। অবশ্য সংখ্যায়। মূল্যে নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত মাদ্রাজী গৃহিণীরও কানে আছে হীরার ফুল। তার দাম শুনে অনেক বাঙালী স্বামী চোখে সর্ষে ফুল দেখবেন। বেশীর ভাগ মাদ্রাজী তরুণীদের রূপ নেই, কিন্তু রুচি আছে। তাদের গৃহদ্বার সকালে সন্ধ্যায় আলিম্পনের দ্বারা সুদৃশ্য, তাদের কবরীবন্ধন পুষ্পস্তবকে সজ্জিত। সঙ্গীতে দক্ষতা আছে প্রায় সবারই।

সদ্য পরিচিত একজন পদস্থ মাদ্রাজীর গৃহে আমন্ত্রণ ছিল ডিনারের। ভদ্রলোক দু'হাজার টাকা মাইনে পান। অথচ আহারের আয়োজন দেখে রসনার বদলে চক্ষু জলসিক্ত হওয়ার উপক্রম। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর পারদর্শিতা আছে বীণা বাদনে। অপূর্ব সুর সৃষ্টি করলেন তারযন্ত্রে। জঠর যদিবা রইল অভুক্ত শ্রবণ হলো মধু-তৃপ্ত। স্বচ্ছন্দ চিত্তে ক্ষমা করা গেল তাঁর ভোজনসভার ব্যয়কুণ্ঠ আয়োজন।

মাদ্রাজীদের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের তফাৎ এইখানে। আচার এবং আচরণে পাঞ্জাবীরা শুধু মডার্ন নয়, আলট্রা মডার্ন। যুবক, বৃদ্ধ

সবাই মিলে করছে ঊর্ধ্বশ্বাসে বিলাতীর নকল। শুধু ছেলেরা হলে ক্ষতি ছিল না। মেয়েরাও।

রেস্‌, ক্লাব ও কার্নিভ্যাল—অতি আধুনিকতার এই তিন তীর্থক্ষেত্রে পাঞ্জাবী মহিলারাই প্রধান পাণ্ডা। তাঁরা চার রাউণ্ড শেরী সাবাড় করতে পারেন হাসতে হাসতে। রজনীর শেষ প্রহর পর্যন্ত ফক্সট্রট নাচতে পারেন অক্লান্ত চরণে। তাঁদের দেহে শোভার চাইতে সম্ভার অধিক। তাঁরা বিয়ের আদিতে তন্বী, অন্তে বিপুলা। তাঁদের বর্ণ গৌর, কিন্তু আনন লালিত্যহীন। চাকর-চাকরাণীদের শাসনকার্যে স্বহস্তে উত্তম-মধ্যম প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন না এতটুকুও। দেহে কিম্বা মনে পাঞ্জাবিনীর নাইকো কোমলতা।

ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ভাবধারার প্রথম উন্মেষ ঘটল বাংলাদেশে। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতাকে প্রথম বরণ করল বাঙালী। সে যুগের বাঙালীর প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর, প্রতিভা ছিল প্রখর। ইংরেজের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে সে গলাধঃকরণ করল না, করল গ্রহণ। আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জারক রসে পরিপাক করে তাকে সে আত্মসাৎ করল। পশ্চিমের চিন্তাধারাকে সে ধার করল না, ধারণ করল। তাই বাঙালীর মধ্যে সম্ভব হলো মাইকেল মধুসূদন, বিবেকানন্দ ও চিত্তরঞ্জন দাশ। সাহিত্যে, শিল্পে ও ললিতকলায় বাংলাদেশ সূচনা করল সমৃদ্ধিযুক্ত নবযুগের, আনল দেশাত্মবোধের অভূতপূর্ব প্রেরণা। যৌবনকে দিল অভয়-মন্ত্র, নারীকে দিল আত্মচেতনা। সেদিন সর্ব-ভারতের অধিনায়িকার আসনে অধিষ্ঠিতা হলেন বঙ্গজননী।

য়ুরোপের সংস্পর্শে সর্বশেষে এসেছে পাঞ্জাব। বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় শত বর্ষ পরে লর্ড ডালহৌসী দখল করেছিলেন পাঞ্জাব। কিন্তু য়ুরোপকে পাঞ্জাব অন্তরের মধ্যে পায়নি, শুধু বাইরে থেকে করেছে অনুবর্তন। য়ুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সে অনুসরণ করেনি, অনুকরণ করেছে। সে ভারতবর্ষকে দেয়নি কাব্য,

দেয়নি সঙ্গীত, দেয়নি বিজ্ঞান। দিতে পারেনি দেশসেবার আদর্শ। আধুনিক ভারতবর্ষে তার দান একদল পি. ডব্লিউ. ডি'র. এঞ্জিনিয়র, সৈন্যদলের সুবেদার এবং আই. এম. এসের ডাক্তার। একমাত্র লাজপৎ রায় ছাড়া পাঞ্জাবের আর কেউ হয়নি আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি।

কলকাতার লালদীঘির জল সাদা এবং গোলদীঘির আকার চতুষ্কোণ। কিন্তু এখানকার গোল মার্কেট সার্থকনামা। সেটা গোলই বটে। চারটি রাস্তার সংগম স্থলে বৃত্তাকার দ্বীপের মতো এ-বাজারটি। দোতলা বাড়ি। উপরে দরজীর দোকান, নীচে শাকসব্জি, মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি। পৃথক পৃথক কক্ষ। ইংরেজীতে লেখা আছে বিজ্ঞপ্তি,—কোনটাতে মাছ, কোনটাতে বা মাংস। প্রবেশ-পথগুলিতে সূক্ষ্ম তারের জাল-আঁটা দরজা। স্প্রীং দেওয়া আছে, যাতে আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। মাছের ঘরটিতে উঁচু সিমেণ্টের বেদীতে রাখা হয় মাছ। তার উপর দিয়ে গেছে জলের কলের সছিদ্র পাইপ। ছিদ্রপথে অবিরাম বিন্দু বিন্দু করে ঝরছে জল। আপনি ধুইয়ে নিচ্ছে বেদীটি। আইসচেস্টের ভিতরে থাকে মাছ। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মাছির উপদ্রব নেই, কর্দমাক্ত জল সিঞ্চনে পঙ্কিল হওয়ার আশঙ্কা নেই ক্রেতাদের বসন। মার্কেটের দু'ধারে মনোহারী দোকান, মুদী ও ময়রা ইত্যাদি। বাঙালীর দোকান আছে কয়েকটি, তার মধ্যে একটিতে মিলে দৈ, সন্দেশ ও অন্যান্য বাঙালীর খাবার।

গোল মার্কেটের পথে আছে লেডী হার্ডিঞ্জ কলেজ, ভারতবর্ষে পুরুষের সম্পর্কশূন্য একমাত্র মহিলা মেডিক্যাল কলেজ। বিদ্যার্থিনীদের মধ্যে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আছে, মাদ্রাজী আছে, মারাঠী আছে, আসামী আছে। বাঙালী নেই একটিও। পাঞ্জাবী এক অধ্যাপক বন্ধুর শ্যালিকা পড়েন ফোর্থ-ইয়ারে। সুদর্শনা। বাংলার বাইরে কলেজে ইউনিভারসিটিতে সুন্দরীর সাক্ষাৎ মিলে। রূপের অভাবটাই

সেখানকার মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার কারণ নয়। পড়াশুনাটা নয় বিয়ের আগের ষ্টপ্ গ্যাপ্।

মেয়েটি মেধাবী, ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পরীক্ষায়। বললেন, মেডিসিনের চাইতে সার্জারীতে আগ্রহ বেশী। পাশ করে হবেন সার্জন। সর্বনাশ!

প্রাচীনারা হাতে ধরতেন সম্মার্জনী। ঘরের মেঝে থেকে অবাধ্য স্বামীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত সর্বত্র তার অপক্ষপাত ব্যবহারের দ্বারা সংসার-যাত্রাকে তাঁরা নিরঙ্কুশ রাখতেন। আধুনিকাদের হস্তে শোভে ভ্যানিটি ব্যাগ। তার গর্ভে নিহিত প্রসাধন সামগ্রী নিজের স্বামীর হৃদয়ে ত্রাস এবং পরের স্বামীর হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে। অতি আধুনিকারা যদি ধরেন ফরসেপস্ তবে বেচারী পুরুষ জাতিকে আত্মরক্ষা সমিতি স্থাপন করতে হবে অচিরে!

রসবোধ আছে তরুণীর। কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

লেডী হার্ডিঞ্জে বাঙালী ছাত্রী না থাকলেও অধ্যাপিকা আছেন একজন। মহিলার এক ভাই আই. সি. এস., এক ভাই আই. এম. এস., দুই ভাই একাউন্টস্ সার্ভিসের উচ্চপদস্থ অফিসার। এক বোন শিল্পী। গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'জার্নেল অব সাইন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ'-এর চিত্র-সম্পাদিকা। অন্যান্য ভাই বোনেরাও সকলেই কৃতী। তিনি নিজে ডব্লিউ. এম. এস অর্থাৎ আই. এম. এসেরই মহিলা সংস্করণের অন্তর্ভুক্তা। মাইনে পান অনেক, ডাক্তারী করে আয় করেন যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার, অমায়িক ভাষণ, সহৃদয় আচরণ। লেডী-ডাক্তারী গন্ধ নেই কোনখানে। কলেজের সংলগ্ন সরকারী কোয়ার্টার। সেখানে গৃহসজ্জায় গৃহস্বামিনীর সুরুচির পরিচয় পরিস্ফুট।

নয়াদিল্লীতে মহিলা ডাক্তার আছেন একাধিক। যুক্ত প্রদেশের আছেন জন দুই। লেডী হার্ডিঞ্জের যিনি প্রিন্সিপাল তিনি মদ্রদেশীয়। একটি আছেন পাঞ্জাবী।' এর জনক ধরমবীর পাঞ্জাবে

সুপরিচিত, জননী য়ুরোপীয়। তাঁরা উভয়ই জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ। মহিলা বিয়ে করেছেন একটি বাঙালী। এরা দু'জনেই ডাক্তার। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রাজনীতিক বা স্কুল মাস্টার হওয়ার চাইতে ভালো। পলিটিক্যাল ইকনমির মতো দাম্পত্যেও ডিভিসন অব লেবার আছে। সেখানে স্ত্রীর অংশ কথা বলার, স্বামীর অংশ কথা শোনার। দু'জনেই বক্তা হলে গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য রক্ষায় নিদারুণ বিঘ্ন ঘটে।

কনট প্লেসকে বলা যায় দিল্লীর চৌরঙ্গী। সাহেবী এবং সাহেবী ধরণের দোকান পসার সেখানে। সুট বানাবার দর্জী, ফটো তোলার স্টুডিও, প্রভিসন্সের স্টোর, চুলে ঢেউ খেলাবার বিউটি পার্লার, লাঞ্চ খাওয়ার হোটেল, সিনেমা দেখবার ছবিঘর,—সবই এই কনট প্লেসে। শুধু চৌরঙ্গী নয়, ক্লাইভ স্ট্রীটও। ব্যাঙ্ক ও আপিস-পাড়াও এইটেই। বার্ড কোম্পানীর পেটেন্ট স্টোন, মার্টিনের টাইলস, ডালমিয়ার সিমেন্ট কিনতে হলে আসতে হবে কনট প্লেসেরই আশে পাশে।

কনট প্লেসের নামকরণ হয়েছে রাজা পঞ্চম জর্জের পিতৃব্য পরলোকগত ডিউক অব কনটের নামে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মসের ফলে বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদ সৃষ্টি হলে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে ভারতে আসেন তিনি। জালীনওয়ালাবাগের নরঘাতন নিষ্ঠুরতার স্মৃতি তখনও স্পষ্ট জাগ্রত ভারতীয়দের মনে। বৃদ্ধ ডিউকের উদ্বোধন বক্তৃতায় তার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, ছিল আন্তরিকতার সুর,—"দু'পক্ষেই ভুল-ত্রুটি ঘটেছে বিস্তর। আজ তার পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা সবাই অতীতের কথা বিস্মৃত হই, পরস্পরকে ক্ষমা করি। ফরগিভ এ্যাণ্ড ফরগেট।"

কিন্তু ফরগেটনেস তো চলে শুধু সমানে সমানে। শাসক-শাসিতের মধ্যে তার স্থিতি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতোই ক্ষণিকের। মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন করে স্মরণের কারণ ঘটে এক পক্ষের ক্ষমতাগর্বিত

আস্ফালন ও অপর পক্ষের নিরুপায় নিষ্ফল আর্তনাদ। জালীনওয়ালাবাগ ভুলতে না ভুলতে আসে হিজলী, তার স্মৃতি শূন্যে মিলাবার আগে ঘটে কাঁথি বা তমলুক।

কনট প্লেসের আকৃতি গোলাকার। বৃত্তের ভিতরের দিকে মুখ করে এক সারি দালান। তার পিছনে আছে অনুরূপ আর এক সারি। তাদের মুখ বাইরের দিকে। সেটার নাম কনট সার্কাস। রোমান পদ্ধতির বিরাটাকার থামের উপরে প্রসারিত বারান্দা। সেখানে অপরাহ্ণ বেলায় ভীড় জমে সুবেশ নরনারীর, সওদা করে সৌখীন ক্রেতারা, আলোকোজ্জ্বল শো-কেসে বিচিত্র দ্রব্যের দর্শন পায় কৌতূহলী জনতা।

দালানের পরেই প্রশস্ত রাজপথ। তার ঠিক মাঝখানে সাদা দাগ দিয়ে পার্কিংএর নির্দেশ, সেখানে থাকবে অপেক্ষমান মোটরকার ও টাঙ্গা। দু'পাশ দিয়ে চলে যানবাহন। রাস্তার ওপারে বিস্তীর্ণ পার্ক। লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা ফুটপাথ থেকে বিচ্ছিন্ন। সেখানে বিশ্রামার্থীদের জন্য আছে বেঞ্চি, ক্রীড়াচঞ্চল শিশুদের জন্য আছে তৃণাচ্ছাদিত অঙ্গন এবং পুষ্পবিলাসীদের জন্য আছে অজস্র ফুলের আয়োজন।

ঘাস জিনিষটার মূল্য যে কত তা জানা নেই বাংলাদেশে, যেখানে দু'দিন না হাঁটলে পায়ের তলায় গজায় ঘন ঘাসের বন। অপদার্থ ব্যক্তিকে ঘাস খেতে বলে গাল দেওয়ার উপায় নেই উত্তর ভারতে। ভাতের চাইতে সেটা অনেক বেশী দুর্ঘট। গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ যেখানে একশ তেরো ডিগ্রীতে ওঠে এবং সারা বছরে যে-দেশে মাত্র কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, সে-দেশে ঘাস জন্মাতে প্রয়াসের প্রয়োজন। নয়াদিল্লীর কনট প্লেসের প্রত্যেকটি ঘাস হাতে করে বোনা এবং হাতে ধরে বাঁচানো। তার জন্য সরকারী হর্টিকালচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে পরিমাণ যত্ন, জল ও অর্থ ব্যয় করা হয়, সে-হিসাবটা যে কোন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের জ্বালাময়ী প্রবন্ধ রচনার উপাদান হতে পারে।

ফুল সম্পর্কে আমরা ভারতীয়েরা, বিশেষ করে বাঙালীরা যথেষ্ট সচেতন নই। ফুল এবং চাঁদের আলো একমাত্র কলেজ ম্যাগাজীনে কিশোর বয়স্কদের প্রথম পদ্য রচনা ছাড়া আর কোন কাজে লাগে বলে তো জানা নেই। আর্টিস্টিক জাতি বলে বাঙালীর মনে যে আত্মাভিমান আছে সে নিয়ে তর্ক চলে, কিন্তু তথ্য মিলে না। সাধারণ স্বল্পবিত্ত ইংরেজ পরিবারেও খাওয়ার টেবিলে বা বসার ঘরে সামান্য কিছু ফুলের সন্ধান মিলে নিশ্চিত। অতি সচ্ছল বাঙালীর গৃহে পুষ্পগুচ্ছের চিহ্ন দেখা যায় কদাচিৎ। অর্থের প্রশ্ন নয়, রুচির প্রশ্ন। বেশীর ভাগ বাঙালী পরিবারে ফুলের প্রয়োজন হয় জীবনে মাত্র দু'বার,—ফুলশয্যার রাত্রিতে এবং শবাধার সজ্জায়।

পুরাকালে পরিবারে গৃহদেবতার পূজার রীতি ছিল। সেজন্য প্রয়োজন ছিল গন্ধপুষ্পের। বাড়িতে থাকতো দু'একটি ফুলের গাছ। আধুনিকতায় গৃহদেবতার স্থান নেই। পূজা যদি করতেই হয়, তবে পাথরের ঠাকুর অপেক্ষা রক্তমাংসের দেবতাদের তুষ্ট করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ফল মিলে হাতে হাতে। তাই এ-যুগে আমাদের ভজন-পূজন হয় আপিসের বড় সাহেব, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের। আমাদের ঠাকুর ঘরের জায়গা দখল করেছে ড্রয়িং রুম। কিন্তু জবা, দোপাটি ও নাগকেশরের স্থান কার্নেশন, ডালিয়া বা গ্ল্যাডিওলাস এসে পূর্ণ করেনি। সখীপরিবৃতা আধুনিকা শকুন্তলাকে পুষ্পবীথিকায় তরু আলবালে জল সিঞ্চনরত দেখার সম্ভাবনা মাত্র নেই। তার দর্শনাভিলাষে এ যুগের দুষ্মন্তকে যেতে হবে লাইট হাউস সিনেমায়, নয়তো লেকে। কলকাতায় যে-লোক ফুল ঘরে রাখে সে নেহাৎই ফুলবাবু।

এ শহরে ফুলের অভাব নেই। পথের দু'পাশে সরকারী বাংলোগুলির বিস্তৃত অঙ্গন পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ। পথচারণে দৃষ্টি মুগ্ধ হয়। রাস্তার চৌমাথায় বৃত্তাকৃতি পার্কগুলিতে আছে ফুলের কেয়ারী।

ডাকঘরের গায়ে, হাসপাতালের মাঠে ফুটে রয়েছে প্রচুর মসুর্মী ফুল। কনট প্লেসে আছে 'ক্যানা' ফুলের ঝাড়। শীতের দিনে তাদের পুষ্পাভরণের অজস্রতা কল্পনা করা যায় গ্রীষ্মের ভগ্নাবশেষ দেখেই।

নয়াদিল্লীর আকাশে আছে বৈরাগীর দৃষ্টি, বাতাসে আছে নিঃস্বের হুতাশ্বাস, মাটিতে আছে তপস্বিনীর কাঠিন্য। কিন্তু তার পথপার্শ্বে সযত্নরোপিত তরুশ্রেণী পথচারীর জন্য প্রসারিত করেছে ছত্রচ্ছায়া, তার শ্যামল তৃণাবৃত পার্ক বিছিয়ে দিয়েছে হরিৎ অঞ্চল, তার বহু-বিচিত্র কুসুমের দল রচনা করেছে বর্ণাঢ্য ইন্দ্রজাল। প্রণয়ী যুগলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল আবেষ্টন আছে নয়াদিল্লীতে। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে তার জনবিরল, ধ্বনিবিরহিত, গন্ধ-আমোদিত পথে পাশাপাশি চলতে গিয়ে সগুবিবাহিত তরুণ-তরুণীর হৃদয় হয় উদ্বেল, কণ্ঠ হয় ক্ষীণ, চুপি চুপি বলতে অভিলাষ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ কোন কথা, যার না আছে অর্থ, না আছে সঙ্গতি, না আছে প্রয়োজন। এবং সেই স্তব্ধ সায়াহ্নে একজনের ঝুমকা-দোলানো কানের অত নিকটে আর একজনের মুখ আনতে গেলে তা' দু'একবার লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়াও একেবারে বিচিত্র নয়।

আট

সকাল বেলা ঘুম ভাঙলো একটি মেয়ের চেঁচানিতে। শুধু আজ নয়, প্রত্যহই ভাঙে। অবশ্য আমি বলি চেঁচানি। মেয়ের মা বলেন গান। মেয়েটি গান শিখছে।

পৃথিবীতে সঙ্গীত কে কখন সৃষ্টি করেছেন জানিনে। কিন্তু এতকাল এইটুকু বিশ্বাস ছিল, যিনিই করুন, তাঁর মনে কোনো নিষ্ঠুর অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু সে-ধারণা বাজায় রাখা ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে।

মেয়েটির গলায় সুরের লেশ মাত্র নেই, অথচ জোর আছে অসুরের। সেটা আরও সাংঘাতিক। ভোর পাঁচটা থেকে সাতটা,—এই পাকা দু'টি ঘণ্টা সে প্রত্যহ সঙ্গীতাভ্যাস করে। সপ্ত সুরের সঙ্গে কুস্তি করে বললেই ঠিক হয়। আশেপাশের প্রতিবেশীরা যে এখনও ননভায়োলেণ্ট আছে সেটা গান্ধীজির শিক্ষায় নয়, একান্ত নিরুপায় হয়েই। সভ্যতার অনেক দণ্ড আছে। তার মধ্যে এও একটা।

য়ুরোপ আমাদের অনেকগুলি মন্দ জিনিষ দিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কোনটা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাক্তারেরা বলেন সিফিলিস, গুরুজনেরা বলেন ফ্রি-লভ এবং গান্ধীজি বলেন কলকারখানা। আমার মনে হয় ভারতবর্ষে য়ুরোপের সব চেয়ে ক্ষতিকর আমদানি হারমোনিয়ম। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উপর নিদারুণ অত্যাচারের এমন দ্বিতীয় যন্ত্র নেই। আশ্চর্য নয় যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছেন, জনসভায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করার আগে কেউ যখন হারমোনিয়ম বাজিয়ে উদ্বোধন সঙ্গীত সুরু করে তখনই তাঁর অদম্য অভিলাষ হয়, জনতার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ বাদ্যযন্ত্রটাকে পদাঘাতের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করেন!

জড় পদার্থের একটা সুবিধা আছে। তার সহনশীলতা অপরিসীম। সে বিদ্রোহ করে না। দিনের পর দিন তু'ঘণ্টা বেসুরো চীৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আওয়াজ বের করা একমাত্র হারমোনিয়মের পক্ষেই সম্ভব। গত দশদিন ধরে সেই এক সুরে—'বঁধু, তুমি যে চলে গেলে, ফিরে তো নাহি এলে'। বঁধু লোকটা যে কে, ঠিক জানিনে। যেই হোক, বেচারীর অবস্থা কল্পনা করতে পারি। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ থাকলে হাতজোড় করে বলতেম,—বাছা, চলে যে গেছে, সে নেহাৎ প্রাণের দায়েই গেছে এবং তোমার ঐ গান না থামালে সে আর ফিরছে না এও নিশ্চয়। প্রেম যত গভীরই হোক প্রাণের মায়া, অর্থাৎ কানের মায়ার চাইতে সে বড় নয়!

মেয়েটির অপরাধ নেই। তার মাকেও দোষ দেওয়া বৃথা। তিনি জানেন, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। পাত্রপক্ষ কনে দেখতে এলে গানের পরীক্ষা আছেই। সুতরাং তার জন্য মেয়েকে তৈয়ার করা আবশ্যক। তাই কিনতে হয় হারমোনিয়ম, রাখতে হয় গানের মাস্টার, মেয়েকে প্রাণান্তকর কসরৎ করতে হয় কণ্ঠস্বরের।

এদেশে সর্বগুণান্বিতা হবার দাবি মেয়েদের উপরে। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হতে হবে বিদুষী, কলাবতী, সুধীরা ও গৃহকর্মনিপুণা। যে-মেয়ে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এস সি পাশ করেছে তাকেও কার্পেটে ফুল তোলা শিখতে হয়, বড়ির ফোড়ন দিয়ে মোচার ঘণ্ট রাঁধতে জানতে হয় এবং সম্ভবপর বরের বন্ধুদের সামনে কনে বাছনির সময় মহাত্মা গান্ধীর একটি অতি পরিচিত ফটোর ভঙ্গীতে মাদুরে বসে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরতে হয়—'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে' ইত্যাদি।

বিবাহের দরবারে পুরুষের কাছে প্রত্যাশা সামান্য। ডাক্তার বরের মাসিক আয়ের খোঁজ নিয়েই মেয়ের মায়েরা খুসী থাকেন, তার ক্রীড়া-দক্ষতা, অভিনয়-পারদর্শিতা কিম্বা বক্তৃতা-শক্তি নিয়ে মাথা ঘামান না। ছেলেরা করবে শুধু একটা। হয় লেখাপড়া, নয় ফুটবল,

নয় তো ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ। মেয়েদের বিচার কোন একটা মাত্র কৃতিত্বে নয়, সব কিছু মিলিয়ে। তাদের দাম প্রথমতঃ রূপে, তারপর তাদের বিদ্যায়, তাদের সঙ্গীতে, তাদের নৃত্যে, তাদের সূচীশিল্পে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের পিতৃকুলের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের পরিমাপে।

পুরাকালে রাজকন্যারা নিজেরা পতি নির্বাচন করতেন। পুরুষের হতো পরীক্ষা। বীর্যবত্তার পরীক্ষা। পুরুষকে তখন স্বয়ম্বর সভায় নারীর বরমাল্যের যোগ্য হওয়ার সাধনা করতে হতো। একালে মেয়েরা সহজলভ্যা। তাদের জন্য হরধনু ভাঙ্গতে হয় না, প্রতিবিম্ব দেখে মৎস্যচক্র বিদ্ধ করতে হয় না। তাদের লাভ করতে বাঁধা মাইনের একটা চাকরি হলেই যথেষ্ট। একালের রাজপুত্র, কোটাল-পুত্রদের কঁুচবরণ কন্যার খোঁজে ঘর ছেড়ে বিদেশ বেরোতে হয় না। দুধসাগরের জলের নীচে যে রূপার কৌটায় কালো ভোমরার মধ্যে আছে রাক্ষসের প্রাণ তার সন্ধান করতে হয় না। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে পাতালপুরীর রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাতে হয় না। সরকারী দপ্তরখানায় অফিসারের তকমা এঁটে তাঁরা বীরদর্পে প্রজাপতি ঋষিকে নিজের দুয়ারে হাঁক দিয়ে বলেন,—লে আও নিপুণিকা, চতুরিকা, মালবিকার দল। তোমার রেণুকা সেন, মাধুরী রায়, ডলী দত্ত বা অরুন্ধতী চাটার্জীদের! একালের কেশবতী রাজকন্যারা নব্বুই ভরি সোনা আর তিন প্রস্থ ফার্নিচারের খেয়া নৌকা চেপে আপনি এসে উত্তীর্ণ হন বাসরঘরের ঘাটে। পণের টাকায় কারেন্সী নোটের মালা বরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন, যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।

আমার কর্ণপটহ-বিদীর্ণকারিণী সঙ্গীত-অভিলাষিণীকে চোখে দেখিনি। শুনেছি একেবারে রূপহীনা নন। লেখাপড়ায়ও ভালো। তা' হোক। কিন্তু গান তাকে শিখতেই হবে। আমরা হতভাগ্য প্রতিবেশী,—আমাদের ললাটে দুঃখ আছে; খণ্ডাবে কে?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে আর একবার নিদ্রার উদ্যোগ

করলেম। বৃথা। এবার গান নয়, কার্ড। দর্শনপ্রার্থী এক ভদ্রলোক। কার্ডের উপরে ছাপা—পি. সি. সমাদ্দার, বি. এ. ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট কণ্ট্রোলার। ভদ্রলোক আজ সকালে আসবেন কথা ছিল বটে। কিন্তু সকাল মানে যে সাড়ে ছ'টা তা ভাবতে পারিনি।

এই যে, নমস্কার। ঘুমুচ্ছিলেন না কি? বড় অন্যায় হয়ে গেছে তা হলে। আমি? আমি মশাই ঠিক পাঁচটায় উঠে খানিকটা হেঁটে আসি। বারখাম্বা ধরে ফিরোজ শা রোড, ইউণ্ডসর প্লেস, কুইনসওয়ে হয়ে বাড়ি, মাইল ছুই হবে। আছি ভালো মশাই! ডিসপেপ্‌সিয়াটা অনেকটা চাপা আছে। চা? আচ্ছা দিন এক কাপ., একবার অবশ্য হয়ে গেছে। আপনার বুঝি এখনও হয়নি? সাতটার আগে বিছানা ছাড়েন না? খাসা আছেন মশাই। দশটা-ছ'টা আপিস করতে হয় না, কারো তোয়াক্কা নেই! হাই সার্কেলে মুভ করেন। হ্যাঁ, ভালো কথা, জিজ্ঞাসা করেছিলেন নাকি নেহরুকে ঐ যে ডিয়ারনেস্ এলাউয়েন্সের কথাটা।

নেহরু মানে, আর. কে. নেহরু। ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। ভদ্রলোক নিজে আই. সি. এস. এবং স্ত্রী বিদেশিনী, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি ছু'জনারই সত্যিকার টান আছে।

ত্রুটি স্বীকার করতে হলো। স্মরণ ছিল না। কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে হাল ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, আজ একটু মনে রাখবেন। শুনছি তো সাড়ে সতর পারসেণ্ট করার কথা হয়েছে। কিন্তু কত মাইনে অবধি এলাউয়েন্সটা দেবে সেইটেই আসল কথা। পাঁচশ' টাকার উপরে মাইনে হলে দেবে না বলে কেউ কেউ বলছে। দেখুন তো একবার অন্যায়টা। কেন, আমাদের অপরাধটা কী? জিনিষপত্রের দামতো আর শুধু পাঁচশ'র নীচেওয়ালাদের জন্যেই বাড়েনি। ছুধের দাম টাকায় ছ' সেরের জায়গায় এক সের নিতে হচ্ছে তাকেও, আমাকেও। বলুন সত্যি কি না? তবে কেন ডিয়ারনেস

এলাউয়েন্সের বেলায় আমরা বাদ পড়ব? এ সব ইনজাস্টিসের জন্যেই তো মশাই গভর্নমেণ্টের কাজে ঘেন্না ধরে যায়। গান্ধী মহারাজ কি আর অমনি সয়তানী গভর্নমেণ্ট বলেন?

গান্ধীভক্তকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে হলো যে, গান্ধীজি পাঁচশ' টাকার বেশী কারোর মাইনেই রাখতে রাজী নন।

না, না, সেটা ঠিক নয় মশাই। তিনি মহাত্মা, তাঁর কথা আলাদা। ঋষিতুল্য লোক। একটু ছাগলের দুধ পেলেই হলো। আর পাঁচজনের তো তা নয়। এই ধরুন না আমারই কথা। আপনি তো ঘরের লোকের মতো, আপনাকে বলতে আর কী? আটশ' টাকা পাই। ইনকাম ট্যাক্স, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কেটে নিয়ে হাতে আসে সাতশ' তের টাকা পাঁচ আনা। ফি মাসেই শেষের দিকে টানাটানি হয়। কোন্‌টা না করলে হয়? গাড়ি আছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ছেলেকে বিলেতে পাঠাতে হবে। পাঁচশ' টাকার সীমা কিছু কাজের কথা নয়। স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বাড়াতে হবে, তা না হলে ভারতবর্ষের উন্নতি নেই। দেখুন না বিলেতে, এমেরিকায়। হ্যাঁ, সায়েবগুলিকে তাড়িয়ে দিন না। ওরা করে কী? শুধু দস্তখত। যা কিছু তো আমরাই লিখে পড়ে দিই। কিন্তু পাঁচশ'র উপরে যদি মাইনে না থাকে, তবে চাপরাশীর মাইনে যে মাসে আট আনায় দাঁড়াবে! দাঁড়াবে না? বরং এখনকার চাইতে আরও বাড়বে? অবাক করলেন মশাই! কী জানি; আপনাদের কংগ্রেসীদের কী বিচার-বুদ্ধি আপনারাই জানেন।

কংগ্রেসীদের বিচার-বুদ্ধি ব্যাখ্যা করার মতো ধৈর্য বা সময় কোনোটাই ছিল না। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ক্রীপস আলোচনার কথা তুললেম। দেখা গেল তাতেও আগ্রহের একেবারে অভাব নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু হবে মনে হচ্ছে কি? হলে বাঁচা যায় মশাই। ইংরেজ ব্যাটাদের আচ্ছা শিক্ষা হয়। ছিল বটে আগের দিনে সব দিলদরিয়া সাহেব। যথার্থ মা-বাপের মতো। আমি তখন সবে

সেক্রেটারিয়টে ঢুকেছি। আমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন মহাতপ বাবু। মহাতপ ঘোষ, খড়দায় বাড়ি। বুড়ো হয়েছেন, বয়স সাতান্ন'র কাছাকাছি। সার্ভিস বুকে লেখা আটচল্লিশ। পেন্সনের আরও সাত বছর বাকী। চোখে একেবারেই দেখতে পান না, লিখতে হাত কাঁপে। একদিন ফাইলে টাইপকরা লেখার উপরেই দস্তখত করে বসে আছেন। আমরা ভয়ে সারা। আজ আর রক্ষে নেই। মারে,—সার অ্যালেকজেণ্ডার মারে—সাহেব ছিল আমাদের সেক্রেটারী। ডেকে নিয়ে বললেন, মহাটপ্, ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে? না করে থাকে তো ক্ষতি নেই। কাল নিয়ে এসো, ভর্তি করে দেব। তুমি এবার রিটায়ার কর। অনেক খেটেছ, এখন ডিসার্ভ ওয়েল-আর্নড রেস্ট। আর এখন মশাই, আমার মেজ শ্যালা কলকাতা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। দু'বছরের চেষ্টায় ঢোকাতে পারছিনে।

শুধু মেজ শ্যালকের চাকরি প্রাপ্তিতে ব্যর্থতা নয়। নিজের প্রমোশন সম্পর্কেও অভিযোগ ছিল।

স্বরাজ না হলে আর চাকরি করে সুখ নেই মশাই। ইংরেজ ব্যাটাদের কাছে এখন মুসলমানেরা হচ্ছে বড় পিয়ারের। তাদেরই পোয়া বারো। কাজ জানুক আর নাই জানুক, মাথায় ফেজ থাকলেই হলো। পেটে বোমা মারলে এক কথা শুদ্ধ ইংরেজী বেরোয় না এমন সব লোক অফিসার হয়ে এসে বসেছে। খান বলে' আমাদের এক নতুন কণ্ট্রোলার এসেছে। আকাট মূর্খ। সেদিন এক ফাইলে রেফারেন্স লিখতে দুটো R দিয়ে বসে আছে। গত মাসে দু'বছরের জুনিয়র একজন মুসলমান আমাদের চার জনকে ডিঙ্গিয়ে ডেপুটি চীফ হয়ে গেল। এসব অবিচার কি আর চিরকাল সইবে? ইংরেজদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তবে হ্যাঁ, এও বলি, হবে নাই বা কেন? মুসলমানদের ফেলো-ফিলিং আছে। চাকরি নিয়ে, প্রমোশন নিয়ে তাদের লীডারেরা সব সময়ে লড়ছে। পান থেকে চুন খসেছে কি, অমনি এসেম্বলীতে পাঁচজন মুসলমান মেম্বার পাঁচটা

প্রশ্ন করবে, উইল দি অনারেবল মেম্বার বি প্লিজড টু স্টেট। একটা মুসলমান চাপরাশীকে কিছু বলেছেন তো মিনিস্টারেরা কৈফিয়ৎ তলব করবে! আর আমাদের হিন্দুরা? সব কংগ্রেসী। তাঁরা কেবল উচ্চাঙ্গের কথা বলে বলেই গেলেন। স্বরাজ, স্বাধীনতা, কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। আর চাকরি-বাকরিগুলি সবই যদি অন্যের হাতে গেল তবে স্বরাজ নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? আমি পষ্ট কথা বলবো মশাই, আমাদের কংগ্রেসের কর্তারা প্রাকটিক্যাল পলিটিক্স একেবারেই বোঝেন না। তাই জীবন কাটাচ্ছেন শুধু জেলখানায়।

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে লাভ নেই, তর্ক করা নিরর্থক। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের অতি পরিচিত আবহাওয়ায় মানুষ। চাকরিকে জানেন জীবনের অনিবার্য অবলম্বন, গভর্নমেণ্ট পোস্টকে আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য। তার ধ্যান ধারণা, চিন্তা ও স্বপ্ন সমস্তই এই চাকরিকে কেন্দ্র করে। ক্যারেক্টার রোল নিয়ে তার প্রারম্ভ, পেন্সন নিয়ে তার শেষ। এবং এই আদি ও অন্তের মাঝখানে প্রমোশন দিয়ে তার বিস্তার।

আপিসের বেলা হচ্ছিল। সমাদ্দার বাবু গাত্রোত্থান করলেন। আচ্ছা, এখন তা'হলে উঠি। আপিস আছে। আজ আবার এ মাসের এরিয়ার স্টেটমেণ্টটা পাঠাতে হবে। বিকেলের দিকে আর একদিন আসবো। বিকেলে বাড়ি থাকেন না? তাহ'লে সকালেই আসবো। আচ্ছা, চলি এখন। ঐ ডিয়ারনেস এলাউয়েন্সের কথাটা কিন্তু আজ একবার কাইণ্ডলি—।

বিকালের দিকে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। নয়াদিল্লীর প্রেস ক্লাব টি পার্টি দিচ্ছেন সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে। ক্রীপস চা, লাঞ্চ ও ডিনারের বহু নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র প্রেস ক্লাব ছাড়া আর কারো কোনো আমন্ত্রণই তিনি গ্রহণ করেন নি। বললেন, তাঁর প্রতি ভারতীয় সাংবাদিকদের সহৃদয় ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং সে-কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই চা-চক্রে তিনি যোগ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

সেক্রেটারিয়টের সাউথ ব্লকের প্রাঙ্গণে চা-পার্টির আয়োজন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাংবাদিকদের নিয়ে নিমন্ত্রিত প্রায় শ'দেড়েক কয়েকজন মহিলাও আছেন। অবশ্য তাঁরা সবাই বিদেশিনী।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি বাঙালী। ঊষানাথ সেন। ভারতে সাংবাদিকদের গুরুস্থানীয় ও এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় কে. সি. রায়ের সহকর্মী ছিলেন। বর্তমানে এসোসিয়েটেড প্রেসের অন্যতম কর্ণধার, দিল্লী আপিসের কর্মসচিব। বয়স ষাটের উপরে, শরীর সুগঠিত। বিরলকেশ, তীক্ষ্ণনাসা, উজ্জ্বল দৃষ্টি। কথাবার্তা, চালচলন ও বেশভূষায় প্রখর ব্যক্তিত্বের চিহ্ন আছে। ভদ্রলোক অকৃতদার। নয়াদিল্লীতে কোন দিন চিরকুমার সভা বসলে তিনিই হবেন তার সর্বজনসম্মত পার্মানেণ্ট প্রেসিডেণ্ট।

টি পার্টির পরে সাংবাদিক সম্মেলন। নয়াদিল্লীর সরকারী ও বে-সরকারী ইতিহাসে এইটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রেস কনফারেন্স। সাউথ ব্লকের কমিটি রূমে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এই কনফারেন্সে ক্রীপস তাঁর পরিকল্পনা সর্ব প্রথম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী বিভিন্ন সাংবাদিকদের শতাধিক প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গী, তাঁর ক্ষিপ্রতা. তাঁর অক্লান্ত উদ্যম উপস্থিত সমুদয় সাংবাদিকদের প্রশংসা অর্জন করল। তাঁর রসবোধও আছে। মাঝখানে একবার হঠাৎ বললেন, সবুর। তারপর গায়ের কোটটা খুলে রেখে আস্তিন গুটিয়ে বললেন, এবার আসুন! বিপুল হাস্যরোলে ধ্বনিত হয়ে উঠল কনফারেন্স।

সার স্ট্যাফোর্ড বিলাতের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবদের অন্যতম। আইনব্যবসায়ী মহলে তাঁর বার্ষিক উপার্জনের পরিমাণ বহু লোকেরই ঈর্ষাজড়িত বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। এই সাংবাদিক বৈঠকে যুক্তিতর্কে ব্যারিস্টর ক্রীপ্‌সের অসামান্য দক্ষতা নতুন করে প্রমাণিত হলো।

কিন্তু মানুষ মাত্রেরই ধৈর্যের সীমা আছে। সে-কথাটা অত্যন্ত অপরিহার্যভাবেই ক্রীপসও সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। জনৈক সাংবাদিকের এক অভদ্র প্রশ্নে অবশেষে কঠিন স্বরে বললেন,—ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ধৈর্য অসাধারণ, কিন্তু তারও শেষ আছে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কোন অভদ্র ইঙ্গিত আমি বরদাস্ত করতে রাজী নই।

ভারতীয় সাংবাদিকদের, বিশেষ করে রিপোর্টারদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, কৃতিত্বও কম নয়। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রবোধ নেই। তাঁরা যে রাজনীতিক নন একথাটা তাঁরা কদাচিৎ স্মরণে রাখেন। প্রেস না হলে পলিটিক্স চলে না, কিন্তু পলিটিক্স না হলেও প্রেস চলে। যথা,—হরিজন। এদেশের সাংবাদিকেরা শুধু প্রথম শ্রেণীর রিপোর্টার হয়েই খুশী থাকতে চান না, প্রথম শ্রেণীর পলিটিসিয়ানও হতে চান। তাই অনেক সময়েই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। তাঁদের অপরাধ নেই। স্পেশিয়েলাইজেশনে এদেশে বিশ্বাস নেই। এখানে যে-ডাক্তার জ্বরের চিকিৎসা করেন, তিনিই ফোঁড়াও কাটেন এবং দরকার হলে দাঁতও তোলেন।

ক্রীপস প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কিনা সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গেল। প্রস্তাবটির সমস্ত গুরুত্বই ভবিষ্যতে। জনশ্রুতি এই যে, গান্ধীজি ক্রীপসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন,—a post-dated cheque. অতি-উৎসাহী কোনো কোনো সাংবাদিক তার সঙ্গে নিজেদের ভাষ্য যোগ করলেন, on a crashing bank। মুখে মুখে এই প্রক্ষিপ্ত অংশটিও গান্ধীজির মূল উক্তি বলেই চলতে লাগলো। ইচ্ছাকৃত কিম্বা অনবধানতায় সত্যবিকৃতির এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে।

সেদিন সন্ধ্যায় দুই বন্ধু নিয়ে গেলেন একটি ক্লাবে।

নয়াদিল্লীর সবচেয়ে নামকরা ক্লাব আই. ডি. জি। ইম্পিরিয়েল দিল্লী জিমখানা। ক্লাব বর্ণাশ্রমে দ্বিজোত্তম। প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শুধু ব্যয়বাহুল্যের দ্বারা নয়, লিখিত অনুশাসনের দ্বারা। এ্যাডমিশন ফি ও মাসিক চাঁদা দুইই গুরুভার। তা'ছাড়া আই. সি. এস., আই. পি., অডিট একাউণ্টস ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর চাকরে ছাড়া সরকারী লোক আর কারও পক্ষেই আই. ডি. জি-র সদস্য হওয়ার উপায় নেই। বে-সরকারী ডাক্তার জার্নেলিস্ট, ব্যারিস্টরদের পক্ষে ঠিক এ-রকম বাধা না থাকলেও নতুন সদস্য গ্রহণের সময় ক্লাব কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন যাতে একমাত্র তাঁরাই মেম্বার হন আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক মর্যাদা যাঁদের শীর্ষস্থানীয়, ইংরেজীতে যাকে বলে এ-ওয়ান। ক্লাবের কৌলীন্য যাতে কলুষিত না হয় সেজন্য সজাগ দৃষ্টি আছে কর্তৃপক্ষের।

ক্লাবের টেনিস লন আছে, সুইমিং পুল আছে, ব্যাণ্ড আছে। মায় নিজস্ব ধোবা পর্যন্ত। নয়াদিল্লীতে এইটি একমাত্র ক্লাব যেখানে শুধু পান, ভোজন ও অবসর বিনোদনের নয়, স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থাও আছে। আই. ডি. জি. কেবলমাত্র খেলা বা আড্ডা দেওয়ার জায়গা নয়, সেটা পুরাপুরি ক্লাবই বটে।

দু'নম্বর ক্লাব,—চেমসফোর্ড। সেক্রেটারিয়টের কাছাকাছি রাইসিনা ও কুইন ভিক্টোরিয়া রোডের সঙ্গমস্থলে এই ক্লাবটি সব চেয়ে সরগরম। প্রথমতঃ এর দক্ষিণা তেমন সাঙ্ঘাতিক নয়, দ্বিতীয়তঃ এর অবস্থিতি অনেকটা সুবিধাজনক এবং তৃতীয়তঃ এখানে অভারতীয় অল্প। সদস্য গ্রহণেও অতটা কড়াকড়ি নেই। চেমসফোর্ডের সুইমিং পুলে ফি বছর এখানকার সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রিতে হয় নাচ। শীতের দিনে ঘরের ভিতরে, গ্রীষ্মকালে বাইরে। বাইরে অবশ্য কাঠের ফ্লোর নয়, শান বাঁধানো। বাগবাজারের রসগোল্লার মতো চেমসফোর্ড ক্লাবের পকৌড়া—অর্থাৎ ফুলুরিরও নাম আছে।

মহিলাদের এখানে পৃথক চাঁদা দিতে হয় না। স্বামীর গরবে গরবিনীরা স্বচ্ছন্দে এসে বসেন পুরুষ বন্ধুদের তাসের টেবিলে। সুদক্ষ পার্টনার পেলে কেবলই ডামি হন। না পেলে তিন রঙের তিনখানা অনার্স কার্ড সম্বল করে মিহি সুরে ডাকেন,—টু নো-ট্রাম্পস্। দেনার সুদের মতো হারের হার বাড়ে হু হু করে। খেলার শেষে খাতায় সই করে আসেন নিঃশঙ্কে। মাসের শেষে স্বামী বেচারা কম্পিত হৃদয়ে মুখ বুজে চেক লিখে দেন আর বোধ করি মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করেন।

জাতিধর্মনির্বিশেষে বেশীর ভাগ ভারতীয় অফিসারেরাই চেমসফোর্ডের সদস্য। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ,—কেউই বাদ নেই। কিন্তু উপস্থিতির দিক দিয়ে পাঞ্জাবীরাই প্রধান। বিশেষ করে শিখ। তাঁরা বিকালে এসে তিন সেট টেনিস খেলেন, সন্ধ্যায় পাঁচ রাবার ব্রিজ। তিন পেগ হুইস্কি ও চার কোর্সের ডিনার খেয়ে তাঁরা যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তার আগেই ইংরেজী ক্যালেণ্ডারে তারিখের পরিবর্তন ঘটে। তাঁদের গৃহিণীরাও পিছনে পড়ে থাকবার পাত্রী নন। ক্লাবে পাঞ্জাবী দম্পতিদের দেখলে সহধর্মিণী কথাটার মানে বুঝতে কষ্ট হয় না।

বন্ধুদের ক্লাবটি শহরের অপর প্রান্তে। এর চাঁদা সামান্য, সভ্য সংখ্যাও বেশী নয়। বাঙালী আছে, মাদ্রাজী আছে, আসামী আছে এবং আরও অন্যান্য প্রদেশের লোক। এটিও ছেলে এবং মেয়েদের সম্মিলিত ক্লাব। মেয়েদের মধ্যে অনেকে খ্রীস্টিয় সমাজের।

ক্লাবের খাতায় যাই হোক, ঘরে মেয়েদের সংখ্যাই যেন বেশী। প্রায় পনর আনাই কুমারী। গায়ের রং কালো, নখের রং লাল এবং গালের রং ছাই-ছাই। বলা বাহুল্য শেষের দু'টো ভগবান প্রদত্ত নয়। তার পেছনে বিলাতী প্রসাধন কোম্পানীর অনেকখানি হাত আছে। বিচিত্র বসন, বিচিত্রতর ভূষণ। একটি মহিলা

পরেছেন গোলাপী রংএর একটি সায়ার উপরে একখানা মশারীর নেট, তাতে সাটিনের পাড় বসানো। আর একজনার লেস্-বসানো ব্লাউজে সূতার ব্যবহারে এত কঠোর মিতব্যয়িতা যে তার দিকে চোখ তুলে তাকালে কান আপনিই লাল হয়ে ওঠে।

বয়স বেশীর ভাগই ত্রিশের উর্ধ্বে। দেহ কারো বা ইউক্লিডের সরলরেখা, কেউবা অঙ্কশাস্ত্রের ইলিপস্। আমাদের মেয়েদের ভূগোলে নাতিশীতোষ্ণের স্থান নেই,—হয় উত্তর মেরু, নয়তো দক্ষিণ। কেউ করেন মাস্টারী, কেউ নার্স, কেউবা স্টেনোগ্রাফার।

ক্লাবে ব্যাডমিণ্টন আছে, ক্যারম আছে, পিং পং আছে। কিন্তু খেলার চাইতে ঢং এবং কথার চাইতে ন্যাকামির পরিমাণ বেশী। একটি পঁয়ত্রিশ বছরের বিপুলা মহিলা কোনো এক সাহায্য অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়ের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী ও আচরণ দেখে বারংবার ইচ্ছা হচ্ছিল, আলাপ করে বলি, ভদ্রে, আপনার নিশ্চয়ই ধারণা যে আপনার ষোল বছর এখনও পার হয়নি। কিন্তু সেটা যে কুড়ি বছর আগেই কেটে গেছে সে কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার।

জানি, এদের উপরে রাগ করে লাভ নেই। ভগবান এদের রূপ দেননি, ভাগ্য দেয়নি বিত্ত। এদের পিতৃকুল আভিজাত্যের খ্যাতিতে গৌরবান্বিত নয়। বয়স ঊর্ধ্বগামী, যৌবন অপগতপ্রায়। এদিকে ঠিকুজী মিলিয়ে অভিভাবকদের পাত্র স্থির করার দিন কেটে গেছে। স্কুলে ছাত্রীকে জিরাণ্ডিয়েল ইনফিনিটিভ্ মুখস্থ করিয়ে দেহে ও মনে নেমেছে ক্লান্তি, রাত জেগে অনাত্মীয়, অপরিচিত রোগীকে থার্মোমিটার আর আইসব্যাগ দেওয়ার কাজে ধরেছে বিরক্তি, আপিসে "উইথ রেফারেন্স টু ইওর লেটার নাম্বার" টাইপ করে করে জীবনে এসেছে বিতৃষ্ণা। প্রিয় ও পরিজন নিয়ে নীড় রচনার চিরন্তন মোহ আছে নারীর রক্তে। একখানি ছোট গৃহ, একজন প্রেমাসক্ত স্বামী ও একটি, দু'টি সুস্থ সবল শিশু—এই

কল্পনা সে যুগযুগান্ত ধরে পেয়ে আসছে মায়ের কাছ থেকে, মাতামহীর কাছ থেকে, জগতের আদি মানবী আদমপত্নী ইভের কাছ থেকে। সে-কল্পনা সত্য হতে পারল না, সে-কামনা সার্থক হলো না। অতৃপ্ত বাসনার সহস্র নাগিনী জাগায়ে জর্জর বক্ষে সে বৃথাই প্রতীক্ষা করেছে এই দীর্ঘকাল। তার দেহে একদিন রূপ না থাকলেও স্বাস্থ্য ছিল। কিন্তু আজ তার শ্রী গিয়েছে ঘুচে, নারীর স্বাভাবিক কমনীয়তা হয়েছে দূর এবং নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ যে লজ্জা তা' হয়েছে লুপ্ত। অবশেষে বঞ্চিত হৃদয়ের অপরিসীম বেদনাকে ঢাকতে সে প্রাণপণে প্রয়াস করছে নানাভাবে। কেউ করছে মহিলা সমিতি, কেউ করছে রেডিওতে বক্তৃতা, আর কেউ বা রুজ, পাউডার ও লিপস্টিক মেখে পুরুষের সঙ্গে করছে নির্জলা ফ্লার্ট।

ক্লাবের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে কলেজের ছাত্র আছে, সেক্রেটারিয়টের কর্মচারী আছে, বীমার দালাল আছে, ডাক্তার আছে। প্রায় সবাই তরুণ। বিবাহিত সদস্যেরা বেশীর ভাগ খ্রীস্টান এবং কুমার সভ্যেরা বেশীর ভাগ হিন্দু। কারণ সুস্পষ্ট।

পশ্চিমের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারা আমাদের দেশে এনেছে নূতন আবেষ্টন। তার ফলে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের কর্মে এবং চিন্তায়। আমাদের আহার, বিহার, বসন, ভূষণ বদল হয়েছে। বদল হয়েছে রীতি, নীতি ও ধ্যান-ধারণা। এতকাল নারীকে আমরা শুধু মাত্র পুরুষের আত্মীয় রূপেই দেখেছি। সে আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা, মাসি, পিসি, দিদি, বৌদি কিম্বা শ্যালিকা। কিন্তু জননী, জায়া এবং অনুজা ছাড়াও নারীর যে আরও একটি অভিনব পরিচয় আছে, সে সম্পর্কে আমরা বর্তমানে সচেতন হয়েছি। তার নাম সখী।

প্রাণী জগতের মতো মনোজগতেরও বিবর্তন আছে। তার ফলে বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা নীতির মূল্য সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। নারীর মূল্যেরও যুগে যুগে তারতম্য ঘটেছে।

একদা সমাজে মায়ের স্থান ছিল সর্বপ্রধান। সেদিন পরিবার পরিচালনা থেকে বংশ-পরিচয় এবং উত্তরাধিকার নির্ণীত হতো মাতার নির্দেশ, সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক দিয়ে। ক্রমে এই ম্যাট্রিয়ার্কল ফেমিলী বিলুপ্ত হলো। রাজমাতার চাইতে রাজরাণীর মর্যাদা হলো অধিক। সাধারণ পরিবারেরও পরিধি পরিমিত হলো। সংসারের কর্ত্রী হলেন জননী নয়, গৃহিণী। ছেলেরা মায়ের কোল ছেড়ে বউএর আঁচলে আত্মসমর্পণ করল।

বলা বাহুল্য, এই হস্তান্তরের ফলে মায়েরা খুশী হলেন না। কেউ কেউ অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ফল হলো না। হার হলো তাঁদেরই। শুধু বউকাঁটকী শাশুড়ী আখ্যা পেয়ে নাটক, নভেলে তাঁরা নিন্দিত হলেন। যাঁরা বুদ্ধিমতী, তাঁরা কালের লিখন পাঠ করলেন দেয়ালে, মেনে নিলেন অবধারিত বিধি। নিঃশব্দে,—কিন্তু স্বচ্ছন্দ চিত্তে নয়। জগতের সমস্ত বিক্ষুব্ধ মাতৃকুলের অনুক্ত অভিযোগ আজও জেগে রইল বধূশাসিত আধুনিক গৃহের বিরুদ্ধে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় সমাজে পত্নীকর্তৃত্ব পুরাপুরি স্বীকৃত। বিবাহের পরে ছেলের সংসারে তার মায়ের স্থান নেই, কিম্বা থাকলেও সে স্থান উল্লেখযোগ্য নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের লুপ্ত অকার চিহ্নের মতো তাঁর অস্তিত্ব আছে, গুরুত্ব নেই।

কিন্তু স্ত্রী বলতে যেদিন ভাবী সন্তানের গর্ভধারিণী বা গৃহকর্ত্রী মাত্র বুঝতেম, সেদিনও বিগত। স্ত্রীর মধ্যে চাই সচিব সখীমিথ প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। কিন্তু একজনের কাছে এতখানি প্রত্যাশা করা শুধু কালিদাসের কাব্যেই শোভা পায়, বাস্তবক্ষেত্রে নয়।

এযুগের পুরুষের কাছে ঘরের চাইতে বাইরের ডাক বেশী। সে দশটা-পাঁচটায় আপিসে যায়, কারখানায় খাটে, শেয়ার মার্কেটে ঘোরে। সেখান থেকে টেনিস, রেস, কিংবা মিটিং। রাত্রিতে ক্লাব, অথবা সিনেমা। এর মধ্যে গৃহের স্থান নেই, গৃহিণীরও আবশ্যকতা নেই। আগে সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করতে হতো। যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-পার্বণে

প্রয়োজন ছিল ভার্যার। কিন্তু ধর্ম এখন শুধু ইলেকশনে ভোট সংগ্রহ ছাড়া ভারতবর্ষেও বড় একটা কাজে লাগে না। তাই এযুগে সহধর্মিণীর চাইতে সহকর্মিণীকে নিয়ে বেশী রোমান্স লেখা হয়।

পুরুষের জীবনে আজ গৃহ ও গৃহিণীর প্রয়োজন সামান্যই। তার খাওয়ার জন্য আছে রেস্তোরাঁ, শোয়ার জন্য হোটেল, রোগে পরিচর্যার জন্য হাসপাতাল ও নার্স। সন্তান সন্ততিদের লালনপালন ও শিক্ষার জন্য স্ত্রীর যে অপরিহার্যতা ছিল, বোর্ডিং-স্কুল ও চিলড্রেন্‌স্ হোমের উদ্ভব হয়ে তারও সমাধা হয়েছে। তাই স্ত্রীর প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে ঠেকেছে এসে সাহচর্যে। সে পত্নীর চাইতে বেশীটা বান্ধবী। সে কর্ত্রীও নয়, ধাত্রীও নয়,—সে সহচরী।

নারীর পক্ষেও স্বামীর সম্পর্ক এখন পূর্বের ন্যায় ব্যাপক নয়। একদিন স্বামীর প্রয়োজন মুখ্যতঃ ছিল ভরণ, পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু এযুগের স্ত্রীরা একান্তভাবে স্বামী-উপজীবিনী নয়। তারাও দরকার হলে আফিসে খেটে টাকা আনতে পারে। তাই স্বামীর গুরুত্ব এখন প্রধানতঃ ভর্তারূপে নয়, বন্ধুরূপে।

ভারতবর্ষও এই নব ভাবধারার বন্যাকে এড়িয়ে থাকতে পারেনি। ঢেউ এসে লেগেছে তার সমাজের উপকূলে। আমাদেরও পরিবার ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকায় হচ্ছে, আত্মীয় পরিজনের সম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ হচ্ছে। গ্রাম্য সভ্যতার ভিত্ বিধ্বস্ত, কলকারখানাকে কেন্দ্র করে নগর-নগরীর বিস্তৃতি ঘটছে ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে নূতন সভ্যতা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন জীবন-ধর্মের উদ্ভব অপরিহার্য।

এদেশেও পুরুষের জীবনে এবার আবির্ভূত হয়েছে সখী; নারীর জীবনে সখা। সেটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক করতে পার, মনু পরাশর উদ্ধৃত করে মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখতে পার। কিন্তু তাকে ঠেকাতে পারবে না।

স্ত্রী-পুরুষের জীবনে সখাসখীর যে উপলব্ধি, তার প্রয়োজনীয়তা

সম্পর্কে আমাদের সমাজকর্তারা একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু পতিকে পরম গুরু এবং পত্নীকে সেবিকা বানিয়ে দাম্পত্যে তাঁরা সখীত্বের অবকাশ রাখতে পারেন নি। ট্রান্সফারড্ এপিথেটের মতো সেটা পুরুষের পক্ষে বউদি এবং স্ত্রীর পক্ষে দেবরের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। সংসারে এর চাইতে মধুরতর সম্পর্ক আমার জানা নেই।

সীতার সাথী ছিল লক্ষ্মণ ; তাঁর অপর আর কোন বন্ধুর প্রয়োজন ছিল না। বুড়া হলেও ঋষি বাল্মিকী সে-কথা জানতেন। পাঞ্চালীর পাঁচ পাঁচটা স্বামী থাকতেও একটি দেবরের অভাব ঘোচেনি। তাই বেদব্যাসকে আনতে হলো,—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দ্রৌপদীর সখা,—সংকটে শরণ্য এবং সম্পদে স্মরণীয়।

এযুগে জীবনযাত্রার উপচার বহুবিধ এবং ব্যয়সাধ্য। যে-লোক ছ'শ টাকা পায় তার পক্ষে বউকে কাছে রাখাই কঠিন, বউদি দূরে থাকুক। মেয়েরাও জানেন, পণের টাকা ও সোনার হার না হলে বরই জুটবে না অনেকের, দেবর তো পরের কথা। তাই আধুনিকারা ঘা খেয়ে মন দিয়ে মেনেছেন যে, বেশী আশা করে ফল নেই, একটি নির্ভরযোগ্য সহৃদয় বন্ধু পেলেই ভাগ্য। আধুনিকেরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন যে, অনেক লোভে লাভ নেই, তার চেয়ে বরং চাই শুধু একটি বান্ধবী। প্রিয়বান্ধবী।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু পরিবারে অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বের পথ উন্মুক্ত নয়। সাধারণ মুসলমান পরিবারেও নয়। সেখানে বান্ধবীর স্বীকৃতি মাত্র নেই। সেখানে পুরুষের জীবনে প্রথম যে-অনাত্মীয়া নারীর সান্নিধ্য ঘটে, তিনি নিজের স্ত্রী। তাই ক্লাবে, পার্টিতে বিলাতফেরত ও বড় চাকুরেদের ড্রয়িং রুমে তরুণের দল আসে। কাউকে ডাকে ললিতাদি, কাউকে বলে বীণাবউদি, কাউকে বা শুধু পদবীর আগে 'মিস' বা 'মিসেস' জুড়ে দিয়ে সম্বোধন করে—মিস্ গুপ্ত, মিস্ আয়েঙ্গার বা মিসেস সোনেরা জাহীর।

নয়

তিরিশে মার্চ সন্ধ্যায় ফিরোজশাহ্-কোটলায় মুনলাইট-পিক্‌নিকের যিনি আয়োজন করেছিলেন, আইডিয়্যাল হোস্টেস বলে নয়াদিল্লীর সোসাইটিতে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। মহিলা সুদর্শনা, পরিহাসপটু এবং প্রিয়ভাষিণী। বন্ধুসমাগমে আনন্দ লাভ ও আনন্দ দান করার দুর্লভ ক্ষমতা আছে তাঁর।

ফিরোজশাহ্-কোটলা দিল্লীর পঞ্চম মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ। ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের সময়ে দিল্লী নগরী ছিল বর্তমান কুতুবের নিকটস্থ মেহরৌলীতে। পুরাতত্ত্ব-বিভাগ কিছু কাল পূর্বে এই রাজধানীর নগর প্রাচীর মৃত্তিকাগর্ভ থেকে আংশিক উদ্ধার করেছেন। জনপ্রবাদ এই যে, নিজ প্রিয়তমা কন্যার যমুনা দর্শনাভিলাষ পূরণার্থে পৃথ্বীরাজই তৈরী করেছিলেন কুতুব মিনার। প্রত্যহ অপরাহ্ণ বেলায় প্রসাধন সমাপনান্তে রাজনন্দিনী আরোহণ করতেন তার শীর্ষে, অবলোকন করতেন দূরবর্তী যমুনার জলধারা। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এ-কাহিনী বিশ্বাস করেন না। তাঁদের অভিমত, পাঠান সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেক নির্মাণ সুরু এবং আলতামাস শেষ করেন জগতের সর্বোচ্চ বিজয়স্তম্ভ এই মিনার।

দ্বিতীয় দিল্লী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী। তাঁর রাজত্বকালে দুর্ধর্ষ মুঘল দস্যুদল ভারতবর্ষ আক্রমণ করল, হত্যা ও লুণ্ঠনের দ্বারা বহু নগরনগরী বিধ্বস্ত করে উপনীত হলো দিল্লীতে। দিল্লীর সমতল ভূমিতে তাদের প্রতিরোধ করা সহজ ছিল না। সম্রাট পশ্চাদপসরণ করলেন কুতুবে। মুঘলেরা দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করে আমীর ওমরাহদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করল এবং সাধারণ কৃষকের শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত করল। অবশেষে দিল্লীর

অসহনীয় গ্রীষ্মের প্রখরতায় ক্লান্ত ও রোগাক্রান্ত হয়ে দস্যুদল দিল্লী পরিত্যাগ করল। আলাউদ্দিন এই দস্যুদলের পুনরাক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নির্মাণ করলেন সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত নব নগরী, নাম দিলেন সিরি। এই নগরীতে সুলতান নির্মাণ করেছিলেন নিজের জন্য এক মহার্ঘ প্রাসাদ, তার স্তম্ভ সংখ্যা ছিল এক সহস্র। আজ সে-প্রাসাদের চিহ্ন মাত্র নেই।

আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন অসমসাহসিক যোদ্ধা। রাজ্যজয়ের নেশা ছিল তাঁর রক্তে। তিনি রাজপুতদের পরাজিত করে চিতোর অধিকার করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুস্লিম অধিকারও প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি। সেই বিজয় গৌরবকে চিরস্মরণীয় করতে নির্মাণ সুরু করলেন দ্বিতীয় কুতুব। প্রথম কুতুবের পাশেই। প্রথম কুতুবের চাইতে এর আকার হবে দ্বিগুণ—এই অভিলাষ ছিল সুলতানের মনে। কিন্তু আরব্ধ কাজ শেষ করার মতো আয়ুর মিয়াদ ছিল না তাঁর। অর্ধসমাপ্ত এই নব পরিকল্পিত কুতুবের চিহ্ন আজও দর্শকজনের কৌতূহল উদ্রেক করে। বর্তমানে সিরির স্মারক আছে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় এবং কিছুটা বিরাট নগর-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে।

ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান ফিরোজশাহ্ তোগলক। রাজার নামে রাজধানীর পরিচয় মুস্লিম রাজত্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব নয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতের মুস্লিম নৃপতিদের মধ্যে ফিরোজশাহ্ তোগলক ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ ৩৭ বৎসর তিনি প্রবল প্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালনা করেছেন। দিল্লীর মুস্লিম বাদশাহদের মধ্যে একমাত্র আওরঙ্গজেব ব্যতীত আর সবার চাইতেই তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। মহম্মদ তোগলকের মৃত্যুর পরে তিনি যখন সিংহাসন আরোহণ করেন তখনই তাঁর বয়স ষাটের ঊর্ধ্বে।

ইতিহাসে মহম্মদ বিন্ তোগলকের নাম অব্যবস্থিতচিত্ত ও অপরিণামদর্শী নৃপতির উদাহরণ রূপে কুখ্যাত। কিন্তু একথা অস্বীকার

করার উপায় নেই যে, তাঁর চরিত্রে বহু রাজোচিত সদ্‌গুণেরও সমাবেশ ঘটেছিল। মহম্মদ বহু ভাষাবিদ, কবি, গণিতজ্ঞ এবং সুদক্ষ লিপিকার ছিলেন। সাহসী যোদ্ধা এবং সহৃদয় দাতা বলেও তাঁর সুনাম আছে। আবার নিষ্ঠুরতার জন্য নিন্দারও অভাব নেই। প্রসিদ্ধ আরবী পর্যটক ইবন্ বতুতার আত্মচরিতে সম্রাট মহম্মদের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথার্থ বর্ণনা আছে।

"দান করা এবং হত্যা করা এই দুই ব্যাপারেই রাজা মহম্মদ তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। যে-পথ দিয়ে তিনি যান সে-পথে কোনো না কোনো অতি দরিদ্রকে তিনি ধনী বানিয়ে যান, কোনো না কোনো জীবিত ব্যক্তিকে তিনি পরলোকে পাঠিয়ে দেন। একাধারে দান মহানুভবতা ও নিষ্ঠুরতার শত শত গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরছে।"

ইবন্ বতুতা নিজে মহম্মদের অধীনে কয়েক বছর দিল্লীর কাজী অর্থাৎ প্রধান বিচারক ছিলেন।

মহম্মদের নানা উদ্ভাবনী বুদ্ধি ছিল, কিন্তু সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বহু বিষয়ে পরীক্ষা করার তাঁর ঝোঁক ছিল। বেশীর ভাগ পরীক্ষারই মারাত্মক পরিণতি ঘটেছে। উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে একাধিকবার রাজধানী স্থানান্তরিত করা, দিল্লী এবং দৌলতাবাদের মধ্যে রাজধানীর সমুদয় অধিবাসীর গমন ও প্রত্যাগমন, রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাম্র মুদ্রার প্রচলন, চীন জয়ের প্রয়াস ইত্যাদি মহম্মদের সর্বনাশা উদ্যোগের একাধিক কাহিনী স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে বাল্যকালে আমরা পড়েছি।

জীবনের শেষভাগে মহম্মদ আপন সেনাবাহিনী নিয়ে বর্তমান করাচীর নিকটবর্তী থাট্টায় এক দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। একদিন প্রভাতে সেখানে এক ধীবর সিন্ধুনদে হঠাৎ এক অদ্ভুত মৎস্য শিকার করেছিল। সে-মৎস্য রাজসমীপে উপস্থিত করা হলো। সম্পূর্ণ অপরিচিত আকৃতির এই মৎস্য মানুষের রসনার পক্ষে সুস্বাদু কিনা

সে পরীক্ষার বাসনা জাগল মহম্মদের মনে। পাত্রমিত্রের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে সে-মৎস্য সম্রাট আহার করলেন। ইহলোকে সেই তাঁর শেষ পরীক্ষা। সে-দিনই জীবনান্ত ঘটল তাঁর।

মহম্মদের প্রতিভা ছিল, শক্তি ছিল। সে-সময়ে আলাউদ্দিন খিলজীর রাজধানী সিরি ও প্রাচীন মেহরৌলীর মাঝখানে দিল্লীর বিত্তশালী ব্যক্তিদের বহু প্রাসাদ ও প্রমোদোদ্যান গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু যথোচিত রক্ষাব্যবস্থার অভাবে মুঘল দস্যুদের আক্রমণ-সম্ভাবনা থেকে সেগুলি মুক্ত ছিল না। মহম্মদ তাঁর নিজ প্রাসাদ রচনা করলেন সেখানে। দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিলেন সিরি থেকে মেহরৌলী। নব নগরীর নামকরণ করলেন 'জাহানপন্না'—বাঙলা ভাষায় যার মানে হলো জগতের আশ্রয়। প্রাসাদের সংলগ্ন ভূমিতে বৃহৎ এক হ্রদ খনন করেছিলেন পানীয় জলের সংস্থানে। কুতুবের অদূরবর্তী বর্তমান খিরকী গ্রামে আজও চোখে পড়ে এই প্রাচীরের অবশিষ্টাংশ। তার গায়ে হ্রদে জল প্রবেশ-ব্যবস্থার চিহ্ন আছে পরিস্ফুট।

বর্তমান কুতুব রোডের নিকটে সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে মহম্মদের স্নানাগার, তাঁর জেনানা ও তাঁর বিখ্যাত মঞ্চ, যেখানে বসে প্রত্যহ তিনি তাঁর সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতেন। আলাউদ্দিনের সহস্রস্তম্ভ কক্ষের অনুরূপ মহম্মদও একটি বিরাট কক্ষ নির্মাণ করেছিলেন, যার কিছু কিছু চিহ্ন আজও কৌতূহলী দর্শকদের বিস্মিত করে।

মহম্মদের মৃত্যুর পরে ফিরোজশাহ্ তোগলক সম্রাট হলেন। মহম্মদের তিনি আত্মীয় এবং সেনানায়ক ছিলেন। সিন্ধু থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি ফিরে এলেন দিল্লীতে। রাজ্যের গঠনকার্যে মনোনিবেশ করলেন অবিলম্বে। অনেকেই বোধ হয় জানে না যে, ফিরোজশাহই ভারতের সর্বপ্রথম নরপতি, যাঁর ধমনীতে হিন্দু ও

মুসলমানের রক্ত এক হয়ে মিশেছিল। তাঁর জননী ছিলেন রাজপুতানী।

দুই বিভিন্ন ধর্মের সম্মিলিত প্রভাব তাঁর চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ বলে তিনি খ্যাত ছিলেন এবং প্রজাদের কল্যাণ সাধনে তাঁর আন্তরিক স্পৃহা ছিল। মুস্লিম যুগের প্রথম কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন ফিরোজশাহ্। অধুনা ওয়েস্টার্ন যমুনা ক্যানেল নামে খ্যাত খালটি তিনিই খনন করেন। কর্নওয়ালের নিকটস্থ যমুনার মূল ধারা থেকে উৎসারিত হয়ে এর এক শাখা এসেছে দিল্লীতে, অপর শাখা গেছে হিসারে। ফিরোজ শাহের আমলে এই খালের পরিধি বিস্তৃততর ছিল। সম্রাট সাজাহানের আদেশে তৎকালীন পূর্ত বিভাগের অধ্যক্ষ আলী মর্দান খাঁ এই খালের সংস্কার সাধন করেন। এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সম্রাট সাজাহানের রক্তেও হিন্দু প্রভাব ছিল। তাঁর জননী যোধপুরী বেগমও রাজপুতানী ছিলেন। আহম্মদ শাহ্ আব্দালী কর্তৃক দিল্লী অবরোধ কালে এই খালটি দ্বিতীয়বার বিনষ্ট হয় এবং পরবর্তী যুগে ইংরেজ শাসকগণের চেষ্টায় তার পুনঃ সংস্কার ঘটে।

সৌধ নির্মাণে ফিরোজশাহের গভীর অনুরাগ ছিল। এদিক দিয়েও সম্রাট সাজাহানের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল ছিল। কুতুব মিনারের ঊর্ধ্বতন যে-দুটি তলা শ্বেত পাথরে গড়া, তা ফিরোজ শাহেরই কীর্তি। ভূমিকম্পে কুতুবের যে ক্ষতি ঘটেছিল তারও সংস্কার তিনিই করেছিলেন। দিল্লীর হিন্দুরাও হাসপাতালের সংলগ্ন 'রীজে' এখনও তাঁর নির্মিত মৃগয়াগৃহের ভগ্নাবশেষ বর্তমান।

সিরি, বিজয়মণ্ডল ও কুতুবে তিন তিনটি নগরী থাকা সত্ত্বেও ফিরোজ শাহ্ যমুনার ধারে আর একটি নতুন নগরের পত্তন করলেন। একেবারে যমুনার ঠিক গায়ে নির্মাণ করলেন রাজপুরী ফিরোজশাহ্-কোটলা। আজ তোরণপথে ঢুকলেই বাঁ দিকে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত অঙ্গন। একদা সেখানে ছিল ফিরোজ-

শাহের দরবার গৃহ। আজ আমাদের পিক্‌নিক্ পার্টির আসর বসল সেখানে।

দলটি ক্ষুদ্র নয়। ছেলে মেয়ে মিলে প্রায় জন বারো। কিন্তু অধিনায়িকা আহার্য যা এনেছেন, তা দিয়ে অনায়াসে তার ডবল লোকের উদর পূর্তি করা যেতে পারে। পিক্‌নিকে সব চেয়ে যিনি মনোযোগের যোগ্য, তিনি মিঃ খোশ্‌লা। বহুল পরিচিত ব্যক্তি। বিশেষ করে মহিলা মহলে। মেয়েরা এগজিবিশন করেছেন, তার দরজায় ভলান্টিয়ারী করেছেন কে? মিঃ খোশ্‌লা। মহিলা সমিতি দামোদর বন্যার সাহায্য ভাণ্ডারে টাকা তুলেছেন। মেয়েদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা আদায় করেছেন কে? মিঃ খোশ্‌লা। চাঁদনী চক্ থেকে মিসেস মুখার্জীর উল কিনে আনছেন, মিসেস স্বামীনাথনের জন্য পাঁচ দোকান ঘুরে পণ্ডস্ ক্রীম জোগাড় করছেন। সমস্তই মিঃ খোশ্‌লা। নয়াদিল্লীতে মেয়েরা আছেন অথচ মিঃ খোশ্‌লা নেই, এমন কোন সভা, সমিতি, পার্টি, পিক্‌নিক্ কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

সাধারণ পাঞ্জাবীর তুলনায় বেঁটে, দোহারা চেহারা। মাথায় চুল ব্যাক্‌ব্রাশ করা। নির্বাক যুগের চিত্রাভিনেতা ডগলাস ফেয়ার-ব্যাঙ্ক্‌স-এর অনুকরণে দীর্ঘ জুল্‌পি গালের মধ্যপথ পর্যন্ত প্রসারিত। হিটলারের মতো গোঁফের কায়দা। পরিধানে ব্রাউন রং-এর কর্ডরয়ের প্যাণ্ট, পায়ের গোড়ালির কাছটা সরু। প্যাণ্টের পিছনে হিপ্-পকেট। তাতে মনোগ্রাম-করা লম্বা রূপার সিগারেট কেস যার গর্ভে প্রায় পঞ্চাশটা সিগারেট রাখা চলে। গায়ে গ্যাবার্ডিনের কোট। প্রায় আজানুলম্বিত, নীচের পকেট দু'টি ঈদের চাঁদের আকৃতিতে কাটা। সিল্কের সার্ট। টক্‌টকে লাল রং-এর টাই, তাতে নীল রং-এর লতাপাতার ছাপ। মাথায় একটি সবুজ ফেল্টের টুপি, নীচের দিকে নামিয়ে পরেন। পায়ে কখনও কম্বিনেশন সু, কখনও বা বাকল্‌স্ আঁটা সড়ের জুতো। দিনের বেলায় চোখে এক জোড়া

শাদা মোটা শেলের ফ্রেমযুক্ত সান্ গ্লাস। রোদ থাক আর নাই থাক। মেয়েদের হাতে রিস্টওয়াচের মতো মিঃ খোশ্লার গগলস্ও প্রয়োজনের জন্য নয়, শোভার জন্য।

মিঃ খোশ্লার প্রকৃত পেশা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে তিনি কন্ট্রাক্টর, কেউ বলে তিনি দু' তিনটে বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট, আর কেউবা এমন কিছু বলে যাব ইংরেজী তর্জমা করলে কথাটা দাঁড়ায়,—স্রেফ্ লোফার। তিনি নিজে কার্ডে নামের পিছনে লেখেন একটি শব্দ যা দিয়ে নলিনীরঞ্জন সরকার থেকে সুরু করে বাবুগঞ্জের হাটে কাটা-কাপড়ের ব্যবসাদার পতিতপাবন সাহাকে পর্যন্ত বুঝানো যায়। মার্চেণ্ট। কিন্তু কাজ তাঁর যাই হোক, ব্যস্ততার অভাব নেই। এই দারুণ পেট্রোল রেশনিং-এর দিনেও সারাদিনই দেখা যায় তিনি তাঁর বেবী অস্টিন নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটছেন সহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। পথে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে এক মিনিট কথা বলেই বলেন, "আচ্ছা ভাই, এখন বড্ড ব্যস্ত। আবার দেখা হবে, শ্যাল সি ইউ এগেন!"

পিক্নিকে খোশ্লা বিপুল উদ্যমে মেয়েদের আহার্য পরিবেষণ করলেন। স্যাণ্ডুইচের প্লেট নিয়ে ছুটতে গিয়ে প্রায় আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেলেন, সন্দেশের থালা নিয়ে হন্তদন্ত হলেন, কোন মহিলাকে "প্লিজ", কোন মহিলাকে বা "ফর মাই সেক্," বলে ছুটো বেশী পেস্ট্রি খাওয়ালেন। একটি তরুণী অন্য কার কাছে এক গ্লাস জল চাইছিলেন। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মিঃ খোশ্লা। তাঁর কানে যেতেই "জল, জল, মিস্ উপাধ্যায়ের জন্য জল" বলে এমন উতলা হয়ে জলের অন্বেষণে ছুটতে লাগলেন যে, মনে হলো, হাতের কাছে অন্য কোথাও না পেলে তিনি বুঝিবা তৎক্ষণাৎ ভগীরথের ন্যায় গঙ্গা আনয়নের জন্য কৈলাসে ছুটবেন!

শ্রীমতী সুব্বা রাও প্রস্তাব করলেন চারিদিক ঘুরে-দেখবার।

দেখার মধ্যে যা আছে তা ফিরোজশাহ্ নির্মিত একটি মসজিদ। সুলতান পাত্রমিত্র নিয়ে জুম্মার দিনে এখানে প্রার্থনা করতে আসতেন। অনুমান করা অন্যায় নয় যে, সে দিন এই মসজিদের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। যদিও আজ ভগ্নদশা দেখে তার বিগত সৌষ্ঠব বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু তার গঠন-পারিপাট্য লক্ষ্য করার মতো। ইংরেজীতে যাকে বলে প্রোপোরশন,—ফিরোজশাহ্-কোটলার মসজিদ ও অন্যান্য প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষে তা বিশেষ-ভাবে বর্তমান।

ফিরোজশাহের আমলে সর্ব প্রথম ভারতীয় স্থাপত্যে হিন্দু ও মুস্লিম পদ্ধতির সিন্থেসিস ঘটেছিল। প্রাগ্‌মুস্লিম যুগের উত্তর ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। অতি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরে এখনও তার চিহ্ন আছে। বর্তমানে জৈন পদ্ধতি নামে অভিহিত এই স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয় রাজপুতনার মাউন্ট আবু পর্বতোপরি বিখ্যাত মহাবীর মন্দিরটি।

সেদিনের হিন্দু স্থাপত্যে আর্চ—অর্ধবৃত্তাকার গঠন—ছিল না। তার বৈশিষ্ট্য ছিল চতুষ্কোণ স্তম্ভে। এই স্তম্ভগুলি কারুকার্যখচিত। কোনটাতে দেবদেবীর মূর্তি, কোনটাতে পুষ্পসজ্জা, কোনটাতে বা ঘন্টা কিম্বা গাছ। প্রস্তরে গঠিত এই স্তম্ভগুলির অলঙ্করণের মধ্যে মিলতো সে-দিনকার স্থপতিদের মণ্ডন-চাতুর্যের পরিচয়। সেকালের স্থাপত্যে গম্বুজেরও অস্তিত্ব ছিল না। চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপরে সমান্তরাল প্রস্তরখণ্ড একটির পর একটি সাজিয়ে দু'দিক থেকে ক্রমশঃ মিলিয়ে আনা হতো মাঝখানে। দ্বার, গবাক্ষ ও প্রবেশপথের উপরাংশে আর্চের পরিবর্তে এই গঠন অনেকটা থাক-কাটা সিঁড়ির মতো দেখায়। আর্চের ভারবহন ক্ষমতা অধিক এবং তার ব্যবহার য়ুরোপ ও মধ্য-এশিয়ায় প্রচলিত ছিল।

এই স্থাপত্যের প্রথম পরিবর্তন ঘটল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। দাস বংশের কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লীতে এসে প্রথম তৈরী

করতে চাইলেন একটি মসজিদ যেখানে বসে তিনি আল্লার কাছে পাঠাতে পারবেন প্রচুরতর অর্থ, প্রবলতর প্রতাপ এবং প্রভূততম শান্তি কামনা করে প্রাত্যহিক আবেদন। বলা বাহুল্য, তাঁর নিজ জন্মস্থান আফগানিস্থানে যে-ধরণের মসজিদের সঙ্গে তিনি আশৈশব পরিচিত তারই অনুরূপ ভজনালয় নির্মাণ করা ছিল তাঁর বাসনা। সে-মসজিদ পয়েণ্টেড আর্চের, অনেকটা গণিতশাস্ত্রের দ্বিতীয় বন্ধনীচিহ্নের মতো খিলানের উপর তৈরী।

রোমানরা ব্যবহার করতো বৃত্তাকার আর্চ। আরবীয়েরা পছন্দ করতো পয়েণ্টেড আর্চ। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পয়েণ্টেড আর্চ সম্বলিত স্থাপত্যের প্রথম নিদর্শন হলো ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত ইরাকের অন্তর্গত সামাররার মসজিদটি। হিন্দু স্থপতিদের জানা ছিল না তার নির্মাণ কৌশল। কাবুল কান্দাহার থেকে মুস্লিম কারিগর আনাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং দিল্লীর প্রথম মসজিদে স্থাপত্যের যে-নিদর্শন রইল সেটা হিন্দু ও মুস্লিম স্থাপত্যের সম্মেলন নয়, গোজামিলন। কুতুব মিনারের সংলগ্ন মসজিদে আজও তার প্রমাণ আছে। সে মসজিদের বারান্দায় ও দ্বারপথে অর্ধবৃত্তাকার গঠন সত্যিকার খিলানের উপর নয়। তাতে 'কী-স্টোন' নেই।

মুস্লিম স্থাপত্যে দেবদেবীর মূর্তি বা পুষ্প ও বৃক্ষলতা উৎকীর্ণ করার রীতি ছিল না। কোরাণের বচন উদ্ধৃত হতো মসজিদের প্রাচীর গাত্রে ও আর্চের উপরে। আরবী লিপি ও কোরাণের রচনা সম্পর্কে কুতুবুদ্দিনের মসজিদ নির্মাণরত ভারতীয় রাজমিস্ত্রীদের জ্ঞান ছিল সামান্যই। তাই কৃত্রিম আর্চের উপরে তারা বৃক্ষ অঙ্কন করে তার আশে পাশে আরবী বচন উৎকীর্ণ করার প্রয়াস করেছে কোনো মতে। হিন্দু স্থাপত্যের চিহ্ন মসজিদের সংলগ্ন মণ্ডপে আরও অধিকতর প্রকট। তার স্তম্ভগুলি নিঃসন্দেহে কোন হিন্দু মন্দির থেকে আহৃত। সেকালের মুস্লিম নরপতিরা লুণ্ঠনকে লজ্জার বিষয় মনে করতেন না। বরং অপহৃত দ্রব্যের প্রকাশ্য ব্যবহারের দ্বারা

তাঁরা বিজয়স্তম্ভ রচনা ক'রে আপন অপকীর্তির সাক্ষ্য রাখতেন পরবর্তীকালের জন্য।

সুল্‌তান আলতামাস কুতুবুদ্দিন রচিত মসজিদের বিস্তার সাধনে উদ্যোগী হয়ে গজনী থেকে আনলেন মুস্লিম স্থপতি ও কারিগর। তারা জ্যামিতিক পদ্ধতির মুস্লিম অলঙ্করণ প্রচলন করল ভারতবর্ষে। খিলজী যুগে অধিক সংখ্যক মুস্লিম রাজমিস্ত্রী এল আফগান থেকে। তারা প্রবর্তন করল চতুষ্কোণ স্তম্ভের পরিবর্তে কী-ষ্টোন যুক্ত সত্যিকার আর্চ, সমতল ছাদের বদলে গম্বুজ, চলতি ভাষায় যাকে বলে শিকারা, এবং ঘণ্টা, পুষ্প, বৃক্ষ ইত্যাদির বদলে জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সজ্জা। ভারতে পুরাপুরি মুস্লিম স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা হলো। কুতুবের সংলগ্ন আলাই দরওয়াজা ও নিজামুদ্দিনে জামাতখানা মসজিদ সেকালের হিন্দু প্রভাববর্জিত একান্তভাবে মুস্লিম স্থাপত্যের নিদর্শন।

তোগলক রাজত্বে, বিশেষ করে ফিরোজশাহের নির্মিত প্রাসাদ, দুর্গ ও অন্যান্য অট্টালিকায় হিন্দু স্থাপত্যের পুনর্ব্যবহার দেখা গেল। সে-যুগের স্থাপত্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো অলঙ্কার ও বাহুল্যবর্জিত গঠন। সাধারণ পাথর ও চুন সুরকির আস্তর দিয়ে তা তৈরী,— খিলজী আমলে ও পরবর্তী মুঘল যুগে ব্যবহৃত লাল বা শ্বেত পাথরের চিহ্ন বড় নেই। বোধ হয় মুঘল দস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ও দাক্ষিণাত্য অভিযান প্রভৃতিতে ফিরোজশাহের পূর্ববর্তী রাজকোষ শূন্য হয়ে এসেছিল, ব্যয়বহুল প্রস্তর ব্যবহার আর সম্ভব ছিল না। মহম্মদ তোগলক কর্তৃক বারংবার দিল্লীর অধিবাসীদের স্থানান্তরিত করার ফলে পাথরের কাজে দক্ষ রাজমিস্ত্রীর অভাব ঘটাও বিচিত্র নয়।

ফিরোজশাহের সৌধাবলীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, চতুষ্কোণ স্তম্ভের ব্যবহার, দ্বারপথে ও বারান্দায় আর্চের বদলে হিন্দু পদ্ধতির গঠন এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম-উৎকীর্ণ প্রাচীর সজ্জা। ফিরোজশাহ নির্মিত হাউজ খাসের পরবর্তী অংশগুলিতে আছে এর প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মসজিদের গায়ে যে অট্টালিকার উপরে অশোক স্তম্ভটি আছে, তার আরোহণপথ খুব কঠিন নয়। সিঁড়ির ধাপগুলি কিছুটা উচু সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সঙ্গী নারীবাহন মিঃ খোশ্‌লা থাকতে মেয়েদের চিন্তার কারণ নেই। প্রত্যেকটি মহিলা নিরাপদে উপরে না ওঠা পর্যন্ত তিনি নীচে দাঁড়িয়ে তদারক করলেন। বেশী পরিচিতাদের হাতে ধরে উঠতে সাহায্য করলেন এবং সদ্য পরিচিতাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "মে আই—।"

অশোক স্তম্ভটি প্রাসাদের যে-অংশে স্থাপিত সেটা ফিরোজশাহের অন্দরমহলের অন্তর্ভুক্ত বলে কথিত। স্তম্ভটি প্রস্তর নির্মিত। আম্বালার নিকটবর্তী এক গ্রামে সম্রাট অশোক কর্তৃক এই স্তম্ভটি স্থাপিত হয়েছিল খ্রীস্টজন্মের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে। একদা মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তা' ফিরোজশাহের চোখে পড়ল। পুরাকীর্তিতে ফিরোজশাহের গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। সেখান থেকে স্তম্ভটি তুলে নিয়ে এলেন তিনি দিল্লীতে, তাঁর রাজধানী ফিরোজশাহ্‌-কোটলায়।

বিয়াল্লিশ চাকার গাড়ীতে চাপিয়ে শত শত মজুর টেনে এনেছিল এই স্তম্ভটিকে। স্তম্ভটির শীর্ষে একটি স্বর্ণ নির্মিত আচ্ছাদন ছিল। পরবর্তী যুগে জাঠ দস্যুরা দিল্লী লুণ্ঠনকালে তা' আত্মসাৎ করেছে। বহুবর্ষ পরে স্তম্ভের গায়ে পালি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে। অহিংসা ও সর্বজীবে দয়াপ্রদর্শনের অনুরোধ জানিয়ে ভগবান বুদ্ধের অনুগামী সম্রাট অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে যে বহুশত অনুশাসন প্রচার করেছিলেন, এই স্তম্ভে তারই একটি সাক্ষ্য রয়েছে।

অশোক স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে দেখা যায় অদূরবর্তী যমুনার জলস্রোত। ফিরোজশাহের আমলে যমুনার ধারা কোটলার পাদদেশ স্পর্শ করত সে-কথা বুঝতে আজও কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

নীচে নেমে সদলবলে বসা গেল খোলা মাঠের মধ্যে। পাশে

একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। স্থানীয় লোকেরা বলে, বাউলী। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে সুলতান অবগাহন করতেন এর জলে, বিশ্রাম করতেন এর তীরবর্তী পাষাণ-বেদিকায়।

কে একজন বললেন, "তাস সাথে থাকলে একহাত খেলা যেতো।"

আমাদের অধিনায়িকা অমনি তাঁর তোরঙ্গ থেকে বার করলেন দু'-প্যাকেট সুদৃশ্য ঝক্‌ঝকে তাস, নম্বর লেখার ছাপানো প্যাড ও পেন্সিল।

সবাই জয়ধ্বনি করে বলল—"একেই বলে দূরদৃষ্টি। সকল কালের সকল রকম দরকারের কথা যিনি আগে থাকতে ভেবে রাখেন, তাঁরই নাম অনাগতবিধাতা।"

ডাক্তার অধিকারী আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। আর্মিতে লেফ্‌টেনেন্ট কর্নেল। অত্যন্ত রসিক লোক। মাথার পাকা চুল দিয়ে মনের কাঁচা ভাবকে ঢেকে রেখেছেন। মাইলদশেক দূরবর্তী ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসেছেন পিক্‌নিকে যোগ দিতে। কন্ট্রাক্ট ব্রিজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। খুশী হয়ে বললেন, "ক্রীপস-আলোচনা চলেছে। স্বরাজ হলে, আমরা ওঁকেই প্রেসিডেন্ট করব। স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট, মিসেস বিজয়া ব্যানার্জী। বিজয়া ব্যানার্জী কী—"

সবাই মিলিত কণ্ঠে উচ্চ ধ্বনি করলেন, "জয়।"

বাধা দিয়ে বললেম, "কর্নেল, প্রেসিডেন্ট বললেই মনে হয় পলিতকেশ, বিগতযৌবনা বৃদ্ধা। তার চাইতে বলুন, মহারাণী।

কর্নেল তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলেন; "ঠিক বলেছ ভায়া। মহারাণীই ভালো। দিল্লীর দ্বিতীয় মহিলা সম্রাজ্ঞী। সুলতানা রিজিয়ার পরে সুলতানা বিজয়া। জয় মহারাণী বিজয়া কী জয়। বন্দে মাতরম্‌, আল্লা হো আকবর, হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে।"

ভাবী সুলতানা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "এক সঙ্গে তিনটাই বলেন নাকি আপনি?"

"নিশ্চয়। গান্ধী মহারাজ, জনাব জিন্না ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে খুশী

রাখতে হয়। যখন যাঁর হাতে ক্ষমতা আমি তাঁরই দলে আছি। অবস্থা অনুযায়ী যার খুব তাড়াতাড়ি মত বদলায় ইংরেজীতে তাকেই তো বলে প্রগ্রেসিভ।"

মিস্টার জুবেরী সদ্য আই. সি. এস. হয়েছেন। বিলাতে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে কিছু কাল পড়েছিলেনে। সোশ্যালিজমে এখনও ভক্তি আছে। বললেন, "মহারাণী তো মনার্কিজম। ডেমোক্রেসির যুগে তা' চলবে না।"

কর্নেল বললেন, "খুব চলবে। ঘরে ঘরে মনার্কিজম চলছে, আর ঘরের বাইরে গভর্নমেণ্টে চলবে না? ভায়া হে, তোমার বয়স অল্প, শিখতে এখনও ঢের বাকী। ডেমোক্রেসি বস্তুটা আছে শুধু হ্যারল্ড ল্যাস্কির বইতে। আমাদের মিস্টার ব্যানার্জীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তাঁর বাড়িতে তাঁর জানালার পর্দা নীল হবে কি সবুজ হবে, সকালে সুক্তো রান্না হবে কি চেঁচ্কি রান্না হবে—এসব সিদ্ধান্ত ব্যানার্জীর ভোট নিয়ে ঠিক হয়, না মহারাণীর হুকুমে চলে? বিয়ে করলে নিজেই বুঝতে পারবে যে, হার মেজেস্টিস্ গভর্নমেণ্টে আর যাই থাকুক, লীডার অব দি আপোজিশন নেই।"

প্রবল উচ্চ হাস্য উত্থিত হলো সভায়।

লজ্জাজড়িত আত্মপ্রসাদে মহিলার গৌর গণ্ডদ্বয় রক্তিম হয়ে উঠল। প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর কথা নয়। আসুন এবার খেলা যাক।"

হাত জোড় করে বললেম, "মাপ করবেন, ও বিদ্যে আমার একেবারেই জানা নেই।"

"বলেন কী? আচ্ছা, তা হলে খেলা থাক। গান করুন।"

"কী সর্বনাশ! তার চাইতে বরং কুতুব মিনারের উপর থেকে লাফিয়ে পড়তে বলুন। না হয় আপনার খাতিরে তাই চেষ্টা করে দেখব। গান করলে অবশ্য লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছাটা হবে আপনাদের।"

ব্যানার্জী বললেন, "তবে আবৃত্তি শোনান, রবি ঠাকুরের কবিতা।"

জবাবে বললেম, "ছোট বেলায় সংস্কৃত শব্দরূপ আর বড় হয়ে জুরিস্প্রুডেন্সের ধারা মুখস্থ করে করে কবিতা মনে রাখবার আর সময় পেলেম কখন?"

মিসেস বললেন, "আচ্ছা, তা হলে গল্প বলুন।"

ডাক্তার অধিকারী অ্যামেণ্ডমেণ্ট যোগ করলেন,—"প্রেমের গল্প।"

হেসে বললেম, "কর্নেল, প্রেমের হলে সেটা যে গল্পই হবে, সত্যি হবে না, সে তো জানা কথা। কিন্তু সে-গল্পও আমার জানা নেই। চান তো ভূতের গল্প বলতে পারি। জানেন, এই বাউলীর ধারে, ঠিক আপনার ডাইনে মিসেস মিত্র যেখানটায় বসেছেন, সেখানে রাজরক্তের দাগ আছে? সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরকে এখানে হত্যা করা হয়।"

"ও মাগো!"—বলে ত্রিং করে লাফ দিয়ে সরে একেবারে দলের মাঝখানটিতে এসে বসলেন মিসেস মিত্র। বারবার নিজ শাড়ীর দিকে পরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন, সত্যিই রক্তের দু' একটা ছিঁটে ফোঁটা তাঁর বসনে লেগেছে কি না সেই আশঙ্কায়। সবাই খানিকটা হেসে নিল। কিন্তু অন্যান্য মহিলারাও যে একটু চঞ্চল না হলেন তা নয়।

মিঃ খোশ্‌লা মিসেস মিত্রের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। বার বার বলতে লাগলেন এমন ভাবে মেয়েদের ভয় দেখানো মোটেই উচিত হয়নি। হঠাৎ ভয় পেয়ে শক্ লাগলে সাঙ্ঘাতিক ইত্যাদি ইত্যাদি।

অধিনায়িকা দমবার পাত্র নন। বললেন, "বেশ, বলুন ভূতের গল্প। সত্যি ভূতের হওয়া চাই কিন্তু। বানানো নয়।"

"মিসেস ব্যানার্জী, ভূত চিরকালই বানানো হয়ে থাকে। ভূতের গল্পের তো কথাই নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাও আমি জানিনে।"

মহিলা সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "না না, আপনি কেবলই

ফাঁকি দিচ্ছেন। তাস খেলা নয়, গান নয়, গল্পও নয়। একটা কিছু করুন।"

কর্নেল বললেন, "তাইতো হে, তোমার কেস্ খারাপ হচ্ছে। তুমি যদি কোন কিছুই না পার তবে মহারাণীর গভর্নমেণ্টে তোমার জায়গা হবে না।"

মহিলা বললেন, "সত্যি তো। আপানাকে নিয়ে করবো কী? গান গাইতে জানেন না যে, বৈতালিক হবেন। পদ্য কইতে পারবেন না যে, সভাপণ্ডিতের চাকরি দেবো। গল্প বলতে পারেন না যে, বয়স্য করব। এমন অকর্মা লোক আপনি, হবেন কী?"

যুক্তকরে বললেম, "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।"

বিপুল হাস্যরোল।

দশ

আরোগ্য সম্ভাবনাহীন রোগীর অত্যাসন্ন মৃত্যু নিশ্চিত জানার পরেও যে-প্রফেসন্যাল নির্লিপ্ততা নিয়ে ডাক্তার প্রেসক্রিপসন লিখে যান, ক্রীপ্‌স-আলোচনা সম্পর্কেও বর্তমানে আমাদের সেই মনোভাব উপস্থিত। এর ব্যর্থতা সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে সমবেত জার্নলিস্টদের মনে এখন আর সংশয় নেই। প্রশ্ন এখন শেষ মুহূর্তে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটার নয়, প্রশ্ন কবে আলোচনার অসাফল্য সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে।

অথচ মাত্র সপ্তাহ দুই পূর্বেও ক্রীপ্‌স-দৌত্যের এই পরিণতি আশঙ্কা করার কারণ ছিল না। বরং এই রাজনৈতিক আলোচনা দ্বারা শীঘ্রই ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে একটা সম্মানজনক মীমাংসার ফলে ভারতে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে, এই আশাই বেশীর ভাগ লোক পোষণ করেছে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রথম দিনেই পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হলো। তিন দিন পরে ব্রিটিশ নৌবহরের অন্যতম গর্ব ও নির্ভর প্রিন্স-অব-ওয়েলস ও রিপালস্‌ জাপানী বোমার আঘাতে প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে সলিল-সমাধি লাভ করল। দেখতে দেখতে হংকং ও মালয় জাপানীরা কেড়ে নিল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘাঁটি—যা দুর্ভেদ্য বলে সবার ধারণা ছিল—সিঙ্গাপুরের পতন ঘটল।

দুই শত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনকালে এই প্রথম জল এবং স্থলপথে ভারতবর্ষ শত্রু-আক্রমণের সম্মুখীন। কর্তৃপক্ষের মনে উদ্বেগ, সাধারণের মনে ভীতি এবং সহজ-বিশ্বাসপ্রবণ অজ্ঞজনের অসংবদ্ধ রসনায় নানাবিধ ত্রাসজনক রটনার সৃষ্টি হলো।

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাউস অব কমন্‌সে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করলেন,—ওয়ার ক্যাবিনেট সর্বসম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্পর্কে একটি ন্যায়সঙ্গত ও চূড়ান্ত সমাধান —জাস্ট এণ্ড ফাইন্যাল সলিউসন—স্থির করেছেন এবং লর্ড প্রিভি-সীল সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স নিজে ভারতীয় নেতৃবর্গের সম্মতি সংগ্রহের জন্য মন্ত্রিসভার প্রস্তাবটি নিয়ে ভারতে যাচ্ছেন।

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর থেকে পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী ভারতেব দাবি, বারংবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব। মাসখানেক পূর্বে মার্শাল চিয়াং কাইসেক ও মাদাম এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তাঁরা প্রকাশ্য বিবৃতিতে ব্রিটেনকে ভারতীয়দের হাতে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতায় প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের অনুরোধ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তার পরেই সুস্পষ্ট ভাষায় চার্চিলের উক্তির প্রতিবাদ করে বললেন, অ্যাটলান্টিক চার্টার সমগ্র পৃথিবীর জন্য, কেউ তা থেকে বঞ্চিত হবে না। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী এভাট সেখানকার পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে ন্যায্য বলে স্বীকার ক'রে বললেন সে দাবির প্রতি অস্ট্রেলিয়ানদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ভারতবর্ষে জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতি সম্মিলিত জাতিগুলির এই ক্রমবর্ধমান অনুকূল মনোভাব ও প্রকাশ্য উক্তি দ্বারা ব্রিটেনের রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষ বিব্রত হচ্ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তার চাইতেও গুরুতর কারণ ছিল প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার। সে-কারণ সহৃদয়তার নয়, অনুরোধ উপরোধ বা উপদেশজাত নয়। কারণ কঠোর বাস্তব ঘটনা পরম্পরায়। ৮ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হলো, ব্রহ্মে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটল! ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত ও ইংরেজের অনুকূল করার প্রয়োজনীয়তা

ইতিপূর্বে এমন আর কখনও অনুভূত হয়নি। ১১ই মার্চ চার্চিল ক্রীপস মিশনের কথা ঘোষণা করলেন।

তবুও একথা মানতেই হবে যে, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। এদেশের সংবাদপত্র ও জনসাধারণ ব্রিটিশ ওয়ার ক্যাবিনেটের এই নব প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করল। বোধ হয় এতদিন সত্য সত্যই ব্রিটেন ভারতীয় সমস্যার সত্যিকার সমাধানে উৎসুক। ক্ষমতা হস্তান্তরে স্বীকৃত।

ভারতে এই অনুকূল মনোভাবের পশ্চাতে ছিল মন্ত্রিসভার ভারপ্রাপ্ত আলোচনাকারী ব্যক্তিটির প্রতি ভারতবর্ষের আস্থা। সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতবর্ষ বর্তমান শতাব্দীর মুষ্টিমেয় ভারতহিতৈষী ইংরেজের মধ্যে অন্যতম জ্ঞান করে থাকে। ক্রীপস ইতিপূর্বে ছ'বার ভারতবর্ষে এসেছেন। কংগ্রেসের নীতি ও কর্ম-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তিনি একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। একাধিকবার ভারতে ইংরেজ শাসনের ত্বরিত সমাপ্তি কামনা করে তিনি লেখনী চালনা করেছেন। বেশী দিনের কথা নয়, য়ুরোপে যুদ্ধ ঘোষণার সাত সপ্তাহ পরে হাউস অব কমনসে দাঁড়িয়ে গভীর প্রত্যয়-ব্যঞ্জক স্বরে ক্রীপস বলেছেন, "কংগ্রেসের নয়, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার দাবি আজও অপূর্ণ রয়েছে। সাম্প্রদায়িক কলহের কথাটা একটা ছুতা মাত্র!"

সেই ক্রীপসের আপোষ-আলোচনা নিরর্থক হতে চলল। মতভেদের বর্তমান কারণ দেশরক্ষার প্রশ্ন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাবানুসারে দেশরক্ষার ভার থাকবে একান্তভাবে প্রধান সেনাপতির হাতে। কংগ্রেসের দাবি, দেশরক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর। সে-দায়িত্ব পালনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা সঞ্চার প্রয়োজন তা একমাত্র ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের পক্ষেই সম্ভব, বিদেশী কমাণ্ডার-ইন-চীফের নয়।

যুদ্ধ পরিচালনার প্রত্যক্ষ ভার কংগ্রেস প্রধান সেনাপতির উপরে ন্যস্ত করতে রাজী ছিলেন। সে-ব্যাপারে তাঁকে সর্বাধিক স্বাধীনতা দানে কংগ্রেসের আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেশরক্ষার মূল দায়িত্ব ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের হাতে না থাকলে স্বাধিকার লাভের অর্থ থাকে না। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়ে দেশের অন্যান্য সমস্যা ও ব্যবস্থা দেশরক্ষার বৃহত্তর প্রশ্নের দ্বারাই বহুলাংশে প্রভাবান্বিত। সত্যিকার দায়িত্ব ও স্বাধীনতা লাভের পরিমাপ দেশরক্ষার নিরবচ্ছিন্ন অধিকারের দ্বারাই নিরূপিত হয়।

এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা ক্রীপসের সাধ্য ছিল না। তাই তিনি বিকল্প প্রস্তাব করলেন, প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ-সচিবরূপে সমর পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবেন এবং দেশরক্ষা সচিব আখ্যা নিয়ে একজন জন-প্রতিনিধি দেশরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন।

ভালো কথা। কিন্তু এ-দুজনের কর্ম-বিভাগ হবে কী ভাবে? ক্রীপস প্রস্তাবিত নব দেশরক্ষা সচিবের করণীয় কর্মের একটি তালিকা দিলেন। সে তালিকায় আছে—(১) পেট্রোল সরবরাহ, (২) স্টেশনারী অর্থাৎ কাগজ, পেন্সিল, নিব, কালী, কলম কেনা ও রাখার ভার, ফর্ম ছাপানো, (৩) ক্যান্টিন পরিচালনা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গাম্ভীর্য রক্ষা করে এই তালিকাটি পাঠ করা কঠিন। এদেশের অন্তঃপুরে পানের ভিতরে লঙ্কার কুচি, লুচির মধ্যে ন্যাকড়া ও সরবতে চিনির বদলে নুন মেশানো প্রভৃতি কতকগুলি জামাই-ঠকানো প্রাচীন মেয়েলি কৌতুকের কথা শোনা আছে। কিন্তু চল্লিশ কোটি নরনারীর ভাগ্য নিয়ে দুই দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যেখানে চরম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে, সেখানে এই পিড়ির নীচে সুপুরি রেখে আছাড়-খাওয়ানো রসিকতা নিশ্চয়ই কেউ প্রত্যাশা করে না।

অপরাহ্নে ইম্পিরিয়্যাল হোটেলে এক সাংবাদিক বন্ধুর চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। বন্ধুটি কংগ্রেসের সমর্থক নন, গান্ধীজিকে তিনি সাংসারিকবুদ্ধিহীন স্বপ্নবিলাসী—আনপ্রাক্‌টিক্যাল আইডিয়েলিস্ট—মনে করেন। ভারতীয় নন। আমেরিকানও নন,—ইংরেজ। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন, "ব্রিটেনের কোন্ শত্রু এই তালিকাটি রচনা করে ক্রীপ্‌সের হাতে দিয়েছে? জাপানীদের টাকা খাচ্ছে এমন কোনো ফিফথ্‌-কলামিস্ট নয়তো?"

অসম্ভব নয়।

বন্ধুটি রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বললেন, "পেট্রোল, স্টেশনারী, ক্যাণ্টিন! খ্যাংরা কাঠি ও দাঁতের খড়কে নয় কেন—হোয়াই নট ব্রুমস্টিকস্ অ্যাণ্ড টুথপিকস্?"

ভারতবর্ষের প্রথম দেশরক্ষা সচিব হবেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, এই কথা গত এক সপ্তাহ ধরে নানাভাবে আমরা আলোচনা করেছি। একবার কল্পনা করে দেখা যাক জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে পণ্ডিত নেহরু তাঁর অনবদ্য ভাষায় বেতারে আবেদন করছেন, তার সঙ্গে পড়ে শোনাচ্ছেন কর্মের তালিকা—"পেট্রোল, পেন্সিল, নিব, আলপিন—।" পৃথিবীতে সব জিনিষেরই নাকি মাত্রা আছে। নেই কি শুধু নির্বুদ্ধিতার? পরিহাসের?

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এই,—যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটেনের। সে-দায়িত্ব শুধু ভারতের অগণিত জনসাধারণের প্রতি নয়, সে-দায়িত্ব মিত্র-জাতিসঙ্ঘের প্রতি, যাঁদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ব্রিটেন যুদ্ধ করেছে চক্রশক্তির বিরুদ্ধে। সে-দায়িত্ব তাঁরা পরিত্যাগ করতে পারেন না।

দেশরক্ষার প্রশ্নটি ভারতবর্ষের পক্ষে নানাদিক দিয়ে জটিল। ইংরেজীতে ন্যাশন্যাল আর্মি বললে যা বুঝায় ভারতবর্ষের তেমন কোন সেনাবাহিনী নেই। ভারতের সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে পেশাদার

সিপাহীদল থেকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই সিপাহীদের সংগ্রহ করা হতো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। একের পর এক করে কোম্পানী নগর, প্রদেশ ও রাজ্য দখল করেছে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করেছে সিপাহীদল, বেতনের আকর্ষণে।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে কোম্পানীর হাত থেকে রাজ্য শাসনের ভার নিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। সেনাবাহিনীও সাম্রাজ্ঞীর অধীন হলো। সুরু হলো পরিবর্তন। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে দেশীয় সৈন্যদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করলেন ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ। প্রতি দু'টি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করলেন একটি ব্রিটিশ বাহিনী, যাতে কোনোদিন কোনো কারণে ভারতীয় বাহিনী বিরুদ্ধভাবাপন্ন হ'লে অবিলম্বে দমন করা চলে তাদের। সিপাহী বিদ্রোহের আগে ছয়টি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে একটি মাত্র ব্রিটিশ বাহিনী থাকতো। গোলন্দাজ বাহিনীতে একটিও ভারতীয় নেওয়া হয়নি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত। এই যুদ্ধের আগে পর্যন্ত অফিসার র‍্যাঙ্কে ভারতীয় যা ছিল তাদের আঙ্গুলে গোনা যায় এবং যারা ছিল তাদের মধ্যেও কেউ মেজরের উপরে ওঠেনি। সামরিক বিচারে বোধ করি তখন পর্যন্ত ভারতীয়দের মেজরিটি প্রাপ্তি ঘটেনি!

সবচেয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হলো সৈন্যদলের লোক নির্বাচনে 'সামরিক' ও 'অসামরিক' জাতি, এই কৃত্রিম শ্রেণী বিভাগের দ্বারা ভারতীয় বাহিনী থেকে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রায় সব প্রদেশের লোককে সযত্নে দূরে রাখা হয়েছে। অথচ ইতিহাসে যাঁদের কিছুমাত্র দখল আছে তাঁরাই জানেন ভারতে ইংরেজের রাজ্যবিস্তারের এক প্রধান অংশ সম্ভব হয়েছিল বর্তমানে 'অসামরিক' জাতি বলে উপেক্ষিত বাংলা ও মাদ্রাজের সিপাহী সান্ত্রীদেরই বাহুবলে। বর্তমানে অত্যন্ত সহজ-বোধ্য কারণে যে-সকল ইংরেজ রাজনীতিক মুসলমানদের সামরিক কৃতিত্ব সম্পর্কে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় গদগদ এবং ইংরেজের অবর্তমানে

ভারতে গৃহযুদ্ধ ঘটলে হিন্দুদের অসহায়ত্ব নিয়ে যাঁরা প্রায় অশ্রু বর্ষণ করেন, সেই ভারতবন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, ইংরেজের রাজ্যবিস্তারেব কালে যারা শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি বলে স্বীকৃত ছিল এবং যাদের কাছে ইংরেজ সর্বাধিক প্রতিরোধ পেয়েছে, তারা মারাঠা ও শিখ। এদের প্রথমটির ধর্মমত অবিমিশ্র হিন্দু, দ্বিতীয়টিও হিন্দু ধর্মেরই সংস্কারোত্তর রূপ। একটিও ইসলাম নয়!

পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের প্রতি সেনা বিভাগের এই পক্ষপাতের কারণ কী? কেউ কেউ বলেন, উত্তর ভারতের লোকেরা সাধারণতঃ দৈর্ঘে ও দৈহিক গঠনে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের চাইতে উন্নত। কিন্তু সেটাই সামরিক জাতি বলে চিহ্নিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। গুর্খাদের তাহলে কোনকালেই খাকী পরতে হতোনা। বিশেষ করে সৈন্যদের কৃতিত্ব যে-যুগে তাদের দৈহিক সামর্থের উপরেই নির্ভর করতো, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই তার সমাপ্তি ঘটেছে।

কোন বিশেষ অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহের সুবিধা এই যে, তার ফলে একটা নতুন জাতিপ্রথা সৃষ্টি করা চলে। সামরিক বৃত্তি অনেকাংশে পারিবারিক হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষানুক্রমে পিতামহ থেকে পিতা এবং পিতা থেকে পুত্রে সেই বৃত্তি প্রসারিত হয় এবং একই বাহিনীতে বংশপরম্পরা চাকরির দ্বারা বাহিনীর প্রতি একটা কায়েমী স্বার্থবোধ জাগে। নিজেকে তারা সে-বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অংশবিশেষ বলেই জ্ঞান করে। ঠিক যেমন করে কলকাতার বড় বড় বিলাতী কোম্পানীগুলির ক্যাশিয়ার, বড়বাবু বা বেনিয়ানরা। বিদেশী শাসকের পক্ষে শাসনযন্ত্রের প্রতি শাসিতদের এই মমত্ববোধ সৃষ্টির সার্থকতা সামান্য নয়।

তার চাইতেও বড় কারণ আছে। সে-কারণ রাজনৈতিক। স্বীকার করতেই হবে যে, কিছুকাল পূর্বেও ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ছিল রাজনৈতিক চেতনাহীন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়

পাঞ্জাব ছিল একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে, দেশীয় জনগণ অস্ত্র ধরেনি। আধুনিক কালেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাবে জাতীয় জাগরণের চিহ্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। গদর দল ও কোমাগাটামারুকে নিয়ে যাঁরা পাঞ্জাবের দেশপ্রাণতার প্রশস্তি রচনা করেন, তাঁদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সে-পাঞ্জাবীরা বিদেশে গিয়েই দেশাত্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, দেশে থাকতে নয়। সাধারণ পাঞ্জাবী সচ্ছল জীবনযাত্রা, মোটা মাইনে, অজস্র আহার ও দামী পোষাক পেলেই খুসী থাকে, দেশ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। ভগৎ সিং-এরা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র।

ভারতীয় সেনা বিভাগে বাঙালীরাই সবচেয়ে বেশী অবাঞ্ছিত। আর্মির মনুসংহিতায় তারা হরিজন। আশ্চর্য নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ থেকে সুরু করে তারাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিবাদ করেছে অবিরত, সংগ্রাম করে আসছে অমিত তেজে। ভারতের আধুনিক জাতীয় জাগরণের প্রথম উন্মেষ ঘটেছে এইখানে। জাতীয় যজ্ঞে এখানে মায়েরা আহুতি দিয়েছে পুত্র, মেয়েরা দিয়েছে প্রেরণা, ছেলেরা দিয়েছে প্রাণ। এদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে কার্জন করেছে বঙ্গ-ভঙ্গ, হার্ডিঞ্জ স্থানান্তরিত করেছে রাজধানী, ম্যাকডোন্যাল্ড কায়েম করেছে কমিউন্যাল এওয়ার্ড। সর্বনাশ! এদের সেনাদলে নিলে রক্ষে আছে? এইখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছিল বাংলাদেশেরই এক ছাউনিতে। ব্যারাকপুরে।

'সামরিক জাতির' প্রতি এই পক্ষপাত ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই। অভাব অভিযোগের ফলে পাছে তাদের ব্রিটিশ-আনুরক্তি হ্রাস পায় সেজন্য ব্রিটিশ শাসকেরা এই 'সামরিক জাতির' পার্থিব কল্যাণ সাধনে অনেকটা তৎপর হয়েছেন, সে-কথাও সত্য। সেনা বিভাগের বেতনের হার ও পেন্সন 'সাধারণ

দরিদ্র গ্রামবাসীর পক্ষে যথেষ্ট লোভনীয়। তা ছাড়া বার্ধক্যে অবসর গ্রহণকালে অনেকে জায়গীরও পেয়েছে।

পাঞ্জাব সেনাবিভাগের সৈন্য ও অশ্ব জোগায়, তাই পাঞ্জাব সর্বদাই কর্তৃপক্ষের অধিকতর সস্নেহ মনোযোগ লাভ করে এসেছে। কৃষির উন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নয়ন-পরিকল্পনা পাঞ্জাবে হয়েছে বেশী। সমবায় আন্দোলন ও কৃষিবিদ্যার গবেষণা সুরু হয়েছে সেখানে এবং ভারতে ব্রিটিশ যুগের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও ব্যয়বহুল কৃত্রিম সেচকার্যের নিদর্শন আছে পাঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে। সেখানে বেশীর ভাগ চাষীরই ক্ষেতে ধান, গোহালে গরু এবং ঘরে আর্মির মেডেল আছে। সেখানে সাহেবকে বলে হুজুর, দারোগাকে বলে ধর্মাবতার, গভর্নমেণ্টকে বলে সরকার বাহাদুর। সেখানে স্বরাজের গরজ থাকবে কার?

কিন্তু বন্যা যখন আসে, অখন তাকে বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যায় ক'দিন? সমুদ্র যদি ক্যান্যুটের আদেশ মেনেই চলতো তবে আর ভাবনা ছিল কী? সমস্ত প্রতিষেধক ও সাবধানতা ব্যর্থ করে দেশাত্মবোধের ধারা এসেছে ধীরে ধীরে। ভারতবর্ষের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—কোথাও কোন প্রান্তে তার আর বাধা রইল না। পশ্চিম সীমান্তে খান আব্দুল গফুর খান এই ভাবগঙ্গার ভগীরথ।

এই বহু অনুগৃহীত অঞ্চলের রাজনীতির সম্পর্ক বর্জিত সরল অধিবাসীদেরও তাদের স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার এখন আর আগের মতো নিরাপদ নয়। বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে, ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কালে একদল হিন্দু গাড়োয়াল সৈন্য পেশোয়ারে মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে গুলিবর্ষণে অস্বীকৃত হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল। সে সংবাদ এদেশের খবরের কাগজে প্রকাশ পায়নি, অর্থাৎ প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি।

সম্প্রদায়ের দিক দিয়ে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই সেনাদলের শতকরা

৩৫ ভাগ ছিল মুসলমান, ২৩ ভাগ শিখ ও ৪২ ভাগ হিন্দু। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এ হিসাব থেকেও হিন্দুদের বিরুদ্ধে বহু-প্রচারিত সামরিক অযোগ্যতার অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

খুব সামান্য হলেও ভারতবর্ষের সামরিক নীতির প্রথম পরিবর্তন ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর। একান্তভাবে য়ুরোপীয় অফিসার পরিচালিত বাহিনীর সামান্য অংশ ভারতীয়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতীয়েরা সেনাবিভাগে কিং'স কমিশন প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হয় এবং ভারতীয় সেনানায়কদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দেরাছুনে ভারতীয় স্যাণ্ডহার্স্ট-এর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

বর্তমান যুদ্ধে এই ভারতীয়করণ দ্রুত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয়দের প্রতি মমত্ব বোধে নয়। ইংরেজের নিজ প্রয়োজনের তাগিদে। অসামরিক জাতি বলে সেনা বিভাগে ইতিপূর্বে যাদের প্রবেশের সম্ভাবনা মাত্র ছিল না, তারাও এখন অফিসার হতে পারে। অবশ্য এই বাধা অপসারণের ফলে সেনাবিভাগে বাঙালীর সংখ্যা এখনও খুব উল্লেখযোগ্য বলে আমার বিশ্বাস নেই, যদিও বিমানবহরে তাদের সংখ্যা তেমন হতাশাজনক নয়। সুদক্ষ বৈমানিকরূপে কয়েকজন বাঙালী তরুণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছেন।

এতকাল ভারতবর্ষে দেশরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে।' কমাণ্ডার-ইন-চীফের সবগুলি কামানের মুখ ছিল আফ্রিদিদের দিকে। একচক্ষু হরিণের মতো পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হওয়ার পরে সেনাপতিরা প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলেন, বিপদ ঠিক সে-দিক থেকেই উপস্থিত যে-দিকে তার সম্ভাবনা তাঁরা কল্পনাও করেন নি।

যুদ্ধশাস্ত্র মতে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন নৌবহর। তা নেই। জলপথ সবটাই শত্রুর দখলে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় যে-পেশাদার সেনাবাহিনী

ভারতে বর্তমান, তা আধুনিক যুদ্ধযন্ত্রে পুরাপুরি সজ্জিত নয় এবং তাদের ঘাঁটিগুলি সম্ভাবিত রণক্ষেত্র থেকে বহু শত যোজন দূরে, দেশের অপর প্রান্তে।

এই আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার উপায় কী এ প্রশ্ন সামরিক কর্তৃপক্ষের মনে উদিত হয়েছে কিনা জানার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রহীন যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞতাশূন্য জনসাধারণের মনে এ জিজ্ঞাসা জেগেছে। অবশেষে একজন এই প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ করলেন। তাঁর নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

পঞ্চাশ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন জওহরলাল। কাশ্মীরী পণ্ডিতের বংশধর তিনি। তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ রাজকাউল ছিলেন প্রখ্যাতনামা পার্শি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ নেহরু ছিলেন মোগল দরবারে নামকরা ব্যবহারজীব। এডভোকেট জনকের সন্তান জওহরলাল নিজেও মসিজীবিরূপেই কর্মজীবন সুরু করেছিলেন। দেশরক্ষার আয়োজনে তিনিই সর্বপ্রথম পবিকল্পনা করলেন সর্বসাধারণের অসিচালনার। জনগণের কথা যিনি ভাবেন তাঁকেই তো আমরা বলি জনগণ-মন-অধিনায়ক।

অস্ত্র? চাই বৈকি। অবশ্যই চাই। পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্যের অস্ত্র জোগাতে দেশে নতুন কলকারখানা স্থাপন ও পুরাতন কলকারখানার বিস্তার প্রয়োজন। সেটা সময়সাপেক্ষ। শত্রু তো তা'র জন্যে অপেক্ষা করবে না। পণ্ডিতজি অত্যন্ত নিকটে থেকে গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিলেন স্পেন ও চীনের গণবাহিনীর যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধরীতি। স্পেনে চাষী মজুরদের সমিতি থেকেই গড়ে উঠেছিল সেনাবাহিনী। তার মধ্য থেকেই উদ্ভব হয়েছে একাধিক সেনাপতির যারা প্রথম জীবনে কেউ চালিয়েছে লাঙ্গল, কেউ বুনেছে তাঁত। চীন থেকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার লোক আনার পরিকল্পনা করলেন জওহরলাল।

গতিশীলতা, ইংরেজীতে যাকে বলে মোবিলিটি, সেই হলো এই বাহিনীর সর্বাপেক্ষা সুবিধা। রাইফলের অভাবে হাতবোমা দিয়ে এর কাজ চলে। সর্বত্র এদের সহযোগিতার জন্য গ্রামবাসীরা হতো ব্যগ্র। ক্ষুধায় অন্ন এবং বিপদে আশ্রয় জোগাতো তারা। দেশপ্রাণতার প্রেরণায় এই বাহিনীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকতো। য়ুরোপীয় পরিচালনায় বেতনভুক সৈন্যদলের মতো তারা আদেশ পালনের যন্ত্রমাত্র হতো না। জনশ্রুতি এই যে, কোন কোন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষও এই পরিকল্পনা শ্রদ্ধার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিলাত থেকে মেজর টম উইনট্রিংহ্যাম্ ভারতবর্ষে এসে এই সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন এমন প্রস্তাবও শোনা গেছে। উইনট্রিংহাম্ স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক দলের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর পরিকল্পনা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রীতির চোখে দেখবেন এ আশা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা আর যাই হোন, মানব-চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন। তাঁদের জানা উচিত ছিল, ব্রিটিশ প্রস্তাবে সৈন্যসামন্ত বা অস্ত্রশস্ত্রের কথা থাকে না। থাকে পেট্রোল স্টেশনারী ও ক্যাণ্টিন। রুল ব্রিটেনিয়া, ব্রিটেনিয়া রুল্‌স্ দি শ্লেভস্!

ইম্পিরিয়্যাল হোটেল থেকে ফিরছি স্বস্থানে। গেটের বাহিরে এসে দাঁড়াতেই দেখি হঠাৎ ব্রেক কষে সশব্দে একটি গাড়ি দাঁড়ালো একেবারে ঠিক সামনে। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আরোহীটি বললেন, "তাই তো, আমাদের বোঁচ্‌কা যে! এখানে কী করছিস? আয় উঠে আয়।"

বোঁচ্‌কা আমার পিতৃ বা মাতৃদত্ত নাম নয়। পারিবারিক সম্বোধনও নয়! কিশোর বয়সে সহপাঠীদের দ্বারা আবিষ্কৃত উত্যক্ত করার একটি উপকরণমাত্র। লাটিমের অধিকার, আমসত্ত্বের অংশ ও বিস্কুটের বণ্টন নিয়ে মতভেদজনিত কলহের পরিণামে বিক্ষুব্ধ পক্ষ

ঐ শব্দটির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিদ্বারা আমার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করতো এবং বহুল পরিমাণে সফলকামও হতো। মনে আছে, অনেকদিন খেলার মাঠে বা ক্লাশে ঐ নামটা শুনে ক্রোধে ও অপমানে প্রচুর অশ্রুপাত করেছি।

নামটা একেবারে আকস্মিক নয়। তার পশ্চাতে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। প্রথম যে-দিন বৃন্দাবন পণ্ডিতের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ, সে দিন দিদিমা একখানা শান্তিপুরী জরিপাড় ধুতি ও সিল্কের জামা পরিয়ে দিয়েছিলেন। পোষাকটা গুরুগৃহগামী ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থীর চাইতে সদ্য বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে আগত জামাতা বাবাজীর পক্ষেই অধিকতর উপযোগী ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপদ দেখা দিল বস্ত্রটি নিয়েই। প্রথমতঃ তার অবস্থান যথাস্থানে রাখা রীতিমত আয়াসসাধ্য ব্যাপার, তার উপরে সযত্নে কুঞ্চিত লম্বমান কোঁচার প্রান্তভাগ মাধ্যাকর্ষণের ফলে কেবলই নিম্নাভিমুখী হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়। এক হাতে শ্লেট ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ-পরিচয়, অপর হাতে ধৃত শিথিল-বন্ধন বসনের প্রান্তভাগ। কোনো রকমে তালপাকানো অঞ্চলভাগ দেখতে পোট্‌লা-আকৃতি। গোঁসাইদের বাড়ির সিধু ছিল পাঠশালার সর্বাপেক্ষা বখা ছেলে। বয়সে অন্য সব ছাত্রদের চাইতে অনেক বড়। লেখাপড়ায় বৃহস্পতি। বার দুই ধরে এক ক্লাশেই আছে। এরই মধ্যে বিড়ি ধরেছে। কাছে এসে অত্যন্ত নিরীহের মতো প্রশ্ন করল, "হাতে বোঁচ্‌কাটি কিসের বাপু, মুড়কির না বাতাসার?".

ক্লাশ শুদ্ধ সবাই হেসে উঠলো। সেই থেকে সুরু হলো বোঁচ্‌কা। খাতা নিয়ে, পেন্সিল নিয়ে ঝগড়া হলেই বলে, বোঁচকা। সিধুকে কত সাধ্য সাধনা করেছি। এন্তার মার্বেল, রাশি রাশি জলছবি ঘুষ দিয়েছি। আর যেন কোন দিন না বলে। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জিনিষগুলি পকেটে পুরে' প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, "ক্ষেপেছিস্? আর বলি কখনও বোঁচ্‌কা? তোর ঐ লাল পেন্সিলটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে।"

কিশোর বালকের পক্ষে সে-দিন ঐ লাল পেন্সিলটা দান করা কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দানের চাইতে কোন অংশে কম কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতেও স্বীকৃত হয়েছি। অত্যন্ত অনুনয় করে বলেছি, "দেখো ভাই, অন্য ছেলেরা যেন আর না বলে, বারণ করে দিয়ো।"

সিধু পেন্সিলটার ডগায় জিভের লালা লাগিয়ে কাগজে মোটা অক্ষরে নিজের নাম লিখতে লিখতে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করল, "হুঁঃ, বলুক দেখি সাহস আছে কোন্ শা— ।"

সিধুর বিবাহের নিকট বা সুদূর কোন সম্ভাবনাই তখন ছিল না। কিন্তু তার সম্ভবপর পত্নীর কাল্পনিক সহোদরের উল্লেখ না করে কোন একটি বাক্য সমাপ্ত বা আরম্ভ করা তার পক্ষে কঠিন। ঐ বয়সেই ভাষায় তার এমন শব্দ-সম্ভার যা এবয়সেও উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি দান ও তা পালনের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন নিয়ে সিধুর কোন চিন্তা ছিল না। এ বিষয়ে তার রেকর্ড প্রায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমতুল্য। পরের দিনই ক্লাসে পণ্ডিত মহাশয়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও পিছনের বেঞ্চি থেকে পরিচিত কণ্ঠের চাপা স্বরে আওয়াজ এলো, বোঁচ্— । অমনি চারদিক থেকে অন্য ছাত্রেরা শ্লেটের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করলো—হিঃ হিঃ, হুঃ হুঃ, ফিক্‌'।

কাছে এসে দেখি সিধুই বটে। যদিও চেনা খুব সহজ নয়। পরনে লাইট গ্রে রং-এর শার্কস্কিনের মহার্ঘ স্যুট, পায়ে দামী বিলাতী জুতা যার চক্‌মক্ করা পালিশে প্রায় মুখ দেখা যায়। দুই হাতে গোটা চারেক আংটি, পকেটে পার্কার ফিফ্‌টি-টু কলম ও পেন্সিলের সেট, যা একমাত্র আমেরিকান সেনানায়কদের কাছে ছাড়া এদেশে এখনও আর কেউ দেখেনি বললেই হয়। এই কি সেই সিধু যে পাঁচ বছর আগে পটলডাঙ্গার পাইস হোটেলের নীচের তলায় এক টাকা

বারো আনা ভাড়ায় আর ছ'জন লোকের সঙ্গে একটা অন্ধকার কুঠুরিতে থাকতো? কোন্ তেলের কলের বিল্ কালেক্টর ছিল, মাইনে আঠারো টাকা। চিবুকের নীচে কালো বড় আঁচিলটা না থাকলে সিধু বলে বিশ্বাস করাই কঠিন হতো।

"তুই এখানে কেন? বিলাত থেকে ফিরলি কবে? বিয়ে থা করেছিস তো?" এক সঙ্গে তিনটা প্রশ্ন করল সিধু।

"সে-সব পরে হবে, তোমার খবর কি বল দেখি?"

"আমার খবর ভালো। মিলিটারি কনট্রাক্ট করছি। হাতে দু'পয়সা আসছে রে।" সে কথা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন ছিল না।

তার কাহিনী যা শোনা গেল সংক্ষেপে তা এই:—তেলের কলের সেই চাকরি ছেড়ে সে অনেক কিছু করেছে। সাবানের ক্যানভাসারি, এক টাকার ইনসিওরেন্সের দালালী, মায় কাগজের প্যাকেটে চানাচুর বিক্রী পর্যন্ত। কোনটাতেই কিছু হয় না। মাসের মধ্যে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে না অনেকদিন, এমন অবস্থা। হঠাৎ বাধলো যুদ্ধ। এরোড্রোম তৈরী করে এমন এক কনট্রাক্টরের মধ্যে কুলি-তদারকের কাজ নিয়ে চলে গেল আসামের কোন জঙ্গলে। সেখানেই কপাল ফিরল। কিছু হাতে নিয়ে এসে বসল কলকাতায়। প্রথমে ছোটখাটো জিনিষ সাপ্লাই, পরে বড় বড় কনট্রাক্ট। এখন দিল্লীতে এসেছে ডিপার্টমেন্টের কোন এক বড় সাহেবকে ধরতে।

পুরানো দিল্লীর সুইস হোটেলে তার আস্তানা। সেখানে এসে গাড়ি থেকে নেমে নিয়ে গেল তার ঘরে। জিজ্ঞাসা করল, "থাকিস কোথায়? কুইনসওয়ে? আচ্ছা গাড়ি তোকে নামিয়ে দেবে সেখানে। এই দেখো ড্রাইভার, আভি ঠাহারো। এ সাবকো কুইনসওয়ে ছোড়নে পড়েগি।" কুলির তদারক করে হিন্দীটা রপ্ত করেছে সিধু মন্দ নয়।

বাধা দিয়ে বললাম, "না, না, আমার জন্য ভাবনা নেই। আমি বাস্ নেবো এখান থেকে।"

"ক্ষ্যাপা নাকি? বাসে যা ঝাঁকুনি আর যা ভীড়। ভদ্রলোকের ওঠা দায়। গাড়ি থাকতে সে দুর্ভোগ কেন? ভাড়া তো তাকে পুরা দিনের জন্যই দিচ্ছি।"

এতক্ষণে বুঝলাম, গাড়িটা ট্যাক্সি এবং সমস্ত দিনের জন্যই ভাড়া করা হয়েছে। নয়াদিল্লীর ট্যাক্সিতে মিটার নেই, তার নম্বরও 'টি' দিয়ে আরম্ভ নয়। না জানলে বুঝবার সাধ্য নেই যে, ভাড়াটে গাড়ি। কিন্তু বিস্ময়ের অন্ত পাইনে। ঝাঁকুনি আর ভীড়ের জন্য সিধুর ন্যায় ভদ্রব্যক্তির বাসে ওঠা দায়! মনে আছে, পটলডাঙ্গা থেকে দুপুর রোদে পায়ে হেঁটে একদিন টালিগঞ্জে দেখা করতে এসেছিল এই সিধু। সে খুব বেশী দিনেরও কথা নয়।

বয়কে হুইস্কি হুকুম করলে সিধু। নিষেধ করলেম। হেসে বললে, "ভাবছিস বুঝি 'সোলান' কিম্বা 'মারি'? ওসব দেশী মাল ছোঁবে এমন শর্মা নয় সিধুচন্দ্র। চেখেই দেখ্না। খাস স্কচ্। খাসা। বাবা খাবো তো খাঁটি জিনিষ খাবো, নয়তো নয়।"

"সে জন্যে নয়। কিন্তু স্কচ্ পাও কোথায়? বাজারে তো শুনছি—।"

"হ্যাঁ, সাদা বাজারে নেই, কিন্তু কালো বাজারে অভাব কী? ভাইরে, সবই টাকার মাম্লা। ঝন্ঝনে ফ্যালো, জিনিষ দেবে না কোন্ শা—?"

স্বচক্ষে দেখলাম কথায় এবং কাজে তফাৎ করে না সিধু। তিন বোতল সোডা কিনে এনে একটা পাঁচ টাকার নোটের অবশিষ্ট ফেরৎ দিচ্ছিল বেয়ারা। "ঠিক হ্যায়, লে যাও" বলে' অত্যন্ত নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে সমস্তটাই বকশিশ করল তাকে। লোকটা আভূমিপ্রণত সেলাম করে প্রস্থান করল।

সিধু তার বর্তমান দিল্লী আগমনের কারণ ব্যক্ত করল।

কলকাতায় ছোট সায়েব নাকি তার নামে লাগিয়েছে অনেক কিছু। এখান থেকে তাই তার ফ্যাক্টরী দেখতে যাবে কোন একজন অফিসার। সুতরাং একটু ভাবনায় ফেলেছে।

ভাবনাটা কিসের ঠিক বুঝতে পারলেম না। দেখে আসুক না ফ্যাক্টরী, ক্ষতিটা কিসের?

সিধু বিরক্ত হয়ে বললো, "আরে ফ্যাক্টরী থাকলে তো দেখবে? ফ্যাক্টরীই নেই যে।"

"ফ্যাক্টরী নেই, তবে মাল যোগাচ্ছ কেমন করে?"

"তুই এখনও সেই বোঁচ্‌কাই আছিস। বিলাত ঘুরেও বুদ্ধি খুলল না এতটুকু! আরে মাল যোগাবার জন্যে ফ্যাক্টরী থাকার দরকার কী? অন্য লোকের ফ্যাক্টরী নেই? সেখান থেকে তৈরী করিয়ে নিজের লেবেলে চালাতে আটকাবে কোন্ শা—? ছাপাখানার কিছুটা খরচ আছে। খানকয়েক চালান ফরম, লেটার হেড, রবার স্ট্যাম্প, ব্যস্। অর্ডার কি ফ্যাক্টরী দেখে হয়? অর্ডার তো হয়" বলে মুখে চোখে এমন একটা ইঙ্গিত করল যে, তার অর্থ কিছুটা স্পষ্ট ও কিছুটা ঝাপসা হয়ে আমার কাছে একটা প্রহেলিকার সৃষ্টি হলো।

জিজ্ঞাসা করলেম, "মাল যোগাচ্ছ এত দিন, এর মধ্যে তোমার ফ্যাক্টরী আছে কি নেই সে-খোঁজ হয়নি?"

"হবে না কেন? তিন চার বার ইন্‌সপেকশন হয়ে ভালো রিপোর্ট চলে গেছে। এবারও কি যেতো না? শা—ছোট সায়েব ব্যাটার খাই বেড়েছে এত যে আর মিটাতে পারছিনে। তাই না এ-ঝামেলা। যাক্ পরোয়া করিনে। জানতে পারব সবই।"

"কেমন করে?

"কেন, আপিসের কেরানীরাই খবর দেবে। দেবে না? আরে ভাই দেবে কি আর অমনি? সংসারে বিনিপয়সায় পরহিতার্থে আর কাজ করে কোন শা—? আশী টাকার কেরানী, একসঙ্গে

পাঁচ শ' টাকা দেখেছে এর আগে? খবর তো খবর, দরকার হলে ফাইলকে ফাইল গাপ্ করিয়ে দেওয়ার দাওয়াই পর্যন্ত জানি। এই যে মধুবাবু, আসুন, আসুন। কী খবর? আচ্ছা এক মিনিট বোস্ ভাই, এঁর সঙ্গে একটু প্রাইভেট,—চলুন মধুবাবু বারান্দায়।" সদ্য আগত আগন্তুককে নিয়ে বাইরে গেল সিধু।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে ফিরে এসে বলল, "মোটা হাতে কিছু ঢালতে হবে দেখছি। যাক, পরে পুষিয়ে নেবো।"

বিস্মিত হওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। শুধু জিজ্ঞাসা করলেম, "আচ্ছা এসব কি শেষ পর্যন্ত চাপা থাকে? ডিপার্টমেণ্টের অন্য লোকেরা কি জানতে পারে না?"

"কেমন করে জানবে? এই যে এসেছিলেন ভদ্রলোক, খবর দিয়ে গেলেন কোন সায়েব যাচ্ছে এখান থেকে তদন্ত করতে, কবে যাচ্ছে ইত্যাদি। আপিসে যখন যাব তখন উনি কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন, না কিছু? এমন ভাব দেখাবেন যে, জীবনে এর আগে কখনও আমাকে চোখেও দেখেননি। ব্যস্, তা হলেই হলো। সব কাজেরই সিস্টেম আছে তো?"

একজন বেয়ারা গোটা দুই বিরাট প্যাকেট নিয়ে এসে বলল, ফেল্পস্ কোম্পানী পাঠিয়েছে। সিধু বললে, "ঠিক হ্যায়। কাল দোকানে সওদা করেছি কিছু। তাই পাঠিয়েছে। দেখ্ তো জিনিষগুলি। তোরা মডার্ন টেস্টের লোক, আপ-টু-ডেট ফ্যাশানের খবর রাখিস। হ্যাঁ, সার্ট। এক ডজন। ছাব্বিশ টাকা পনের আনা করে একটা। ওদের সেই পনের আনার কায়দা জানিস তো? পুরা সাতাশ টাকা লিখবে না কিছুতেই। রুমাল। হ্যাঁ, পিরামিড। ডজন সত্তর টাকা। পাওয়া যে যাচ্ছে এই ঢের, সত্তর হলেই কী, আশী হলেই কী? এটাকে কী বলে রে? দেখছি আজকাল আমেরিকান সাহেবেরা পরে খুব। ডাকিন? ডার্কিন নয়? তবে কী? জার্কিন? বর্গীয় জ-য়ে আকার তো?

দোকানে তো আর জিনিষের নাম জিজ্ঞাসা করতে পারিনে! ভাববে কী! কিনলেম তো, কখন পরবো সে পরে দেখা যাবে। দাম বেশী নয়। ছ'শো আশী টাকা। চামড়াটা ভালো কোয়ালিটির।" বিল দেখলাম, আরও খুঁটি-নাটি অনেক কিছু মিলিয়ে সাতশ' টাকার উপরে। সাহেব তার ওয়ালেট খুলে ছ'খানা পাঁচশ' টাকার নোট বেয়ারার হাতে দিল দাম চুকিয়ে দিতে।

চুপ করে স্মরণ করতে চেষ্টা করলেম, এর আগে ঠিক কখন সিধুর গায়ে তালিহীন জামা দেখেছি।

প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করল সিধু। বাল্যবন্ধুর প্রতি তার এই সহৃদয়তা দেখে মুগ্ধ হওয়া উচিত। তার চালচলন দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আমাকে দশ বছর মাইনে-করা কর্মচারী করে রাখার মতো অর্থ আছে তার ব্যাঙ্কে। কিন্তু কর্মচারীর বদলে অংশীদার করতে চাইল। বললে, "আরে ব্যারিস্টর হবি যখন হবি। এখন খবরের কাগজে রিপোর্ট লিখে আর ক'টাকা আসবে? তার চেয়ে আমার সঙ্গে জুটে যা, নেহাৎ মন্দ হবে না। আমারও সুবিধে হবে, চিঠিপত্র লেখা, সায়েব সুবোর সঙ্গে কথাবার্তা বলা তো আমার আসে না।"

হেসে বললেম, "তার দরকার কী? তুমি যা বলছো তাতে কন্‌ট্রাক্ট পেতে ওসবের যে কিছু দরকার আছে তা তো মনে হয় না। তোমার হয়ে তোমার টাকাই কথাবার্তা কইবে।"

"নেহাৎ মিথ্যে বলিসনি। যে-পূজার যে-বিধি তা না হলে কিছুই হয় না। তবে হ্যাঁ, ইংরেজী বলতে কইতে পারে, লিখতে পারে এমন লোক থাকলে আরও সুবিধে। তোকে পেলে আমি এখন যা পাচ্ছি তার ডবল আয় করতে পারি। বলেছিলাম নিত্যানন্দকে। মনে নেই তাকে? সেই যে পুরুত ঠাকুরের ছেলে নিতাই রে। পাঠশালায় একদিন তার পৈতে ছিঁড়ে দিয়েছিলেম। আর কথা কইতে পারে না। কেবলই হাত দিয়ে ইসারা করে

জবাব দেয়। শেষে পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে পৈতে ধার করে কথা বলল। নালিশের ফলে শাস্তি পেলাম দু'ঘণ্টা দুই কানে ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকা। সেই নিত্যানন্দ এখন ডেপুটি হয়েছে। মাঝে কদিন সাপ্লাইর কাজে ছিল। রাস্তা বাতলে দিলেম, কী করলে দু'পয়সা হবে। বলে কিনা, 'সিধু, ছেলেবেলায় ইস্কুলে অনেক অকাজ কুকাজ করেছিস, বড় হয়ে এখন আর করিসনে।' শোন কথা একবার! টাকা উপায় করতে আমি করছি ঠিকাদারী, তুই করছিস চাকরি। যাতে দু'পয়সা উপরি আসে তার চেষ্টা করব, তাতে কুকাজটা কোন্‌খানে? হরিনাম জপতে তুইও বসিসনি, আমিও বসিনি।"

যাক, তবু ভালো। সংসারে তাহলে দু'একটা লোক এখনও আছে যারা ব্যাঙ্কের পাশ বইর উপরে দৃষ্টি রাখাটাই জীবনের চরম মোক্ষ মনে করে না।

সিধু বলল, "হ্যা, লাভটা কী হচ্ছে? ওর সঙ্গে কাজ করতো আর এক অফিসার, সে লেক্ রোডে বাড়ি কিনেছে দু'খানা, গাড়ি কিনেছে। তার বউএর গায়ে হীরার গয়না। আর আমাদের নিত্যানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে বসে আছেন। বাদুড়-ঝোলা হয়ে ট্রামে চেপে আপিসে যায়, ওয়াছেল মোল্লার স্যুট পরে। আহাম্মক এক নম্বরের।"

তাতে আর সন্দেহ কি!

জিজ্ঞাসা করলেম, "আচ্ছা ভাই, যুদ্ধের বাজারে কি অনেস্টি বলতে কোথাও কিছু আর অবশিষ্ট নেই?"

"অনেস্টি? তার মানে সততা? ভায়া হে, ওসব ভালো ভালো কথা যা আমরা ছেলেবেলায় কপিবুকে লিখেছি—না লিখেছি বলা ঠিক নয়; আমি তো লেখাপড়ার ধার ধারতেম না, কেবল মাস্টারের বেতই খেয়েছি—তোরা লিখেছিস। ওসব ছাপার বইতেই থাকে, —ছেলেবেলায় মুখস্থ করতেও মন্দ লাগে না। কিন্তু সংসারে

ওসব ফাল্‌তু। এই বুকে হাত দিয়ে বলছি বোঁচ্‌কা, জানবি, এমন কোন লোকই নেই যাকে কেনা যায় না। দামের কম বেশী নিয়ে কথা। কেরানীবাবুকে দিতে হয় দশ, বড়বাবুকে পঁচিশ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পঞ্চাশ, ইন্‌স্‌পেক্টারকে একশ'। যত বেশী মাইনের অফিসার, তত বেশী তাঁর দক্ষিণা। টাকায় না হয় এমন কাজ নেই তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়তো সোজাসুজি টাকাটা নিতে ভয় পায়। তাদের বেলায় বিলাতী হলে পাঠাবে এক কেস্‌ 'হোয়াইট লেবেল,' দেশী হলে মেয়ের বিয়েতে দেবে বেনারসী শাড়ী।"

সিধুচন্দ্রের ওখানে ডিনার খেয়ে তারই ভাড়াকরা ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরলেম অনেক রাত্রে। অনেকগুলি সিগারেট ভরে দিয়েছিল আমার সিগারেট কেসে! 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট'। শাদা আর কালো। শাদা বাজারে তার দর্শন এখন দুর্লভ। কিন্তু কালো বাজারের অভাব কী? দেশে অভাব কী সিধুচন্দ্রের?

এগারো

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, রাজদর্শনে পুণ্য লাভ। অমাত্যদর্শনেও পুণ্য আছে কিনা জানি না। বোধহয় আছে। নইলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের বাড়িতে প্রত্যহ ভীড় জমে কেন? ভীড় জনতার নয়, আই-সি-এস-এর।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের সুদৃশ্য বাংলোর সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অপরাহ্ণে গৃহস্বামী বসেন বিশ্রম্ভালাপে। হাতের কাছে ছোট টিপাইর উপরে টেলীফোন, সুদীর্ঘ তারের সাহায্যে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কক্ষে প্লাগ পয়েণ্টের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে সুইচ আছে। কে কথা বলেন এবং কী কথা বলেন তার গুরুত্ব বিচার করে সেক্রেটারী সুইচের দ্বারা মনিবের টেলীফোনের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করেন। খান দশ বারো চেয়ার। বেতের। সবুজ রংএর ভালস্পার এনামেলে স্প্রে-পেইণ্ট করা। বাগানে কাঠের চেয়ার ব্যবহার আভিজাত্যের চিহ্ন নয়। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহ সমন্বিত সৌরমণ্ডলের ন্যায় আই-সি-এস-পরিবৃত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরের সান্ধ্য সভাতল। অমাত্যের প্রাত্যহিক আসর। সে আসর গুণীজনের নয়, ধনীজনের।

পরিধানে সাদা শাটিন জিনের ট্রাউজাস ও হাতকাটা হাফসার্ট। টাই নেই, কোটও না। নয়াদিল্লীতে গ্রীষ্মকালে ঐটেই রীতি। আপিস থেকে ডিনার পর্যন্ত ঐ পোষাকই সর্বজনগ্রাহ্য। যাঁরা বয়সে তরুণ, তাঁরা সার্টের বদলে পরেন স্পোর্ট সার্ট। সেটা আরও বেশী স্মার্ট। মোজাহীন চরণে শাদা কাবুলী চপ্পল। আর্মিতে খাকীর মতো সিভিলিয়নদেরও ইউনিফর্ম আছে। সে ইউনিফর্ম লিখিত অনুশাসনের নয়, অলিখিত ফ্যাশনের। ঠিক যেমন বিয়ের বরযাত্রীদের গিলে-করা ধুতি আর সোনার বোতামওয়ালা

পাঞ্জাবি। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বাঙালী, সিন্ধী,—সব আই-সি-এসেরই এক বেশ, এক ভাষা। বলা বাহুল্য, দুটোর একটাও তাদের স্বজাতীয় নয়।

যে-বন্ধুকে কাণ্ডারী করে এই সভার্ণবে প্রবেশ করা গেল, তিনি গভর্ণমেণ্টের একজন পদস্থ অফিসার। প্রৌঢ়, অকৃতদার এবং অত্যন্ত সদাশয়। বহুপরিচিত ব্যক্তি। এমন গৃহ অল্প যেখানে তাঁর গতি নেই, এমন গৃহিণী অল্পতর যাঁর ডিনার পার্টিতে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই।

পুরুষ মাত্রেরই বউ না থাকলে বাতিক থাকে। করো তাস, কারো থিয়েটর, কারো দেশোদ্ধার আর কারো বা সাহিত্য কিম্বা স্বামীজি। এ-ভদ্রলোকের বাতিক পোষাকের। সবচেয়ে ভালো পোষাকের সাহেব,—বেস্ট ড্রেস্‌ড্ ম্যান—বলে নয়াদিল্লাতে তাঁর পরিচিতি। গল্প আছে যে, চার দিনের জন্য একবার হঠাৎ তাঁকে টুরে যেতে হয়। তাড়াতাড়িতে জামাকাপড় বেশী সঙ্গে নেওয়ার অবকাশ না পাওয়াতে মাত্র দুটো ওয়াড্রোব ট্রাঙ্ক ও একটা স্যুটকেশ নিয়েই নাকি তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়। সেগুলির গর্ভে শুধু গোটা পনের স্যুট, দেড় ডজন সার্ট, দশটা টাই ও কুড়িখানা রুমাল ছিল। ভাঁজভাঙা সার্ট বা ক্রীজহীন প্যাণ্ট পরতে দেখেনি তাঁকে কেউ কোন দিন। সকালবেলা গয়লা, খবরের কাগজওয়ালার মতই তাঁর বাড়িতে প্রত্যহ নিয়মিত ধোবা আসে বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, শ্লিপিং স্যুট ও জামা কাপড় প্রেস করে দিতে। বন্ধুরা ঠাট্টা করে পরামর্শ দেন, আপিসে একটা ইলেকট্রিক আয়রন্ রাখতে,—বড় সাহেবের ঘরে ঢুকবার আগে একবার তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা ইস্তিরী করে নিতে পারবেন।

জামাকাপড়ের প্রতি ভদ্রলোকের মনোযোগ আছে, কিন্তু আসক্তি নেই। সুদৃশ্য টাই, মনোরম মাফ্‌লার অকাতরে দান করেন আপন বন্ধুদের। গৃহে সর্বদা আতিথ্যের অকৃপণ আয়োজন। এমন অমায়িক প্রকৃতির লোক সর্বদা চোখে পড়ে না।

ইনি হচ্ছেন সেই স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়দের অন্যতম যাঁদের সাহেব সম্পর্কে কোন দুর্বলতা নেই। একবার বম্বের পথে মাঝ রাত্রিতে এক স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠছিলেন। প্রথম শ্রেণীর কামরায় এক সাহেব দরজা-জানালা বন্ধ করে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। হাঁকাহাঁকিতে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে দ্বার খুলে দেখলেন কালা আদমী। 'ভাগো' বলে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করলেন। কিন্তু এ কালা আদমীটি অন্য জাতের। সাহেব দেখেই পশ্চাদপসরণের পাত্র নন। স্টেশন মাস্টার এসে অন্য গাড়িতে তাঁর জন্য জায়গা করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। সাহেব তো গোটা কামরাটা রিজার্ভ করেনি, সুতরাং ঐ কামরাতেই তাঁর যাওয়া চাই।

এতে সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। একটা নেটিভের স্পর্ধা দেখ একবার! না হয় টাকা আছে, ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটই কিনেছে। কিন্তু তা বলে একেবারে একজন খাস বিলাতী সাহেবের সঙ্গে এক গাড়িতে! মাই ঘড্, ইণ্ডিয়ার হলো কী? সেই আধ ন্যাংটো নেটিং ইন্দুর গ্যাণ্ডীটা কি দিল্লীতে ভাইসরয় হয়েছে? উইলিংডন কি নেই? সাহেব তার চাবুক হাতে নিয়ে গাড়ির দরজা রুখে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখছ চাবুক?"

ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে রিভলভার বের করে বললেন, "দেখছ পিস্তল?"

সাহেব মিনিট খানেক হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর পানে, তার পরে আস্তে আস্তে দোর খুলে দিয়ে নিজের বার্থে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এ-জাতের লোকদেরই সাহেবরা পুলিশের কর্তা হয়ে লাঠিপেটা করেন, হাকিম হয়ে পাঠান জেলে, কিন্তু মনে মনে করেন গভীর শ্রদ্ধা। এদেরই জন্য বিদেশে নিজেকে ভারতীয় বলে পবিচয় দিতে পারা যায় অকুণ্ঠিত চিত্তে।

আর্মির এক কর্নেল কিছুকাল এই ভদ্রলোকের উপরওয়ালা ছিলেন। পাঞ্জাবী হাবিলদার ও সিপাহীদের ধমকিয়ে তিনি চুল

পাকিয়েছেন। জানেন ভারতীয়দের দিয়ে কাজ করাবার ঐ একমাত্র উপায়। সে উপায় প্রয়োগ করলেন একদিন এর উপরে। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধীর ও শান্ত স্বরে বললেন, "কর্নেল, একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলার রীতি এটা নয়। মনে রেখো, তুমি চোখ রাঙালে আমিও পাল্টে চোখ রাঙাতে পারি—ইফ্ ইউ সাউট লাইক ছাট, আই ক্যান সাউট ব্যাক্ টু।" শুনেছি এই কর্নেলই পরে এঁকে নিজের বাড়িতে ডিনার খাইয়েছেন বহুদিন। অসুখ হলে নিজে বাড়ি এসে আরোগ্য কামনা জানিয়েছেন এবং রিটায়ার করার কালে প্রমোশন সুপারিশ করেছেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়!

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরের সান্ধ্য সভায় আলোচনার মধ্যপথে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেম আমরা দু'জনে। বন্ধুর সহায়তায় যথারীতি পরিচিত হলেম গৃহস্বামী ও উপস্থিত পারিষদবর্গের সঙ্গে। সুদৃশ্য গ্লাসে সুস্বাদু পানীয় পরিবেষণ করল উর্দি পরিহিত বেয়ারা। রূপার সিগারেট বাক্স থেকে সিগারেট। গৃহস্বামী নিজে বিরামহীন ধূমপায়ী, ইংরেজীতে যাকে বলে চেইন স্মোকার। একটা নিঃশেষ হতেই বাক্স থেকে আর একটা ঠোঁটে চাপেন। কে আগে তাতে দেশলাই জ্বেলে অগ্নি সংযোগ করতে পারেন, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি।

বিলাতপ্রত্যাগতদের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে এ দেশে। তার উপরে বিলাতী সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে তো কথাই নেই। মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য মহোদয় অমায়িক আচরণ ও অজস্র ধন্যবাদের দ্বারা প্রচুর আপ্যায়ন করলেন!

খণ্ডিত আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে বোঝা গেল, বিষয়টি নয়াদিল্লীর গ্রীষ্মাধিক্য ঘটিত। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ন্যায় ভারত গভর্নমেণ্টেরও বার্ষিক শৈলযাত্রা আছে। এপ্রিলের গোড়াতে দপ্তর স্থানান্তরিত হয় সিমলা পাহাড়ে। শরৎকালে উল্টা রথে প্রত্যাগত হয় দিল্লীতে। বছরে দু'বার করে সিমলার কার্ট রোড

আর নয়াদিল্লীর পাহাড়গঞ্জের পথে গোরুর গাড়ি বোঝাই বাক্স পেটারা, লটবহরের মিছিল দেখা যায়। এই প্রথম শৈলবিহার স্থগিত হয়েছে সরকারী হুকুমে।

নবনিযুক্ত অস্থায়ী সেনাপতি জেনারেল মোলস্‌ওয়ার্থ দাবি করেছেন, এবার সিমলা যাওয়া চলবে না। গরমে জাপানীদের সঙ্গে সৈন্যেরা বর্মার বনে জঙ্গলে লড়তে পারে, আর সেক্রেটারিয়টের সিভিলিয়ান সাহেবরা একটু গরমও সইতে পারবেন না? এত বাবুয়ানায় যুদ্ধ জেতা যায় না।

আর্মির প্রয়োজনের উপরে কথা নেই। সুতরাং সেইটেই শিরোধার্য করতে হয়েছে নিতান্ত অনিচ্ছুক চিত্তে। সেক্রেটারী সাহেবরা বিচলিত—উঃ বাবা, মার্চের শেষেই যা গরম, মে-জুনে না জানি কতই বেশী হবে!

ডেপুটি সেক্রেটারীরা বেশীর ভাগই ভারতীয়। কাজেই তাঁরা এক ধাপ উপরে উঠে বলেন, "বেশী? মে-জুন মাসে মেডিক্যাল লীভ নিয়ে পালাতে হবে।"

তাঁদের স্ত্রীরা আরও সাংঘাতিক। স্বামীরা আপিসে চলে গেলে দুপুর বেলা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করলেন, "শুনেছ ভাই, নতুন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কীর্তি? গরমে নাকি এবার দিল্লী থাকতে হবে। মাই গুড্‌নেস। তার চেয়ে চলো আমরা মেয়েরাই না হয় সিমলাতে গিয়ে মেস্‌ করে থাকি, ওঁরা থাকুন দিল্লীতে গরমে সেদ্ধ হয়ে মরতে!"

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর জিজ্ঞাসা করলেন, "গরম কি এখানে খুব বেশী হয়?"

একজন অমনি বললেন, "ভয়ানক! থাকতেই পারবেন না এখানে।"

আর একজন বললেন, "গরমে গায়ে ফোস্কার মতো হয় অনেকের।"

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, "এপ্রিল থেকেই তো লু চলবে।" 'লু' মানে গরম হাওয়ার ঝড়।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর বললেন, "তা দেখুন, সেক্রেটারিয়টের ঘরগুলি সবই এয়ার-কণ্ডিস্‌ন্‌ড্। দুপুর বেলা সেখানেই থাকব। এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে বোধ হয়।"

চতুর্থ জন, যিনি এতক্ষণ কিছু বলার সুবিধা না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বললেন, "তা নিশ্চয়ই যাবে। গরমে কি আর দিল্লীতে লোক থাকে না?"

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর রাত্রিতে তো লু বইবে না।"

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, "যা বলেছেন সার, রাত্রিগুলি সব সময়েই ঠাণ্ডা থাকে। তা ছাড়া এইচ-এমদের বাংলোতে একটা করে ঘর এয়ার-কণ্ডিস্‌ন্‌ড্ করে দেওয়া হবে। এমন কিছু কষ্ট হবে না।"

'এইচ-এম' মানে—অনারেবল মেম্বর বা মিনিস্টার। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের ঐ সংক্ষিপ্ত নামেই উল্লেখ করা হয় সরকারী মহলে।

প্রথম বক্তা, যিনি গরমের আতিশয্য নিয়ে এতক্ষণ বাগবিস্তার করেছিলেন, অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। চতুর্থ ব্যক্তির কথাগুলি তাঁরই বলা উচিত ছিল। না বলতে পারায় মনে তীব্র অনুশোচনা ঘটল। চতুর্থ ব্যক্তি বলেছে বলে তাঁর উপরে রীতিমতো ক্রুদ্ধ হলেন। মনে মনে বললেন, কেবল খোসামুদি! এইচ-এম যেই বলেছেন, গরম এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে, অমনি একেবারে প্রমাণ করার চেষ্টা যেন গরমটা কিছুই নয়! হাম্‌বাগ কোথাকার! নিশ্চয় জানি, এইচ-এম দিল্লী থাকা অপছন্দ করলে উনি তখন উল্টো সুর গাইতেন! লোকটা যে একেবারে মোসাহেব প্রকৃতির এবং তিনি নিজে যে কোনো কালেই এমন নির্লজ্জ

চাটুকারিতা করতে পারতেন না, এ বিষয়ে মনে মনে নিজেকে আশ্বাস দিয়ে অনেকটা আরাম বোধ করলেন।

গরম থেকে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে এইচ-এম সুরু করলেন সরকারী কাজকর্মের কথা। কাউন্সিলের কাহিনী। কী ভাবে ইংরেজ সহকর্মীদের ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিহত হয়, তাঁর প্রখর দূরদৃষ্টির ফলে কোথায় কখন গভর্নমেণ্টে দেশের স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তারই সালঙ্কার বর্ণনা।

দেখা গেল, এবিষয়ে শ্রোতাদের কাছে অধিক বলার প্রয়োজন ছিল না। তিনি না বলতেই তাঁরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। এইচ-এম না থাকলে অভাগিনী ভারতমাতার যে কী দারুণ দুর্গতি ঘটতো সে কথা কল্পনা করে দু'-একজন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। প্রায় অশ্রু-বরিষণের উদ্যোগ।

কান টানলেই মাথা আসে। দেশের কথা তুললেই কংগ্রেস। এইচ-এম কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিস্ফলা নীতির নিন্দা করে বললেন, "শুধু জেলে গেলেই দেশ স্বাধীন হয় না।" কী করে হয় তা স্পষ্টতঃ না বললেও সংশয়ের অবকাশ রইল না যে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের প্রচেষ্টা দ্বারাই তা হয়। এ বিষয়েও পারিষদদলের মধ্যে বিন্দুমাত্র মতদ্বৈধ নেই।

এইচ-এম বললেন, তিনি অত ভাবনা চিন্তার ধার ধারেন না, মুহূর্তে মন স্থির করেন। অমনি অনুমোদন শুনলেন, "সার, ভাবনা চিন্তা দেশে অনেক হয়েছে, এখন ঝাঁপিয়ে পড়াই দরকার।"

এইচ-এম সংশোধন করলেন, "অবশ্য আগের ভাগে না ভেবে-চিন্তে হঠাৎ একটা কিছু করে বসাও আবার ঠিক নয়।"

"তাতে আর সন্দেহ কী সার, না ভেবে কাজ করার নাম তো হঠকারিতা," একই ব্যক্তি বলেন অম্লান বদনে।

পরবর্তী সপ্তাহে এক ডিনারের নিমন্ত্রণ স্বীকারান্তে এইচ-এমকে বিদায় সম্ভাষণ পূর্বক নিষ্ক্রান্ত হলেম পথে। সঙ্গী ভদ্রলোক

জানালেন, তাঁর এক বন্ধু নাকি চমৎকার চাটুচাতুর্যপরায়ণ এই পারিষদদলের নব নামকরণ করেছেন 'হেঁহেঁ সংঘ'। নামটা সার্থক সন্দেহ নেই।

আসল কথাটা বোঝা কঠিন নয়। এরা আই-সি-এস। দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে স্বর্গোদ্‌ভূত চাকুরে—হেভেন্‌বর্ন সার্ভিস। সিজার পত্নীর সতীত্বের মতো এদের যোগ্যতাও প্রশ্নের অতীত। ভবিষ্যৎ অবারিত এবং ক্ষমতা সীমাহীন। এরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। তাই আজ যিনি বিহারের অখ্যাত মহকুমার এ্যাসিস্টেণ্ট কালেক্টর, কাল তিনি করাচী পোর্টট্রাস্টের চেয়ারম্যান, পরশু তিনি কনট্রোলার অব ব্রডকাস্টিং, পরদিন ডিরেক্টার-জেনারেল অব আর্কিওলজি এবং তার পরের পরদিন গভর্নমেণ্টের এ্যাগ্রিকাল-চারেল কমিশনার। তাঁরা জানেন, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরকে খুশী রাখতে পারলে পদোন্নতি দ্রুত হয়। তাই কেউ সস্ত্রীক এসে এইচ-এমকে নিয়ে যান সিনেমায়, কেউ নিমন্ত্রণ করেন ডিনারে, কেউ সকালে বিকালে হাজিরা দিয়ে প্রত্যেক কথায় করেন হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ! 'হেঁ হেঁ সংঘের' সদস্য হতে চাঁদা দিতে হয় না, শুধু যথাস্থানে হাজিরা দিতে হয়।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অপূর্ব সৃষ্টি। এর মোট সংখ্যা এগারো শ'র কাছাকাছি, তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক ভারতীয়। পরাধীন জাতির মধ্য থেকেই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক সংগ্রহ করার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই সার্ভিস। স্ফীত বেতন এবং লোভনীয় পেন্সনের আকর্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আকৃষ্ট করেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট। তরুণ সম্প্রদায়ের সর্বোত্তম নিদর্শন বেছে নিয়ে নিয়োজিত করেন শাসনকার্যে, যে-শাসন দেশের দাসত্বকে করে দৃঢ়মূল দারিদ্র্যকে করে ক্রমবর্ধমান এবং জাতীয় আন্দোলনকে করে বিঘ্নসঙ্কুল।

অসাধারণ মোহ আছে ইংরেজী বর্ণমালার তিনটি অক্ষরে। I. C. S. নামের পিছনে তাদের অবস্থিতি দ্বারা সাহেব হলে

বোঝায় যে, লোকটা পাবলিক স্কুলের ছাত্র, অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজের পাশ এবং কঠিন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। একটি ভারতীয় ভাষা শিখেছে, ওভারসিজ এলাউয়েন্স পায়, চাকরি সুরু করেছে এ্যাসিস্টেণ্ট কালেক্টর রূপে এবং শেষ করবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর বা প্রাদেশিক গভর্নর হয়ে। পাঁচ শ' টাকায় আরম্ভ, ছয় কিম্বা আট হাজারে শেষ। ষাট বছর বয়সে এক হাজার পাউণ্ড পেন্সন নিয়ে ইংল্যাণ্ড বা রিভেয়ারাতে বাড়ি, নিশ্চিন্ত অবসর এবং ভারতবর্ষের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা।

ভারতীয় হ'লে বোঝাবে,—উচ্চ বংশ, কলেজে ভালো ফল, পুলিশের সন্দেহাতীত, স্বদেশীর স্পর্শলেশশূন্য, নিষ্কলঙ্ক ছাত্রজীবন, বিলাতের প্রতি ভক্তি এবং চাকরিতে বিচার বিভাগের বদলে এক্সিকিউটিভ বিভাগে কায়েমীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। এঁদের জন্যই বারোয়ারী পূজার মণ্ডপে চেয়ারের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণী সভার সভাপতিত্ব, মাসিক পত্রিকায় অপাঠ্য গল্প রচনার সুযোগ এবং অনূঢ়া বয়স্থা কন্যার উদ্বিগ্না জননীদের আকুলি বিকুলি।

চল্‌তি কথায় এঁদের বলা হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কাঠামো, স্টীলফ্রেম। এঁদের মধ্যে এমন হু'চার জন লোক ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁরা পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় ও কর্মশক্তিতে যে কোন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান-গ্রহণের অধিকারী। তাঁরা ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করেছেন, ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতি আলোচনা করেছেন, ভারতবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেছেন, সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন করেছেন এবং সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা— ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের গোড়াপত্তন করেছেন! জাতীয়তাবাদের গুরু সুরেন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দ এবং বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র এই সিভিল সার্ভিসেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে বা হতে হতে ছিট্‌কে পড়েছিলেন।

কিন্তু ব্যতিক্রমের দ্বারাই তো নিয়মের প্রমাণ হয়। বেশীর ভাগ আই-সি-এসরাই নিতান্ত সাধারণ, ইংরেজীতে যাকে বলে মিডিওকর। তাঁরা লেখার মধ্যে লেখেন ফাইল, পড়ার মধ্যে পড়েন গেজেট এবং আলোচনা করেন ফার্লো, প্রমোশন বা রিটায়ারমেণ্ট। অন্তিমে নিজের জন্য নাইটহুড, স্ত্রীর জন্য বুইক গাড়ি ও ছেলের জন্য ইম্পিরিয়াল সার্ভিস তাঁদের চরম উচ্চাভিলাষ।

ইংরেজীতে বলে, কামানের চাইতে সোনার দাম কম। বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিতদের অসন্তোষ ঠেকিয়ে রাখবার অমোঘ অস্ত্র, তাঁদের শাসনযন্ত্রের অঙ্গীভূত করা। সে-তথ্য জানা আছে ইংরেজের। এগারো শ' আই-সি-এসের জন্য ভারতের রাজস্ব থেকে খরচ হয় বছরে আড়াই কোটি টাকা। প্রতি আড়াই লক্ষ ভারতীয়ের মাথার উপরে আছে একজন আই-সি-এস, প্রতি ৮৬৮ বর্গ মাইল এলাকার আধিপত্যে। প্রচুর অর্থ, প্রভূত প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক পরিবেশের ফলে একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হন তাঁরা। দেশের দায় বিমুক্ত, দশের থেকে বিযুক্ত। আই-সি-এস একটা পেশা নয়, আই-সি-এস একটা জাত। হোলি রোম্যান এম্পায়ার যেমন না ছিল হোলি, না ছিল রোম্যান এবং না বলা যায় এম্পায়ার; ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসও তেমনি ইণ্ডিয়ান নয়, সিভিল তো নয়ই এবং সার্ভিসের বাষ্প মাত্র নেই তাতে।

বারো

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস দিল্লী পরিত্যাগ করলেন।

আগের দিন সন্ধ্যায় দিল্লী বেতার-কেন্দ্র থেকে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে এক বেতার-বক্তৃতায় তিনি ক্রীপস দৌত্যের ব্যর্থতা ও কারণ বর্ণনা করলেন। বেতার-বক্তারূপে একমাত্র লণ্ডন টাইমসের ভূতপূর্ব সম্পাদক উইকহ্যাম স্টীড্ ছাড়া সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বোধহয় ক্রীপসের জুড়ি নেই। অপূর্ব তাঁর বাচনভঙ্গী, অসাধারণ তাঁর কণ্ঠ। পরিতাপের কথা, সে দক্ষতা তিনি প্রয়োগ করলেন ভারতবর্ষের, বিশেষ করে কংগ্রেসের অযথা অপবাদকীর্তনে। ইচ্ছাকৃত সত্যগোপন বা সত্যের বিকৃতি সাধন, ভিত্তিহীন অভিযোগ, পরস্পর-বিরোধী উক্তি এবং কুযুক্তির দিক দিয়ে তাঁর এ বেতার-বক্তৃতাটি রাজনৈতিক অপভাষণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহবণ হয়ে থাকবে ইতিহাসে।

সমগ্র বক্তৃতাটি এক ক্ষমতাগর্বিত ব্যক্তির আহত অভিমান ও দুর্বলের প্রতি অবজ্ঞার অভিব্যক্তি। আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তি ধনী আত্মীয়ের কৃপামিশ্রিত মুষ্টিভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে দাতার মনে যে ক্রোধের সঞ্চার হয়, সার স্ট্যাফোর্ডের কণ্ঠে তারই পরিচয় ছিল।

ক্রীপস বললেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে প্রবল মতবিরোধ বর্তমান, একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থ ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তার একটা সমাধান করতে চেয়েছিলেন। শ্রোতারা বিস্ময়ে চক্ষু মার্জনা করে ভাবল, এডলফ্ হিটলারের বক্তৃতা শুনছি না তো? তিনিও তো বলেন, তিনি চিরকাল শান্তি চেয়েছিলেন!

চাকরি বণ্টন, পৃথক নির্বাচন, রাজনৈতিক সুবিধাদান প্রভৃতি একাধিক উপায়ে এদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছেন এবং

মতবিরোধকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই নাকি মধ্যস্থতা করতে চান। পরিহাস আর কাকে বলে ?

ক্রীপ্‌স বললেন, যুক্তিশীল ব্যক্তিরাই স্বীকার করবেন যে, যুদ্ধের এ দুঃসময়ে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব নয়। যেন ভারতীয় নেতৃবর্গ এ-কথা স্বীকার করেনি! তাঁরা চেয়েছিলেন শুধু প্রকৃত ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি সাময়িক জাতীয় গভর্নমেণ্ট, যুদ্ধের এ দুঃসময়েই যার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সে-গভর্নমেণ্ট গঠিত হবে, সে-গভর্নমেণ্টকে একটি স্বাধীন দেশের মন্ত্রিসভার সম-মর্যাদা দান করা হবে এবং অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী বড়লাট একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার ন্যায় এ-গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে বাধ্য থাকবেন, নিজ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা তাকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না,— এই ছিল জননেতাদের দাবি। নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কোনো কথাই ছিল না।

কংগ্রেসের প্রতি ক্রোধটাই সবচেয়ে বেশী। বললেন, জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনের দাবি দ্বারা কংগ্রেস সকল ক্ষমতা আত্মসাতের প্রয়াসী, দেশের ডিক্টেটর হওয়ার বাসনা সংখ্যাগরিষ্ঠদল কংগ্রেসের। অথচ এগারোই এপ্রিল তারিখের লেখা চিঠিতে মৌলানা আজাদ ক্রীপসকে লিখেছেন, কংগ্রেস দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনে ইচ্ছুক ছিলেন, এ ধারণার উপরে ভিত্তি করেই সমস্ত আলাপ আলোচনা চলেছে। জাতীয় গভর্নমেণ্টের সদস্য সংখ্যা, বিভিন্ন দলের অংশ ইত্যাদির প্রশ্ন পরে নিশ্চয়ই আলোচিত হতো। কংগ্রেস নিজে ক্ষমতা লাভের জন্য ব্যাকুল নয়, কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত হোক, এই তার দাবি।

দেশরক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে দেওয়ার আপত্তি সম্পর্কে ক্রীপস বললেন, ভারতবর্ষ রক্ষার দায়িত্ব ব্রিটেনের এবং মিত্রশক্তি

আমেরিকার প্রতি ব্রিটেনের যে কর্তব্য তা পরিহার করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের সময় প্রধান সেনাপতির কর্তৃত্বে কারও হস্তক্ষেপ যুদ্ধজয়ের অনুকূল নয়। কংগ্রেস সভাপতি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, প্রধান সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের কোনো অভিপ্রায় ছিল না কংগ্রেসের। বরং সমরমন্ত্রী হিসাবে তাঁর হাতে আরও অধিকতর কর্তৃত্ব অর্পণে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দেশরক্ষার চরম দায়িত্ব থাকবে দেশেরই একজন প্রতিনিধির হস্তে। তা না হলে স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকে না।

জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাকার্থারের হাতে। তা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ার দেশরক্ষা সচিব অস্ট্রেলিয়ানই; মার্কিন বা ইংরেজ নয়,—এ-দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন কেউ কেউ। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যুক্তিকে শ্রদ্ধা করেন এমন নজীর নেই।

সবচেয়ে হাস্যকর উক্তি করলেন সার স্ট্যাফোর্ড জাতীয় গভর্নমেণ্টের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে। তিনি বললেন, "কংগ্রেস এমন একটি জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করতে চায়, যার উপরে বড়লাটের বা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। একবার ভেবে দেখা যাক তার মানে কী। অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভারতের গভর্নমেণ্ট এমন কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হবে, যাঁরা কোনো আইনসভা বা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়ী নন, যাঁদের কেউ কখনও নড়াতে পারবে না।" কী সাংঘাতিক কথা। সত্যি তো। এ তো কোনো মতেই হতে দিতে পারা যায় না। আইনসভা, নির্বাচকমণ্ডলী, এবং জনসাধারণের কাছে দায়ী ও পরিবর্তনযোগ্য গভর্নমেণ্টের একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম নমুনা তো আছে আমাদের বর্তমান বেন্থল-ম্যাক্সওয়েল-নূন-ওসমান-রামস্বামী পরিবৃত পরম করুণাময় লর্ড লিনলিথগোর গভর্নমেণ্টে!

বেতার-বক্তৃতার উপসংহারে ক্রীপস জাপানের বিরুদ্ধে

ভারতীয়দের প্রতিরোধশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অনেক উদ্দীপনাময়ী উক্তি করলেন—"ঝুঁকি নিতে হবে, নতুন পরীক্ষা করতে হবে, পুরাতন মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে হবে" এমনি সব ভালো ভালো কথা।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যারিস্টর বলে সার স্ট্যাফোর্ডের খ্যাতি আছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এ-সকল উক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও অসঙ্গতি তাঁর মতো ব্যবহারজীবীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। "ঝুঁকি নিতে হবে।" ঠিক কথা। তবে সেটা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে নয়—নিতে হবে পদানত নিপীড়িত ভারতীয় জনসাধারণকে। "নতুন পরীক্ষা করতে হবে।" অথচ ভারতবর্ষে বহাল থাকবে সেই সনাতন স্বৈরশাসন। "পুরাতন মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে হবে।" শুধু ভারত সম্পর্কে নয়! এই হলো ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক ভারতবন্ধু সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস কথিত সুসমাচার!!

বিলাতের ন্যাশন্যাল গভর্নমেণ্টের অনুরূপ অস্থায়ী যুদ্ধকালীন গভর্নমেণ্ট গঠিত হবে, এই ভিত্তিতেই মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহরু ক্রীপস প্রস্তাবের আলোচনা করেছেন। পরে দেখা গেল, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলেরই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাড়া আর কিছুতেই রাজী নন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। কখনও কোনো আলোচনায় ক্রীপস যে ন্যাশন্যাল গভর্নমেণ্টের আভাসমাত্র দিয়েছেন এমন কথাও স্বীকার করলেন না তিনি। অথচ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পুনর্গঠন বা তাতে যোগ দেওয়া-না-দেওয়া নিয়ে তিন সপ্তাহ আলোচনা করবেন মৌলানা আজাদ বা পণ্ডিত জওহরলাল, একথা একমাত্র উন্মাদ বা বিশেষ অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া নিশ্চয়ই আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি জোরের সঙ্গে বললেন, ক্রীপস ক্যাবিনেট গভর্নমেণ্টের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ক্রীপস তা বেমালুম অস্বীকার করলেন। যদিও সাংবাদিকদের মধ্যে যাঁরা ২৩শে মার্চের

প্রেস কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই সাক্ষ্য দেবেন যে, সেখানেও ক্রীপস এই ন্যাশন্যাল গভর্নমেন্টের কথাই বলেছিলেন।

কংগ্রেস নেতৃবর্গ একটি অতি মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁরা ক্রীপস-আলোচনার কোন লিখিত ও অবিসংবাদিত দলিল রাখেন নি। বিলাতে ব্যবসায়ীদের দেখেছি, কোন বিশেষ লেন-দেন বা চুক্তি সম্পর্কে দুই ব্যক্তির মধ্যে আলোচনার একটি পরস্পরের অনুমোদিত লিখিত বিবরণ থাকে। আলোচনার পরে একজন আলোচনার সমুদয় বিবরণ একটি পত্রে লিপিবদ্ধ করে অন্যজনের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি হয় ঐ পত্রে বর্ণিত বিবরণ যথার্থ বলে অনুমোদন করেন, নয় তো ভ্রম-নির্দেশ করেন। এ ব্যবস্থায় দুই পক্ষের মৌখিক আলোচনায় কোনো সময় একে অন্যের উক্তি বা মনোভাবকে ভুল বুঝলে অবিলম্বে তার সংশোধন হয়। চল্লিশ কোটি নরনারীর ভাগ্য নিয়ে যেখানে আলোচনা চলছে, সেখানে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন সাবধানতা অবলম্বন করেন নি—এ শুধু আশ্চর্য নয়, বালকোচিত অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় সেদিনকার আলোচনার ধারা একটি পত্রে গ্রথিত করে তাতে ক্রীপসের অনুমোদন-স্বাক্ষর রাখলে পরে পরস্পরের প্রতি এই অসত্য ভাষণের দোষারোপ করার অবকাশ ঘটত না।

মৌলানা আজাদ তাঁর শেষ দীর্ঘ চিঠিতে বলেছেন, দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস ও ক্রীপসের মধ্যে আলোচনা যতই এগিয়ে চলেছে, ব্রিটিশ মনোভাবের ততই ক্রমিক অবনতি ঘটেছে। এ মন্তব্য অহেতুক নয়। ব্রিটিশ প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আগমন ও ভারত পরিত্যাগের মধ্যে ক্রীপসের চরিত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে।

ক্রীপসের এই ব্যর্থতার এবং এই পরিবর্তনের কারণ কী, তা নিয়ে বহু অনুমান, বহু সংশয়, বহু গবেষণার অবকাশ আছে।

ব্যর্থতার সমুদয় দায়িত্ব ক্রীপসের নয়। লর্ড লিনলিথগো ক্রীপস দৌত্যের সাফল্য কামনা করেন নি, একথা অনুমান করা কঠিন নয়। যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে একাধিক বার ভারতীয় জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহের তিনি ভার নিয়েছিলেন। ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং তাঁর দ্বারা যা সম্ভব হয় নি, অন্য কোনো ব্যক্তির প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে একজন শ্রমিকদলের সদস্য দ্বারা তা সম্ভব হবে এটা তাঁর পক্ষে রুচিকর নয়। ব্যক্তিগত মতবাদে লর্ড লিনলিথগো একজন কনসার্ভেটিভ ডাই-হার্ড সে কথা অবিদিত নয় কারো কাছে।

জঙ্গীলাট আর্চিবল্ড ওয়েভেল একজন ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন কিনা তাও জানার উপায় নেই। ওয়েভেল বর্তমানে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তাঁর সমরনৈপুণ্যের উপরে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অবিচলিত আস্থা। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে তার সামরিক ব্যাপারে ওয়েভেলের অননুমোদিত কোন ব্যবস্থায় সম্মত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সাধারণের ধারণা এই যে, লণ্ডন থেকে টেলীফোনযোগে সার স্ট্যাফোর্ডকে সতর্ক করে দেওয়া হয়, তিনি যেন ওয়ার ক্যাবিনেটের লিখিত প্রস্তাবের বাইরে আর এক পা-ও না যান। ভারতবর্ষ সম্পর্কে চার্চিল ও এমারীর মনোভাব এতই সুপরিচিত যে, এ অনুমান একেবারে অমূলক মনে হয় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগনে ক্রীপস ছিলেন একান্ত নিষ্প্রভ। শ্রমিক দলের সঙ্গেও সে সময়ে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের শেষভাগে তিনি ভারতবর্ষে এলেন। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করলেন, বিভিন্ন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেন, পণ্ডিত জওহরলালের অতিথিরূপে পুংখানুপুংখরূপে অনুসন্ধান করলেন এদেশের জাতীয় আন্দোলন ও তার ধারা সম্পর্কে।

ভারতবর্ষ থেকে ক্রীপস গেলেন চীনে। চীন থেকে রাশিয়া হয়ে ইংলণ্ডে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, চেম্বারলেন গভর্নমেণ্টের তখন পতন ঘটেছে, প্রধানমন্ত্রীরূপে চার্চিল গঠন করেছেন নতুন কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট। রাশিয়া ও ব্রিটেনের বৈদেশিক সম্পর্ক সে সময় মধুর নয়, অথচ একমাত্র রাশিয়ার সঙ্গে মিতালির দ্বারাই য়ুরোপে হিটলারের প্রতিরোধ তখন সম্ভব। কে ভার নেবে রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে মৈত্রী সাধনের? ক্রীপসের নাম প্রথম কে প্রস্তাব করেছিলেন তা জানার উপায় নেই। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন পরিত্যাগ করে রাজনীতিক্ষেত্রে বিস্মৃতপ্রায় ক্রীপস অকস্মাৎ একদিন প্রবেশ করলেন ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বোধ হয় বললেন, মস্কো পছন্দ কর তুমি, সেখানে ব্রিটিশ রাজদূত হয়ে যাও। ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতার বন্ধন স্থাপন করা চাই। এখনই রওনা হও। ফর্ গডস্ সেক।

ক্রীপস রাশিয়ায় গেলেন এবং অসাধ্য সাধন করলেন। ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে তিনি হৃদ্যতার সৃষ্টি করলেন, যা ইতিপূর্বে প্রায় অসম্ভব বলে গণ্য হয়েছে। মস্কো ও কুইবাইসেভে নিজ কর্তব্য সমাধান করে ১৯৪২ সালে যখন ইংলণ্ডে ফিরলেন ক্রীপস, তখন তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দুইই অপরিসীম। চার্চিল তাঁকে তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলে গ্রহণ করলেন।

ভারতীয় সমস্যার তিনি একটা সন্তোষজনক মীমাংসা সাধনে সক্ষম হবেন, এ বিশ্বাস ক্রীপসের ছিল। ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রস্তাব যে ভারতীয় জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম, একথা কি তিনি বোঝেন নি? তা হলে তাঁর বহু-বিজ্ঞাপিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, গান্ধীজি প্রথম সাক্ষাতের দিনে ক্রীপসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই প্রস্তাব নিয়ে তুমি ভারতবর্ষে এলে কেন?" উপদেশ দিয়েছিলেন, "এর বেশী আর কিছু

যদি তোমার দেবার ক্ষমতা না থাকে, তবে ফির্‌তি বিমানে দেশে ফিরে যেতে পার।"

ক্রীপস নিশ্চয়ই জানতেন ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাঁর আশা ছিল, ভারতীয় জননেতাদের সঙ্গে তাঁর যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ বর্তমান, তারই সহায়তায় তিনি তাঁদের সম্মতি লাভ করবেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবর্গ শিশু নন; ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগের প্রশ্নকে তাঁরা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে দেননি।

বোধ হয় ক্রীপসের আশা ছিল, অকুস্থলে অবস্থানকারী—ম্যান অন্ দি স্পট—হিসাবে তিনি প্রস্তাবগুলির কিছু কিছু সম্প্রসারণের ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারবেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে। চার্চিল তাঁকে নিরাশ করলেন। দু'দিক দিয়েই তিনি বিফল-মনোরথ হলেন।

নিজের মতবাদে অবিচলিত ও সততায় একনিষ্ঠ ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন, ভারতীয়দের দাবী ন্যায়সঙ্গত। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মনোভাব আপোষের অনুকূল নয়, তাঁদের আন্তরিকতা সন্দেহজনক। ক্রীপস তা করলেন না। তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সমর্থন করে কংগ্রেসের প্রতি কটূক্তি করলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এই চরম সঙ্কটকালে ক্রীপস ন্যায়-নীতি অপেক্ষা মন্ত্রিসভার নিজ সহকর্মী ও প্রধানের প্রতি আনুগত্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন। ব্রিটিশজাতির প্রয়োজনে তিনি অপভাষণের আশ্রয় নিলেন। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সমাজতন্ত্রী সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস আত্মহত্যা করলেন।

চার্চিল জয়লাভ করলেন। শুধু ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার প্রচেষ্টায় নয়, নিজ সম্ভবপর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ধ্বংস সাধনেও পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করলেন তিনি।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ চার্চিলের প্রধানমন্ত্রিত্বে সুখী ছিল না। বিভিন্ন রণাঙ্গনে একটির পর একটি করে পরাজয় পার্লামেন্টের

সদস্যদের বিচলিত করে তুলছিল। তাঁরা তীব্র ভাষায় চার্চিল গভর্ন-মেণ্টের অক্ষমতার আলোচনা করেন। কিন্তু চার্চিলকে অপসারিত করেন না। তার কারণ চার্চিলের প্রতি শ্রদ্ধা বা আস্থা নয়। একান্ত নিরুপায় তাঁরা, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই ইংলণ্ডে।

রাশিয়ায় অভাবিতপূর্ব সাফল্য ক্রীপসকে যে-সম্মান ও খ্যাতি দিয়েছিল, তাতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর প্রতি। কেউ কেউ বলতে সুরু করল, ইংলণ্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস। ভারতীয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে পারলে ক্রীপসের যোগ্যতায় ব্রিটিশ সর্বসাধারণের আস্থা গভীর হতো, চার্চিলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজনীতিতে ক্রীপসের প্রভাব হতো অনন্য-সাধারণ। ওয়ার ক্যাবিনেটের এ শূন্যগর্ভ প্রস্তাব দিয়ে চার্চিল ক্রীপসকে ভারতে পাঠালেন, কারণ তিনি নিশ্চিত জানতেন গান্ধীজি, আজাদ ও নেহরু কখনও গ্রহণ করবেন না এ প্রস্তাব।

ক্রীপস ব্যর্থকাম হলেন। চার্চিলের প্রধান মন্ত্রিত্ব নিবিঘ্ন হলো। রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপসারণের একাধিক উপায় আছে। স্ট্যালিন তাদের হত্যা করেন বন্দুকের গুলীতে, চার্চিল তাদের নিঃশেষ করেন কূটনৈতিক চালে। সোস্যালিস্ট ক্রীপস ইম্পিরিয়লিস্ট টোরিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ রাজনীতিতে নিজ হাতে নিজ মৃত্যুদণ্ড স্বাক্ষর করলেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে।

রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল এক বন্ধুগৃহে। ভদ্রলোক কলকাতার এক নামজাদা সাহেব কোম্পানীর কভেনাণ্টেড সার্ভিসের লোক, শ্বেতাঙ্গ পরিচালক গোষ্ঠীতে একমাত্র বাঙালী অফিসার। প্রচুর বেতন, প্রভূত প্রতাপ। যুদ্ধের প্রয়োজনে গভর্নমেণ্ট সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে নিয়ে এসেছেন আরও বেশী পারিশ্রমিক দিয়ে। নিজের কোম্পানীতে 'লিয়েন' আছে। যুদ্ধ শেষ হলে সেখানে ফিরে গিয়ে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবেন পূর্বগৌরবে।

নিমন্ত্রিতের সংখ্যা জন দশেক। একমাত্র আমিই একক। বাকি

সবাই যুগলে ;—মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস। ডিনার ন'টায়, কিন্তু নিমন্ত্রিতেরা সাড়ে সাতটার মধ্যে সবাই উপস্থিত। ড্রয়িংরুম তাঁদের হাস্য, পরিহাস ও আনন্দকলরবে মুখরিত হয়ে উঠল।

আমাদের প্রাচীন ভোজনসভাগুলির সঙ্গে এই ডিনার পার্টিগুলির প্রভেদটা সুস্পষ্ট। তফাৎটা শুধু আসন পেতে আহার ও ছুরি কাঁটায় খাওয়ার মধ্যে নয়। আমাদের ভোজন আয়োজনগুলি মূলতঃ সামাজিক ক্রিয়া কর্ম সম্পর্কিত। মেয়ের বিয়ে, ছেলের উপনয়ন, নাতনীর ভাত কিম্বা ব্রত, পার্বণ উপলক্ষ্য করে আমাদের নিমন্ত্রণ। তাতে লোক ডাকতে হয় আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতার সূত্র ধরে, হৃদ্যতার বিচার করে নয়। সুতরাং সংখ্যা হয় অপরিমিত। ছাদের উপর সামিয়ানা টাঙিয়ে তার নীচে এক সঙ্গে আসন পড়ে সত্তর কিম্বা আশী। মেয়েদের জন্য শয়নগৃহের খাট-পালঙ্ক বের করে খাবার জায়গা। এতেও এক বারে সমাধা হয় না সমুদয় নিমন্ত্রিতের আহার। বাড়ির সিকি মাইল দূর থেকে টের পাওয়া যায় কলকোলাহল।

ইংরেজী ডিনারে বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যের দরকার নেই। নেই কোনো নির্দিষ্ট দিন। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ডাকার অলংঘনীয় দায় নেই গৃহকর্তার। গৃহকর্ত্রী বলাই ঠিক,—কারণ নিমন্ত্রণ করেন গৃহিণীরা।

এক টেবিলে বসে খাওয়ার রীতি স্বভাবতঃই নিমন্ত্রিতের সংখ্যাকে পরিমিত রাখে। বেশীর ভাগই ছ'জন; ঊর্ধ্বে বারো। তাও গৃহকর্তা ও গৃহিণীকে নিয়ে। বাড়ির গৃহিণী এখানে ভাঁড়ারে ময়দা মাখানো নিয়েই ব্যস্ত নন, ড্রয়িংরুমে অন্য আর পাঁচজন নিমন্ত্রিতার ন্যায় আলাপ-আলোচনায় তাঁরও যোগ আছে। তাঁর বসন হলুদের চিহ্নদ্বারা লাঞ্ছিত নয়, আনন উনানের আঁচে বিশীর্ণ নয় এবং দেহ পরিবেষণজনিত ক্লান্তিতে পীড়িত নয়। তিনিও সুবেশা, সুসজ্জিতা। তিনি সমুদয় অভ্যাগতদের আহারান্তে অপরাহ্ন বেলায় সর্বশেষে আহারে বসেন না, তাঁদের সঙ্গেই আহার্য গ্রহণ

করেন। গৃহকর্তা কোমরে গামছা জড়িয়ে জলের জাগ্ বা নুনের হাঁড়ি হাতে ছুটাছুটি না করেও অতিথিদের আদর আপ্যায়নের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাঁদের সঙ্গে বসেই আহার করেন।

খাওয়াটাই ইংরেজী ডিনারের মূল কথা নয়। সেটা বন্ধুজনের একত্র মিলনের একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তাই আহারের আয়োজন পরিমিত। সুক্ত থেকে অম্বল পর্যন্ত দশটা তরকারি এবং দরবেশ থেকে রাবড়ি পর্য্যন্ত পাঁচটা মিষ্টান্নের আয়োজন না হলে সেখানে কেউ ছি ছি করে না। পানতুয়া গেলার কৃতিত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা নেই ইংরেজী ডিনারে। আমাদের আধুনিক সমাজের ইঙ্গ-বঙ্গদের ত্রুটি অন্বেষণে যাঁদের কখনও ক্লান্তি নেই, এই একটি ব্যাপারে অন্ততঃ তাঁরা যেন আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকেন।

আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা মজলিসী ধরণের লোক। আসর জমাবার দক্ষতা আছে তাঁর। এককালে শিকারে সখ ছিল। বিহারের জঙ্গলে সম্বর শিকারের গল্প করলেন, আসামের অরণ্যে নেকড়ে।

শুধু গল্প নয়, তাসের ম্যাজিক জানেন অনেক রকম। চোখ বুঁজে প্যাকেটের মধ্য থেকে চিড়িতনের গোলাম বের করে দিয়ে বিস্মিত করলেন সবাইকে, হরতনের নওলাকে হাত ঘুরিয়ে নিমেষের মধ্যে বানিয়ে দিলেন গোলাম এবং এক মহিলার শাড়ীর ভাঁজ থেকে ইস্কাবনের সাহেব বের করে তাঁর কাছে কপট তাড়না এবং আর সবার কাছে উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ লাভ করলেন। গল্প, গুজব ও হাস্য পরিহাসের মাঝে মাঝে শীতল পানীয় এবং ককটেল গ্লাসে টোম্যাটোর রস পরিবেষণ করল বেয়ারা।

আহারের ব্যবস্থা পাশের কক্ষে। বুফে ডিনার। একটা টেবিলের উপরে বিভিন্ন পাত্রে সাজানো সমুদয় আহার্য। রোস্ট, স্যালাড, চপ, আবার তার সঙ্গেই পরোটা, বিরিয়ানী, পটলের দোলমা। পুডিং, আছে, রসগোল্লাও আছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইঙ্গ-বঙ্গের ছাপ থাকে আমাদের অশনে, বসনে, চিন্তায় ও কর্মে।

হাতে দশগাছা জলতরঙ্গ চুড়ির সঙ্গেই আমাদের মেয়েরা পরেন রিস্টওয়াচ; কোঁচানো ধুতির উপরেই ছেলেরা পরেন ডবল কাফের সার্ট!

সাইডবোর্ডে স্তরে স্তরে একদিকে সাজানো আছে প্লেট, অন্য দিকে চামচে, কাঁটা এবং ছুরি। সবাই প্লেট নিয়ে স্বহস্তে নিজ নিজ অভিরুচি মতো আহার্য তুলে নেন। ছেলেরা বেশীর ভাগ টেবিলের চার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খান। মেয়েরা কেউ বা বসেন চেয়ারে, কেউ বা ছেলেদের অনুসরণে দাঁড়িয়েই। গৃহকর্ত্রী খেতে খেতেই তদারক করেন অতিথিদের। বলেন, "এ কী ভাই মিলি, তুমি কিছু খাচ্ছ না যে? মিস্টার সেন, আর একটা চপ্‌ নিন। মিসেস দেশাই, রোষ্ট নিয়েছেন তো?"

মিসেস সাহার নাম শোনা ছিল ইতিপূর্বে, চাক্ষুষ পরিচয় ঘটল এই ভোজসভায়। অতিশয় ক্ষীণাঙ্গী, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট ফর্সা। কিন্তু পাউডার-আধিক্যের দ্বারা গণ্ডের স্বাভাবিক বর্ণকে এমন ভাবে ঢেকে রেখেছেন যে, কাগজের মত সাদা মুখ দেখে মনে হয় বুঝি বা কঠিন কোনো অসুখের পর ভাওয়ালী বা মদনপল্লী স্যানিটোরিয়াম থেকে সদ্য উঠে এসেছেন! পরিধানে সাদা ধবধবে শিফনের অতি মহার্ঘ শাড়ী; প্রায় কাঁচের মতো স্বচ্ছ। তার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর ঈষৎ হাল্কা রংএর অন্তর্বাস। শাড়ীতে পাড় থাকাটা আজকাল যথেষ্ট মডার্ন নয়। ঘটি-হাতা ব্লাউজের মধ্য থেকে লম্বমান বিশীর্ণ দু'টি বাহু। 'ভি' আকৃতি সম্মুখভাগে মর্মান্তিকরূপে উদ্‌ঘাটিত গ্রীবার দুই পার্শ্ববর্তী উদ্ধত দু'টি কণ্ঠা! গলায় মুক্তার একটি মালা। কানে সর্ষপাকৃতি ক্ষুদ্র মুক্তা গেঁথে গেঁথে একজোড়া দুল, প্রায় কাঁধ অবধি ঝোলানো। বাম হাতের দীর্ঘ সরু অনামিকায় তারই সঙ্গে ম্যাচ-করা মুক্তাবসানো মস্ত একটি আংটি। সবুজ, নীল, মেরুন, ভায়োলেট প্রভৃতি বিভিন্ন রংয়ের শাড়ী পরিহিতাদের মধ্যে

মহিলা আপন বেশভূষায় সম্পূর্ণ বিশিষ্টা। যেন শীতের দিনে বর্ণাঢ্য মশুর্মী ফুলের বাগানে রজনীগন্ধার উদ্ধত বৃন্তটি।

মহিলা টেবিল স্পুনের আধ চামচে বিরিয়ানী নিয়েছিলেন, তাই যেন শেষ করতে পারেন না! হোস্টেস্ একটু রোস্ট তুলে দিতে যাচ্ছিলেন তাঁর প্লেটে। "পারবো না ভাই, পারবো না, দিয়ো না, প্লীজ" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। অনেক সাধ্য সাধনায় একটা চপ নিলেন এবং ম্যানিকিউর করা দুই আঙ্গুল দিয়ে অতি সন্তর্পণে তার সিকি ভাগ ভেঙে খেলেন। কেবলই বলেন, "ভয়ানক পেট ভরে গেছে।"

একটা ঝালের চচ্চড়ি ছিল টেবিলে, তাই একটু নিলেন মিসেস সাহা। এটাই চল্তি। মিস্টার সাহা বাধা দিয়ে বললেন, "খেয়ো না, এত ঝাল খেলে অসুখ করে মরবে।" এতেও নতুনত্ব নেই। স্বামীরা লঙ্কা খেতে বারণ করেন এবং স্ত্রীরা তা অগ্রাহ্য করে বেশী করে লঙ্কা খান, এইটে প্রমাণ করাই হলো আধুনিকাদের আহার সম্পর্কিত আধুনিকতম ফ্যাশান।

ভোজনপর্বের শেষে মহিলাদের প্রতি অনুরোধ হলো গানের। কেউ গাইলেন। কেউ "অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি" বলে এড়িয়ে গেলেন। গৃহকর্ত্রী মোটামুটি রকম গাইতে পারেন এবং তাঁকে অনেক সাধ্য সাধনা না করলেও চলে। একটি গুজরাটি মহিলা তাঁর স্বদেশীয় সঙ্গীত শোনালেন। তার মধ্যে একটি ভক্ত কবি নরসিংহ মেহতার রচনা। তাঁর রচিত "বৈষ্ণব জনতো তেনে কঁহি" বলে একটি গান এককালে গান্ধীজির প্রিয়রূপে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

মিসেস সাহার সদাশয়তা আছে। অনেক রাত্রিতে ডিনার পার্টি ভাঙলো। নিজ মোটরে পৌছে দিতে চাইলেন আমাকে আমার আবাসে। মিস্টার সাহাকে বললেন, "বীরেন, মিনিসাহেবকে নামিয়ে দিতে হবে কুইনসওয়েতে।"

অতি-আধুনিকারা স্বামীকে নাম ধরেই ডাকেন। ওটা ইংরেজীর নকল। আমি সনাতনী নই। স্বামীর নাম করতে নেই, এ-অনুশাসনের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু ইংরেজী জন, আর্থার, সিরিলের কায়দায় আমাদের স্ত্রীরাও আমাদের সুধীর, বিকাশ বা উপেন বলে ডাকতে সুরু করলে পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠারও কোন কারণ দেখি না।

মানুষের নামের যদি কেবলমাত্র সনাক্তকরণ ছাড়া আর কোন প্রয়োজন না থাকতো, তবে নামের বদলে সংখ্যা ব্যবহারের দ্বারাই তা অনায়াসে চলতে পারতো। তা হলে মেয়ের জন্ম মাত্রেই মেয়ের মা তার নামনির্বাচন নিয়ে ভাবনায় পড়তেন না, নিত্য নতুন নামকরণের অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি আসতো না।

জড়বস্তুর পক্ষে নাম একটা অভিধামাত্র। গোলাপকে ঘেঁটু আখ্যা দিলে তার গন্ধের তারতম্য ঘটে না, একথা সেক্সপীয়রের মতো অন্য পাঁচজনেও জানে ; যদিও একথা ঠিক যে, কাব্যের সীমানা থেকে শুধু ঐ নামের জন্যই তার চির-নির্বাসনের সম্ভাবনা ঘটে।

কিন্তু মানুষের পরিচয় তো কেবল কোনো বিশেষ একটি সত্তার দ্বারা নয়। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তার বিভিন্ন রূপ। তাকে প্রকাশ করার জন্য তার বিভিন্ন নাম। আপিসে কেরানীবাবুর কাছে যিনি মিস্টার মুখার্জী, পাড়ায় বন্ধুজনের কাছে তিনি বিনোদ বাবু, বাল্যের সহপাঠীদের কাছে বিন্দে, বাড়িতে মায়ের কাছে খোকন্ এবং কোনো বিশেষ একটি মাত্র লোকের কাছে তিনি 'ওগো,' কিম্বা 'শুনছো' নয়তো শুধু মাত্র 'এই'। সেগুলি তো কেবল নাম নয়,—সেগুলি নির্দেশ। সংজ্ঞা নয়, সঙ্কেত। সেই বিশেষ ব্যক্তিটির কাছে সেগুলি বিশেষ অর্থ বহন করে, বিশেষ কানের ভিতরে বিশেষ সুর। এবং অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন, এই ছোট্ট দুটি অক্ষরের সঙ্কেতের দ্বারাই যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে!

তেরো

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধ হয় এমন কতগুলি দুর্বল মুহূর্ত আসে যখন সে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় দ্বারা বেশী চালিত হয়। সে মুহূর্তগুলি অতর্কিতে দমকা হাওয়ার মতো এসে অতিসাবধানী লোকদের স্থৈর্যের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তখন সংযমী যোগী পুরুষেরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন, হিসেবী মহাজনেরা গড়মিল করেন জমা-খরচের খাতায় এবং স্বভাবতঃ চাপা প্রকৃতির স্থিতধী ব্যক্তিরা বিচলিতচিত্তে মনের কথা ব্যক্ত করেন অন্য লোকের কাছে। এমনি এক দুর্বল মুহূর্তে আধারকারের পূর্ব-ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হলো একান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে। ক্লান্ত সমাহিত নয়ন এবং নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের অন্তরালবর্তী রহস্য শোনা গেল তাঁরই নিজ বর্ণনায়।

অপরাহ্ণ বেলায় ঈশান কোণে মেঘ দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টি প্রত্যাশা করেছিলাম গ্রীষ্মপীড়িত হতভাগ্যের দল! বৃষ্টি এল না, এল আঁধি। ধূলির ঝড়। না দেখলে কল্পনা করা শক্ত এর রূপ। বাংলাদেশে কোন কালে দেখা যায় না এ জিনিষ। আকাশ-ভুবন আঁধার করে প্রবল বেগে কোথা থেকে আসে এত বিপুল ধূলিরাশি তা ধারণাতীত! মেঘের চাইতে ঘন তার আচ্ছাদন সূর্যকে আবৃত করে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বালতে হয় দিনের বেলায়। দোর জানালা নিশ্ছিদ্ররূপে বন্ধ করলেও কিছু ধূলা প্রবেশ করে নাকে, মুখে, চোখে, এমন কি বন্ধ বাক্স পেটরার মধ্যস্থিত জামা-কাপড়ে। বৃষ্টির ফোঁটা মাত্র নেই ; শুধু শুষ্ক ধূলির ঝড়। কিন্তু এই আঁধির ফলেই উত্তাপ হ্রাস পায় অভাবনীয়ভাবে, ধরণী হয় শীতল। উত্তর ভারতের এক বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এই আঁধি।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসেছি দুজনে মুখোমুখি। শোঁ-শোঁ শব্দে বাইরে

বইছে আঁধির ঝড়ো হাওয়া, আলোড়িত হচ্ছে ধূলির পাহাড়। ধীরে ধীরে অনুচ্চ কণ্ঠে বিবৃত করলেন আধারকার আপন জীবন ইতিহাস।

আধারকারের কুলগত পেশা যুদ্ধ। তার পূর্বপুরুষেরা লড়েছে মুঘলের সঙ্গে, লড়েছে যশোবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে। তার প্রপিতামহ বিষ্ণুদত্ত পেশোয়া বাজিরাওয়ের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। আসাইর যুদ্ধে পেশোয়ার দক্ষিণ পার্শ্বে থেকে শত্রু নিপাত করেছেন অমিতবিক্রমে। নিহত হয়েছেন বুকে গুলির আঘাতে। আধারকার বালক বয়সে দেখেছেন তাঁর রুধিরাক্ত লৌহবর্ম, পরিবারের সযত্নে রক্ষিত গৌরবময় উত্তরাধিকার। বীর্যের রক্ত আছে তাঁর ধমনীতে।

পরিবারে বিত্ত ছিল প্রচুর, বীর্য ছিল বিখ্যাত, কিন্তু বিদ্যা ছিল না আধুনিক। আধারকার পিতার একমাত্র সন্তান, শিক্ষা লাভ করেন পুণার ইংরেজী স্কুলে। এলফিনস্টোন কলেজ থেকে পাশ করে গেলেন ম্যাঞ্চেস্টারে। বয়ন-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ হয়ে যখন ফিরলেন স্বদেশে, য়ুরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবে ক্ষান্ত হয়েছে। বম্বেতে স্থাপন করলেন এক কাপড়ের কল, অসুরের মতো খাটতে লাগলেন তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে।

বছর পাঁচেক পরের কথা। এক সন্ধ্যায় এক বন্ধুর আগমন সম্ভাবনায় এসেছেন দাদড় স্টেশনে। বন্ধু এলেন না। ফিরে আসছেন এমন সময় কানে এল এক নারীকণ্ঠ। সে তো কণ্ঠ নয়, সে সুর। ভাষা বুঝলেন না, পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী, সঙ্গে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। সামনে সুটকেশ, হোলড্অল, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি মালপত্র। উভয়ের মুখে উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট। বম্বেতে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব চলেছে সাঙ্ঘাতিক। স্টেশনের ভিতরে কুলির অভাব, বাইরে যানবাহনের। সন্ধ্যার পরে ঘরের বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়।

আধারকার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি বম্বেতে এই প্রথম এলেন ?"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, আমার এক আত্মীয় থাকেন এখানে। তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিলাম স্টেশনে হাজির থাকতে। আসেন নি দেখছি। বোধ হয় টেলিগ্রাম পান নি।"

"পেলেও আসা কঠিন। সহরে দাঙ্গা বেধেছে, খুন-খারাপি চলছে বেপরোয়া। আপনারা কোথায় উঠবেন ?"

"তাই তো ভাবছি। কাছাকাছি কোন হোটেলের সন্ধান দিতে পারেন ?"

"তা পারি। কিন্তু জায়গা পাবেন না সেখানে। বেশীর ভাগ হোটেলের চাকর, বেয়ারা, রাঁধুনী পালিয়েছে প্রাণের ভয়ে ; সেখানে বাসিন্দা যারা আছে, তাদেরই অন্নজলের অভাব, নতুন লোক নেয় না আর।"

"তবে তো বড়ই মুস্কিল" বলে ভদ্রলোক সঙ্গিনীর দিকে তাকালেন। ভয়ার্ত ভাব সঞ্চারিত হলো তরুণীর মুখমণ্ডলে। স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে চেষ্টা করে ফল হলো না। সব আগেভাগেই দখল হয়ে আছে দূরগামী যাত্রীতে। পরম অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন মহিলা তাঁর স্বামীর দিকে।

আধারকার প্রস্তাব করলেন, "যদি আপত্তি না থাকে, চলুন আমার ফ্ল্যাটে। কাল প্রাতে খোঁজ করা যাবে আপনাদের আত্মীয়ের। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।"

ভদ্রলোক তাকালেন স্ত্রীর পানে। তিনি একটু সঙ্কুচিত হয়ে ইংরেজীতে বললেন স্বামীকে, যদিও উক্তির লক্ষ্য যে আধারকার তাতে সন্দেহ রইল না। "রাত্রিবেলা হঠাৎ বিনা খবরে আমরা গিয়ে উঠলে ওঁর স্ত্রীকে তো খুব বিব্রত করা হবে।"

আবার সেই সুর। বোধ করি, এ সুর ছিল ভীমসিংহপত্নী পদ্মিনীর, যা দিয়ে তিনি সমস্ত রাজপুত যুবককে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন

যুদ্ধে প্রাণ দিতে, হয় তো ছিল হেলেন অব ট্রয়ের, যাঁর জন্য সহস্র রণতরী ভেসেছিল সাগরে।

আধারকার বললেন, "এক রাত্রির জন্য নিরুপায় অতিথিদের গৃহে আতিথ্য দিলে স্ত্রীকে বিব্রত করা হয় কিনা জানি না, হয় তো হয়। কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত হোন। আমার স্ত্রী মোটেই বিব্রত হবেন না, কারণ আমার স্ত্রী নেই।"

"স্ত্রী নেই? ওঃ, তা হলে—"বলতে বলতে থেমে গেলেন মহিলা।

আধারকার বললেন, "তা হলে কী?"

"আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা কোন রকম করে রাতটা প্ল্যাটফরমেই কাটিয়ে দেবো।"

"ও, ব্যাচিলরের বাড়িতে অতিথি হওয়াটা সামাজিকতায় বাধে বুঝি? মনে ছিল না। বেশ, প্ল্যাটফরমেই থাকবেন। ভয় নেই। গোয়ানিজ কুলীগুলি দেখছিনে বটে এখন, তবে আছে কাছাকাছিই। জড়োয়া গয়না আছে গায়ে, সুটকেশগুলির ভিতরেই বা না কোন শ' কয়েক টাকার জিনিষপত্র হবে। আশা করি, তাদের আসতে বিলম্ব হবে না। কাল মৃতদেহ সনাক্ত করার দরকার হলে খবর দেবেন। আচ্ছা, চলি, গুড্ নাইট" বলে দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হলেন আধারকার। স্বরে তাঁর অপমানিতের ক্ষোভ এবং উষ্মা।

কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই আবার দেখা গেল আধারকারকে ফিরে আসতে। বললেন, "দেখুন, একটা উপায় মাথায় এল। আমার ফ্ল্যাটেই চলুন। আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আমি কাছাকাছি আমার কেরানীর বাড়িতে গিয়ে বরং শোব। তা হলে বাড়ির দোষ থাকবে না ব্যাচিলরত্বের। ভিতর থেকে আগল এঁটে দেবেন ভালো করে, আর যাই হোক, প্ল্যাটফরমের চাইতে আশা করি সেটা নিরাপদ হবে!"

গোয়ানিজ কুলীর নামে মহিলাটির মনে তখন যথেষ্ট ভয় ধরেছে।

স্বামীটিরও প্ল্যাটফরমে রাত কাটানোর কল্পনাটা খুব প্রীতিপ্রদ মনে হচ্ছিল না। সুতরাং আধারকারের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কুলীর সন্ধান পাওয়া গেল না। আধারকার নিজে দু'হাতে অবলীলাক্রমে দুটো বড় সুটকেশ বয়ে নিয়ে গেলেন গাড়িতে।

ছোট ফ্ল্যাট। একটি মাত্র শয়নকক্ষ। আহারাদির পর আধারকার প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মহিলাটি পরিষ্কার ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকী, কোথায় যাচ্ছেন ?"

"আমার কেরানীর বাড়িতে।"

"কেরানীর বাড়িতে ? সে কত দূর ?"

"মাইল পাঁচেক হবে।"

"এত রাত্রিতে সেখানে ? কোন বিশেষ দরকার আছে কি ?"

"দরকার রাত্রিটা কাটানো।"

"কেন এ বাড়ি দোষ করল কী ?"

আধারকার এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, "দোষ নয়, মানে আপনাদের অসুবিধা— ।"

বাধা দিয়ে মহিলাটি অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, "আমাদের অসুবিধার কথা আপনাকে কে বলেছে ? আর যদি হয়ই অসুবিধা ; আপনি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন, আর আপনাকেই এই দাঙ্গা হাঙ্গামার রাত্রিতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে নিজেদের সুবিধা করব, আমাদের এতখানি জংলী ঠাওরালেন কেন ? তার চেয়ে বলুন, আমরা আবার সেই স্টেশনের প্ল্যাটফরমেই ফিরে যাচ্ছি।"

স্বামী ভদ্রলোকও জোর দিয়ে বললেন, "ক্ষেপেছেন মশাই, এই রাত্রিতে যাবেন বাইরে !"

কিন্তু আর এক দফা তর্ক দেখা দিল শয়ন-ব্যবস্থা নিয়ে। একটি মাত্র খাট। আধারকার চান সেটি দখল করবেন অতিথিরা, তিনি ড্রয়িংরুমের মেজেতে ঘুমাবেন। অতিথিদের ইচ্ছা ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু এবারেও মহিলাই জয়লাভ করলেন।

নিজের ঘরে শুতে যেতে যেতে আধারকার বললেন, "এ ভারি অন্যায় হলো। মনে মনে নিশ্চয় ভাবছেন, লোকটা সুবিধের নয়। নিজে আরাম করে খাটে নিদ্রা দিচ্ছে, আর অতিথিদের ভূমিশয্যা।"

মৃদু হাস্যে মহিলাটি বললেন, "লোকটি আপনি সুবিধের নন, তা টের পেয়েছি। অত্যন্ত ঝগড়াটে।"

"ঝগড়াটে? বাঃ, ঝগড়া করলেম কখন?"

"করলেন না? সেই যে প্ল্যাটফরমে কী বলেছি, তা নিয়ে কত কথা শোনালেন, কেরানীর বাড়ি শুতে যেতে চাইলেন! যান, আর কথা নয়। রাত হয়েছে। এখন, লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে পড়ুন গে।"

পরদিন আধারকারের ঘুম ভাঙল অনেক বিলম্বে, ভৃত্যের ডাকাডাকিতে। ঘড়িতে তখন প্রায় আটটা। তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করে এসে দেখেন টেবিলে প্রাতরাশ প্রস্তুত। সুপ্রভাত জ্ঞাপন করতে মহিলাটি হেসে বললেন, "কাল রাত্তিরে শুতে যাবার সময় বললেন, আমাদের ভূমিশয্যার কথা মনে করে খাটে শুয়ে ভালো ঘুম হবে না আপনার। কনশেন্স্ খোঁচা মারবে! এই আপনার ঘুম না হওয়ার নমুনা? কনশেন্সের খোঁচা নিয়েই বেলা আটটা?"

আধারকার লজ্জিত হয়ে বললেন, "দেখতে পাচ্ছি, আমি ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা কনশেন্সটাও ঘুমে বেহুঁশ হয়েছিল।"

উচ্চ হাস্য উত্থিত হলো টেবিলে। স্বামী ও গৃহস্বামীর অট্টহাস্যের সঙ্গে মিশলো নারীকণ্ঠের কলধ্বনি। মহিলা বললেন, "তাই নাকের ডাকে পাশের ঘরে চোখের ছু'পাতা এক করা দায়!"

"নাকের ডাক? নাক ডাকে না কি আমার? কই, আমি তো টের পাইনি কখনও।"

"ঐতো মজা। যখন টের পাওয়ার অবস্থা হয়, নাক তখন আর ডাকে না।" আবার সেই পুরুষ ও নারীকণ্ঠের সম্মিলিত হাস্যোচ্ছ্বাস।

সন্ধ্যার কিছু আগে অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তাঁদের

আত্মীয়ের গৃহে। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন তাঁদের ওখানে একদিন অবকাশমতো আসবার। আধারকার প্রস্তুত ছিলেন তখনই তাঁদের সঙ্গে গাড়িতে চেপে বসতে, শুধু সেটা নিতান্ত অশোভন হবে বলেই মনকে নিরস্ত করলেন।

তাঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আধারকার এসে বসলেন বারান্দায়। পড়তে চেষ্টা করলেন অন্যদিনের মতো ইংরাজী উপন্যাস। এগুতে পারলেন না বেশী দূর। মন বারবার উন্মনা হতে লাগল। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা বিলিয়র্ড খেলতে যান জিমখানা ক্লাবে। সেদিন কিছুমাত্র উৎসাহ রইল না তাঁর।

সুনন্দা ব্যানার্জীরা দিন দশেক রইলেন বম্বেতে। প্রত্যহ অপরাহ্নে আপিস থেকে আধারকার সোজা এসে হাজির হতেন ব্যানার্জীদের আত্মীয়গৃহে। দল বেঁধে যেতেন কোনদিন সিনেমায়, কোনদিন এপোলো বন্দর, কোনদিন মহালক্ষ্মী মন্দির, কোনদিন বা এলিফেণ্টার কেভস্।

বম্বে ত্যাগ করে স্বস্থান লাহোরে প্রত্যাবর্তন করলেন ব্যানার্জী দম্পতি। আধারকার রইলেন বম্বেতে; ফিরে গেলেন আপন রূপহীন, রসহীন, বৈচিত্র্যবর্জিত জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মধ্যে। প্রভাত আর আনে না কোন প্রত্যাশা, সন্ধ্যায় ঘটে না কোন প্রার্থিত সান্নিধ্য, রাত্রিতে থাকে না পরবর্তী দিবসের প্রগাঢ় প্রতীক্ষা। সুনন্দাবিরহিত নগরীর কুত্রাপি নেই কোন আকর্ষণ, কোনখানে নেই মধু, নেই স্বাদ।

কিন্তু বিচ্ছেদ মানেই নয় ছেদ, যতির অর্থ নয় ইতি। অদর্শনের সান্ত্বনা থাকে পত্রে, বাচনের বিকল্প লেখনে। লাহোরে পৌঁছে সুনন্দা ব্যানার্জী লিখলেন,—

"মিস্টার আধারকার, নিরুপায় নিশীথে অপরিচিত আগন্তুকদের আপনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, আতিথ্য দিয়েছিলেন অকৃপণ ঔদার্যে, —সে জন্য ধন্যবাদ। আপনার সৌজন্য স্মরণে রাখব চিরকাল।"

জবাবে আধারকার লিখলেন,—

"এক রাত্রির অবস্থিতি দ্বারা ব্যাচিলরের গুহাকে আপনি দিয়েছেন সম্মান, গৃহস্বামীকে দিয়েছেন দুর্জয় মর্যাদা। কৃতজ্ঞতা তো জানাবো আমি। সৌজন্যের প্রকাশ কর্মে, সেটা সহজসাধ্য; প্রীতির প্রবেশ মর্মে, তা দুরূহলভ্য। মিসেস ব্যানার্জী, আপনার অনুগ্রহ বচনাতীত।"

ত্বরিত উত্তর এলো পত্রের। "দেখছি, আপনার কুশলতা শুধু আতিথেয়তায় নয়, পত্ররচনায়ও বটে। মশাই, আপনি তো চারুদত্ত নন, আপনি চারুবাক্।"

এমনি করে চিঠি লেখালেখির খেলা চলে দুই পক্ষে। সে-চিঠিতে উক্তের চাইতে অনুক্তের ভাগ বেশী; শব্দের চাইতে অর্থের।

অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটল আধারকারের জীবনে। তাঁর জীবনের প্রারম্ভ থেকে এ পর্যন্ত কেটেছে পুঁথিপত্র আর কারখানা নিয়ে। পরীক্ষায় পাশ আর অর্থার্জন! সোনার কাঠি ছোঁয়ানো রূপকথার রাজকন্যার মতো অকস্মাৎ জেগে উঠে আজ নিজকে তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন। অধীত বিদ্যার শুষ্ক পাণ্ডিত্যের মধ্যে নয়, নয় অর্জিত অর্থের বিরাট সঞ্চয়স্থলীতে। আবিষ্কার করলেন আপন উপবাসী হৃদয়ের অন্তহীন শূন্যতার মধ্যে।

কর্মহীন সন্ধ্যায় নির্জন গৃহকোণে ভাবতে ভালো লাগে যে-স্মৃতি, সে সুনন্দার। সুষুপ্ত রাত্রির তিমিরস্তব্ধ প্রহরে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে মনে পড়ে যে-প্রসঙ্গ, সে সুনন্দার। প্রভাতে প্রথম জাগরণে স্মরণে আসে যে-মুখ, সে সুনন্দার। এ কী বিস্ময়, এ কী রহস্য, আনন্দ-বেদনা-বিজড়িত এ কী অনির্বচনীয় অনুভূতি!

নিজের হৃদয় যতই উদ্ঘাটিত হয় নিজের কাছে, লজ্জিত হন, অনুতপ্ত হন আধারকার। শাসন করেন দুর্বল চিত্ত। পাছে কোনদিন কোন অসাবধান মুহূর্তে সুনন্দার কাছে ইঙ্গিতমাত্রে প্রকাশ পায় মনোভাব, সে দুর্ভাবনায় শঙ্কিত হন।

"তোমাকে আর একটু জিন অ্যাণ্ড লাইম দেবে মিনি সাহেব?" হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন আধারকার।

গ্লাসে তখনও অর্ধেকের বেশী ছিল। তুলে ধরে বললেম, "অলমতি বিস্তরেণ"।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আধারকার বললেন, "আমাকে নিশ্চয় একটা ভিলেন মনে হচ্ছে!"

জবাবে বললেম, "আপনি আপনার কাহিনী শেষ করুন। আমি রিপোর্টার, রিফর্মার নই। মিনি-সংহিতায় বিধান নেই কোন প্রায়শ্চিত্তের।"

স্বল্প বিরতির পর খণ্ডিত আখ্যানের অনুবৃত্তি সুরু করলেন আধারকার।

মাস তিনেক পরে মিলসংক্রান্ত প্রয়োজনে আসতে হলো লাহোরে। বলা বাহুল্য, অতিথি হলেন ব্যানার্জী-ভবনে।

অতিথিকে ভারতীয়েরা সেবা করেন পুণ্যকামনায়, তাকে যত্ন করেন ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু অতিথিকে আপন করা যায় একমাত্র হৃদ্যতার জোরে। সে হৃদ্যতার প্রাচুর্য ছিল সুনন্দার। লাহোরে আধারকারের কাজ সমাপ্ত হলো তিন দিনে। কিন্তু বিনা-কাজের গ্রন্থিমোচন করে একাধিকবার ব্যর্থ রিজার্ভ ও ক্যান্‌সেলেশনের পরে বম্বেতে প্রত্যাবৃত্ত হলেন তিন-চারে বার দিন কাটিয়ে। কিন্তু যে আধারকার বম্বে থেকে গিয়েছিলেন এবং যে আধারকার লাহোর থেকে ফিরলেন তাঁরা এক ব্যক্তি নন। ইতিমধ্যে তাঁর জন্মান্তর ঘটেছে।

লাহোরে সেদিন অপরাহ্ণ বেলায় গিয়েছিলেন এক পরিচিত বন্ধু সন্দর্শনে, সহর থেকে অনেকটা দূরে। আশা ছিল সন্ধ্যার পূর্বেই প্রত্যাবর্তনের। কিন্তু এড়াতে পারলেন না অনুরোধ, নৈশ-ভোজন সমাধা করতে হলো সেখানে। ফেরার পথে নামল বৃষ্টি। তার উপরে বাহন হলো বিকল। টাঙ্গার অশ্ব

ও আসন দুই-ই প্রাচীনত্বে সমান, চলতে চলতে একটি চাকা স্থানচ্যুত হয়ে ভেঙে পড়ল অকস্মাৎ; আরোহী সবলে নিক্ষিপ্ত হলেন কর্দমাক্ত পথে। উত্তর ভারতে শীতকালের বর্ষণ বর্ষার প্রবল বারিপাতকেও হার মানায়। জনহীন পথপ্রান্তে সিক্ত হলেন দীর্ঘকাল, ব্যানার্জী গৃহে যখন এসে পৌঁছলেন রাত তখন প্রায় চারটা।

মৃদু আঘাত করতেই দ্বার খুলে দিলেন যিনি তিনি স্বয়ং সুনন্দা।

"কোথায় ছিলে এই ঝড় বাদলার মধ্যে? সারা রাত ধরে আমরা উৎকণ্ঠায় মরছি" বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হলো বাষ্পে। ঝর ঝর ধারায় অবাধ্য অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দুই গণ্ডে। আত্মসম্বরণ করতে ত্বরিত অন্তর্হিতা হলেন পাশের কক্ষে।

দোর খোলার শব্দে গৃহস্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। তিনি দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আমরা ভেবে ভেবে মরি, বিদেশে বিভূঁই এই দুর্যোগের রাত্রিতে কোথায় কী হয়। সুনন্দা তো এক মিনিটের জন্য বিছানায় যায় নি, কেবল বারান্দায় এদিক ওদিক করছে। একটু শব্দ হলেই টাঙ্গা এলো ভেবে ছুটে নীচে যায়।"

আধারকার বাহনবিভ্রাট বিবৃত করলেন সবিস্তারে, ক্ষমা প্রার্থনা করলেন নিজ বিলম্বের জন্য। সুনন্দা বেরিয়ে এসে গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন, "ভিজে জামা-কাপড়গুলি ছাড়া হবে কি? টাঙ্গার চাকা ক'ইঞ্চি ভেঙেছে, ঘোড়া ক'গজ লাফিয়েছে সে সব কাহিনী কাল সকালে ব্যাখ্যান করলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। মাথা থেকে তো এখনও জল ঝরছে, নিউমোনিয়া না বাধালে বোধ হয় বাহাদুরীটা পুরা হবে না।"

বোঝা গেল, শাসনকর্ত্রী নেপথ্যেই ছিলেন, টাঙ্গা দুর্ঘটনার বিবরণ শুনেছেন স্বকর্ণে।

আপন শয়নকক্ষে এসে নিদ্রার চেষ্টা করলেন আধারকার।

ঘুম এল না। মুদ্রিত কমল-কলিকার পার্শ্বে গুঞ্জনরত লুব্ধ ভ্রমরের মত মন বারংবার কেবলই প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল একটি কক্ষপথে। অতিথির বিলম্বে গৃহস্বামিনীর এই ব্যাকুল উৎকণ্ঠা, বিনিদ্র নয়নে এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা, সকোপন অভিমান জড়িত এই শাসন এবং সর্বোপরি এই অশ্রুধারা প্লাবিত আননের মধ্য দিয়ে নারী-হৃদয়ের কোন গোপন রহস্য আজ অকস্মাৎ উদ্ঘাটিত হলো? শয্যা ত্যাগ করে, আধারকার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

রাত্রি বিগতপ্রায়। তারকাহীন নভস্তল মেঘমালায় আবৃত এবং দিগন্তবর্তী তরুশ্রেণী বিলীয়মান রজনীর ঈষৎ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আসন্ন প্রভাতের প্রতীক্ষারতা ধরণীর এই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধারকার যেন আজ তাঁর জীবন-দেবতার প্রসন্ন কল্যাণ করস্পর্শ প্রথম অনুভব করলেন আপন ললাটে। দুই হাত যুক্ত করে প্রণাম করলেন কাকে তা তিনি নিজেই জানেন না। শুধু "আমি ধন্য, আমি ধন্য" এই বাক্য তার উদ্বেল অন্তরের অন্তস্তল থেকে উত্থিত একটি মহান সঙ্গীতের মতো দ্যুলোক, ভূলোক পরিব্যাপ্ত করে বিশ্বলোকেব বীণাতন্ত্রীতে অনাহত রাগিণীতে ধ্বনিত হতে লাগল।

আধারকার থাকেন বম্বেতে, সুনন্দা থাকেন লাহোরে। প্রায় এক হাজার মাইলের ব্যবধান! কিন্তু যোজন গণনা করে নয় দূরত্ব, নৈকট্যের নির্দেশ হৃদয়ে। হৃদয়ের সেই অদৃশ্য যোগাযোগের নিবিড় বন্ধনে বহুদূরবর্তী এই দুটি নরনারী পরস্পরের কাছে রইলেন নিকটতম। সুনন্দা একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল, "চারু, ইংরেজীতে কথা কয়ে সুখ নেই। আমি যদি মারাঠী বলতে পারতেম তবে বেশ হতো।"

আধারকার বললেন, "পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসতে পারে, মহম্মদ যাবে পর্বতসকাশে।"

অসাধ্য সাধন করলেন আধারকার। ছ' মাসে শিখলেন বাংলা, বৎসরকালে কণ্ঠস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য, দু' বছরে সাঙ্গ করলেন পঠনযোগ্য সমুদয় বাংলা সাহিত্য।

আধারকারের পরিজনেরা পরলোকগত। এক বোন স্বামী-পুত্র নিয়ে আছে কঙ্কনে। তার সঙ্গেও যোগাযোগ সুদৃঢ় নয়। এতকাল বৃন্তহীন পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিলেন আধারকার। কর্মে, চিন্তায়, জীবনযাপনে ছিলেন স্বাধীন। এবার সে স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনের ধারা হলো বদল। বম্বে থেকে চিঠি লেখেন লাহোরে, "নন্দা, বাড়ির বেয়ারাটা ছুটি চাইছে তিন মাসের আগাম মাইনে সমেত, দেব কি-না লিখো।" কিম্বা লেখেন, "মালাবার হিল্সে ওয়ালকেশ্বর রোডে একটা বাড়ি বিক্রি হচ্ছে সস্তায়। কিনব কি?"

নিজের ভালো-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত ভাবনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন এক দূরবর্তিনী নিঃসম্পর্কীয়া অভিভাবিকার হস্তে, কিছুদিন মাত্র আগেও যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা। আত্মসমর্পণে যে এত সুখ, নির্ভরতায় যে এত প্রশান্তি, তা কখনও জানেননি এর আগে।

চৌদ্দ

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আধারকারকে যেতে হলো বিলাতে। লাহোর থেকে সপত্নীক ব্যানার্জী সাহেব এসে জাহাজে তুলে দিয়ে গেলেন ব্যালার্ড পিয়ারে।

দিন গেল, মাস বিগত, বৎসরও অতীত প্রায়। বিরহ বেদনায় পীড়িত যে-দিনগুলি অন্তহীন মনে হয় প্রথমে, তারও শেষ আছে। আধারকার প্রত্যাবৃত্ত হলেন স্বদেশে। অবিলম্বে গেলেন লাহোরে।

অগ্রাণের প্রভাত। ট্রেনের কামরায় ঘুম ভেঙে গিয়ে আধারকার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, নির্মেঘ আকাশে সূর্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত। শাল তরুর কোমল শ্যামল পল্লবদল শিশিরার্দ্র বাতাসে মৃদু কম্পিত। টেলিগ্রাফের তারের উপরে উপবিষ্ট এক জোড়া খঞ্জনী পক্ষিশাবক ঘন ঘন পুচ্ছ-আন্দোলনরত। অকারণ খুসীতে ভরে উঠল তাঁর মন।

অপরাহ্নে লাহোর স্টেশনে পৌঁছে দেখলেন একা ব্যানার্জী সাহেব এসেছেন অভ্যর্থনায়। বাড়ি পৌঁছে বেয়ারার হাতে পেলেন চিঠি। অতি পরিচিত অক্ষরে অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। এক বিশেষ জরুরী কাজে একটি মহিলাকে নিয়ে যেতে হলো এক জায়গায়; চায়ের ব্যবস্থা রইল বেয়ারার কাছে, আধারকার যেন চা খেয়ে নেন। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবেন তিনি।

শুধু চায়ের ব্যবস্থা নয়, স্নানের ঘরে বাথ-টাবে ধরা আছে জল, টাওয়েল-র্যাকে ধবধবে তোয়ালে, সোপ-কেশে আছে আনকোরা সুগন্ধ সাবান। শয়নকক্ষে পরিপাটি বিছানা, খাটের পাশে ছোট টিপাইর উপরে সুদৃশ্য টেবিল-ল্যাম্প ও খানকয়েক সদ্য প্রকাশিত ইংরেজী উপন্যাস, মায় জয়পুরী ফুলদানীতে সযত্নে বিন্যস্ত আধারকারের প্রিয় শ্বেত করবীগুচ্ছ।

অতিথির পরিচর্যায়, আদরে, আপ্যায়নে লেশমাত্র ত্রুটি নেই কোনখানে। তবুও কেন যে অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে আধারকার নিজেই তা জানেন না। প্রবাসে কতদিন নিদ্রাহীন রজনীতে কল্পনা করেছেন আজকের এই মুহূর্তটি। কী বলবেন, তা নিয়ে মনে মনে পর্যালোচনা করেছেন কত বার। দীর্ঘ বারো মাসের পুঞ্জীভূত কথার মধ্যে কোন্‌টি বলবেন সর্বাগ্রে, কোন্‌ প্রশ্ন, কোন্‌ সংবাদ দেবেন ও নেবেন, তাই নিয়ে অবসরক্ষণে ভেবেছেন কতদিন। দেখা হলে যে-কথা ভেবে রেখেছিলেন, তা হয়তো যেতো তলিয়ে, অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য রইত চাপা, হয়তো শুধু উচ্চারণ করতেন ছোট্ট একটি সাধারণ প্রশ্ন, "কেমন আছ?" তার কিছুই হলো না। খচ্‌ খচ্‌ করতে লাগল আধারকারের মন। হেমন্তের দিনটি যে অপরিসীম আনন্দের অর্ঘ নিয়ে সুরু হয়েছিল, সে আনন্দ নিয়ে যেন শেষ হলো না।

আধারকার সাত দিন রইলেন লাহোরে। সুনন্দার সেবা, যত্নে ও আতিথেয়তায় রন্ধ্র মাত্র রইল না কোথাও; কিন্তু তবুও যেন আগেকার সে-সুর বাজল না আধারকারের মর্মে, রস সঞ্চারিত হলো না অতিথির মনে। কোথায় রইল ফাঁক, কোন্‌খানে ঘটল ব্যত্যয়, তার নিশানা পাওয়া গেল না। শুধু ব্যথা জেগে রইল হৃদয়ের নিভৃততম গহ্বরে। যে-অভাব চোখে দেখা যায় না অথচ বুকে বোঝা যায়, তার বেদনা দূর করার উপায় কী?

সুনন্দা কি বদলেছে? কই বোঝা তো যায় না। কিন্তু মন বলে, কী যেন নেই। অতি সামান্য বিষয় কাঁটার মতো বিঁধে আধারকারের মনে, কুশের অঙ্কুর সম ক্ষুদ্র, দৃষ্টিঅগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম। কিন্তু সেগুলি এমনই অকিঞ্চিৎকর যে, তা নিয়ে নালিশ করতে গেলে হাস্যকর ঠেকে। আধারকারের কোটের যে একটা বোতাম ছিঁড়েছে তা যদি একদিন সুনন্দার চোখে না পড়ে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। একটা মস্ত সংসারের সমস্ত পরিচালনভার

যে-গৃহিণীর মাথায়, তার পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয়। এটা যুক্তির কথা। কিন্তু মানুষের মন তো ইন্‌ডাক্‌টিভ্ লজিকের পাঠ্য কেতাব নয়। সে ফস্ করে পাল্টা প্রশ্ন করে বসে, কই, আগে তো এমন চোখে না পড়তে দেখিনি কখনও!

লাহোর ত্যাগের দিন আধারকার বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেলেন ব্যানার্জীদের এক বন্ধু পরিবারে। সে গৃহে আধারকারের সম্প্রীতি জন্মেছিল সুনন্দাদেরই বন্ধুতাসূত্রে। গৃহস্বামীর কন্যা বললেন, "আজই যাচ্ছেন কী রকম? এলেন তো এই সে-দিন।"

"সে-দিন আর কোথায়, দিন দশেক তো প্রায় হলো!"

"দশ দিন? কক্ষনো নয়, আমি বলছি অনেক কম। সাত দিন। আচ্ছা বাজী রাখুন। আপনি এসেছেন গেল শনিবারে, সেই যেদিন সুনন্দাদি, রাণু মাসিমা, আমরা সব সিনেমায় গেলাম।"

"সিনেমায় গেলে?"

"হ্যাঁ, রাণু মাসিমা এসেছিলেন এখানে বেড়াতে। তিনি সেণ্ট এনড্রুজে সুনন্দাদির সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তেন তো? তিনি ধরলেন সিনেমায় যেতে হবে। টিকিট কেনা হয়ে গেছে পর খবর এল আপনি আসছেন ঐ দিনই বিকালে। সুনন্দাদি তাই যেতে চাইছিলেন না, কিন্তু রাণু মাসিমা চলে যাবেন পরদিন সকালে। কাজেই শেষটায় অনেক বলাতে রাজী হলেন। কই, আপনি শুনছেন না তো, কী ভাবছেন? বাজী হেরেছেন কিন্তু।"

আধারকারের মুখে চোখে যে বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট হলো, তাকে বাজীতে হেরে যাওয়ার শোক মাত্র বলে গণ্য করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি ফিরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না একটুকুও।

আধারকারকে ট্রেনে তুলে দিতে সে-দিন সন্ধ্যায় যথারীতি স্টেশনে এসেছিলেন স্বামী-স্ত্রী। ওয়েটিং-রুমের একান্তে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে আজ সারাদিন এত আনমনা দেখাচ্ছে কেন? কী এত ভাবছ বলো তো?"

আধারকার চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে বললেন, "কই, না তো!"

ট্রেন ছাড়ল। প্ল্যাটফরমের উপর রুমাল সঞ্চালনরত বান্ধব-বান্ধবীদের মূর্তি দূর হতে দূরতর, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলোটা ধীরে ধীরে চলে গেল দৃষ্টির অন্তরালে।

বার্থে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে আধারকার ভাবতে লাগলেন সেই একই কথা যা আজ সকাল বেলা থেকে কিছুতে তাড়াতে পারছেন না মন থেকে। কেমন করে সম্ভব হলো তার আগমন দিনে সুনন্দার পক্ষে বান্ধবীসঙ্গ? প্রিয়-সান্নিধ্যের চাইতে বড় হলো সিনেমা? টিকিট কেনা ছিল? কত লক্ষ টাকা দাম সে টিকিটের? কথা দেওয়া হয়েছিল বান্ধবীকে? কথা কি ভাঙা যায় না কিছুর জন্যই? কই আধারকার তো কল্পনা করতে পারে না এমন কোন এন্‌গেজমেণ্ট যা সুনন্দার অভ্যর্থনার জন্য সে অগ্রাহ্য না করতে পারে অবহেলে। এক বছর পরে সুনন্দা যদি আসত লণ্ডন থেকে পুণায়, কিম্বা ধরো লাহোর থেকে বম্বেতে, আধারকার কি তার নিকটতম বন্ধুর অনুরোধ এড়াত না, মাথাধরা বা শরীর খারাপের কল্পিত অজুহাত দেখিয়ে? প্রিয়জনের জন্যে মিথ্যাভাষণেও কি নেই সুখ?

বেশ তো, না হয় ধরে নেওয়া গেল, বাল্যবন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সম্ভব ছিল না। আগেভাগে টিকিট কেনা ছিল, যেতে হয়েছে সিনেমায়। এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু তার জন্য গোপনীয়তার আবশ্যক ছিল না, ছিল না জরুরী কাজের দোহাই দিয়ে এই মিথ্যা ছলনার!

বম্বেতে মন বসল না কাজে, তিষ্ঠিতে পারলেন না দীর্ঘকাল। আবার গেলেন লাহোরে। কিন্তু খণ্ডিত লয় খেয়াল গানের মতো কিছুতে পৌঁছতে পারলেন না আর সমে, বেতালা বেসুরো বাজতে

লাগল জীবনের রাগিণী। ভারকেন্দ্র থেকে যেন চ্যুত হয়ে পড়ল এই দু'টি অনাত্মীয় নরনারীর তিন বছর ধরে দিনে দিনে গড়া হৃদয়সৌধ। ফিরে গেলেন বম্বেতে। এমনি করে বারংবার যাওয়া আসা করলেন বম্বে থেকে লাহোর, লাহোর থেকে বম্বে।

অবশেষে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতরূপে এই অস্থির ব্যাকুলতার একদিন ঘটল অবসান।

আধারকার আবার লাহোরে। সংশয় বেদনায় বিচলিত। অথচ প্রকাশ্য অভিযোগের নেই উপলক্ষ্য। কারণ সুনন্দার প্রতি আধারকারের দাবি তো অধিকারের নয়, অনুভূতির। দাবি হৃদয়ের। সে-হৃদয় যুক্তি-জ্ঞানহীন শিশুর মতো বারংবার কেবলই অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দুপুরে আপিসের কাজে বের হওয়ার কালে সে-দিন সুনন্দা কাছে এসে দাঁড়ালেন না; আগের মতো এগিয়ে দিলেন না রুমাল, ফাউণ্টেন পেন, হাতের ঘড়ি ও পকেটের পার্স। ঝি বললে, "মেমসাব রসুইমে আলু বানাতে হী।" পরদিন সন্ধ্যাবেলা আপিস প্রত্যাগত আধারকার কাউকে প্রতীক্ষমানা দেখলেন না দোতলার বারান্দায়। শুনলেন, ধোবার কাপড় মিলিয়ে নিতে ব্যস্ত আছেন মেমসাব।

রাগ করার কিছুই নেই এতে। কিন্তু অভিমানাহত মন বলে, কই ইতিপূর্বে কখনও তো ঘটেনি এমন দুর্ঘটনা। আধারকারের নির্গমন-আগমনক্ষণে কোন দিন দেখা যায়নি রন্ধনশালায় আলু কর্তনের প্রতি গৃহিণীর এই অপ্রতিরোধনীয় অনুরাগ এবং রজকের অপহরণপ্রবণতাব বিরুদ্ধে মেম সাহেবের এই সতর্ক পাহারা।

ব্যানার্জীর আপিসে কাজের চাপ ছিল বেশী, প্রত্যাগমনে ঘটবে বিলম্ব। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আধারকার প্রস্তাব করলেন, "চল বেড়িয়ে আসি সাহাদারা গার্ডেনস্।"

সুনন্দা বললেন, 'না।'

তবু পীড়াপীড়ি করলেন আধারকার।

"কেন, চল না।"

"না, একা তোমার সঙ্গে দেখলে লোকে কী বলবে?"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন আধারকার। সুদূর অতীতের কথা নয়, স্মৃতিকে করতে হবে না মন্থন। এই তো বিলাতে যাওয়ার আগেও কতদিন দু'জনে গেছেন সালিমার বাগে, সিনেমায়, জুহুর সমুদ্রতীরে, বম্বের রেস্তোরাঁয়। সুনন্দা নিজে উদ্যোগ করে নিয়ে গেছেন অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দর্শনে, ব্যানার্জী রয়েছেন লাহোরে। সে-দিন কোথায় ছিল লোকেরা, কোথায় ছিল তাদের মন্তব্যের প্রতি সহচারিণীর এই অসাধারণ শ্রদ্ধা?

লোকে দেখলে কী বলবে? হায়রে, এ প্রশ্ন যে আধারকারই আগে তুলেছিলেন একদিন অতীতে!

বম্বেতে সেবার শীতের শেষে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হলো মহামারীরূপে। আধারকারের গায়ে বেরুল গুটিকা। কী জানি কেমন করে খবর পৌঁছল লাহোরে। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সুনন্দা এসে হাজির হলেন আধারকারের ফ্ল্যাটে। আধারকার বিস্মিত হয়ে বললেন, "তুমি?"

শঙ্কা, স্নেহ ও অভিমানজড়িত কণ্ঠের উত্তর শুনলেন, "তা ছাড়া আর দুর্ভোগ আছে কার? ক'দিন হয়েছে?"

"দিন চারেক, কিন্তু আমি তো খবর দেব না বলেই ঠিক করেছিলেম।"

"তা করবে না? তা না হলে আর আমাকে ভাবিয়ে মারবে কেমন করে?"

আধারকার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, "এই ছোঁয়াচে রোগ, এর মধ্যে আসবার মন্ত্রণা দিল কে তোমাকে?"

ক্রুদ্ধ হয়ে সুনন্দা বললেন, "দেখ, আমাকে রাগিও না বলছি। মন্ত্রণা দিয়েছে কে? মন্ত্রণা দিয়েছে আমার অদৃষ্ট।" খানিক থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, "চাকর বাকর হতভাগাগুলো গেছে কোন চুলোয়?"

"বাবুর্চি আর বেয়ারাটা পালিয়েছে ভয়ে; মাদ্রাজী ড্রাইভারটা আছে। সে-ই ওষুধপত্র আনে।"

"খাসা ব্যবস্থা, শুধু খবরের কাগজে 'শোক-সংবাদ' ছাপাটুকুই যা বাকী," বলে সুনন্দা গেলেন ড্রাইভারের সন্ধানে। তাকে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে মালপত্র আনলেন উপরে। ঘরদোর করলেন আবর্জনা-মুক্ত, ধূলিহীন। বিছানা ঝেড়ে মুছে নতুন করে রচনা করলেন, স্বহস্তে রোগীর পথ্য তৈরী করলেন পরম নৈপুণ্যে।

আধারকার জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যানার্জীকে দেখছি না যে?"

"তিনি তো আসেন নি।"

"আসেন নি? তুমি এসেছ কার সঙ্গে?"

"কারো সঙ্গে নয়, একা!"

"মানে?"

"মানে আবার কী? উনি গেছেন টুরে; ফিরতে দেরী হবে দিন পাঁচেক। তোমার লাহোরের এজেন্টের সঙ্গে পরশু সকালে দেখা হয়েছিল এক দোকানে। তার কাছে খবর পেলেম অসুখের। বাড়িতে তালা এঁটে দুপুর সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরেছি ছুটতে ছুটতে। ওকে টেলীগ্রাম করে' দিয়ে এসেছি এখানে রওনা হতে।"

বিস্ময়ে অভিভূত আধারকার বললেন, "ব্যানার্জী রাগ করবে না?"

"হয় তো করবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আধারকার বললেন, "লোকেই বা বলবে কী? ব্যানার্জী ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না কেন? একা চলে এলে কেন?"

বিরক্ত কণ্ঠে সুনন্দা বললেন, "এসেছি আমার ইচ্ছে। লোকের ভাবনা ভেবে তোমার মাথা গরম করতে হবে না। তুমি চুপ করে ঘুমাও তো এখন।" বলে শয্যাপার্শ্বের চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের মধ্যে আলো বেশী ছিল না, রোগীর দৃষ্টি থেকে আড়াল

করার জন্য টেবিল ল্যাম্পের একটা দিক খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা। পশ্চাৎ থেকে সুনন্দার মুখের অংশমাত্র দেখা যায়। কিছুক্ষণ পূর্বে সুনন্দা স্নান করেছেন। আর্দ্র কুন্তলদল পিঠের উপরে অযত্নবিস্রস্ত পরিধানে দেশী তাঁতের একটি শাড়ী। বামস্কন্ধের উপর তার অবিন্যস্ত বঙ্কিম অঞ্চলপ্রান্তের অন্তরাল থেকে নিটোল সুকুমার বাহুটি অনবদ্য ভঙ্গীতে লম্বিত। উন্নত গ্রীবার নিকটে সূক্ষ্ম একটি স্বর্ণহারের একটু-খানিমাত্র আভাস। মৃদু দীপালোকিত কক্ষে বাতায়নবর্তিনীর এই মৌন মূর্তিটি রোগশয্যাশায়িত আধারকারের কাছে একটি পরম নিশ্চিত আশ্বাসের মতো প্রতীয়মান হলো। দু'জনের কেউ আর কোন কথা বললেন না। শুধু উভয়ের উদ্বেল হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ সমাজ-সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও কলঙ্কের উর্ধ্বে দেবমন্দিরের পবিত্র হোমাগ্নির মতো যেন জ্বলতে লাগল একটি অনির্বাণ অদৃশ্য শিখায়।

পরের দিন ব্যানার্জীও এসে পৌঁছলেন। আধারকারের বসন্ত আসল নয়, চিকেন। কিন্তু রোগমুক্ত হতেই সুনন্দা জোর করে নিয়ে গেলেন লাহোরে এবং পক্ষাধিককাল পূর্বে আধারকার ছাড়া পেলেন না বম্বেতে ফিরতে।

সে-দিনের সুনন্দার দৃষ্টি ছিল না বাইরে, গ্রাহ্য ছিল না লোকাপবাদের, মন ছিল ইতরজনের নিন্দা-প্রশংসার অতীত। সংসারে ছিল না আসক্তি, গৃহকর্মে ছিল না আকর্ষণ, স্বামীতে 'ছিল না মনোযোগ। কতদিন আধারকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সুনন্দাকে, "এই, ব্যানার্জী এসেছে আপিস থেকে। যাও, দেখগে তার কী চাই।"

সুনন্দা বলেছেন, "আচ্ছা, হয়েছে, হয়েছে। তোমাকে আর গিন্নীপনা শেখাতে হবে না। তুমি ব্যানার্জীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কি না?"

সেদিনের সুনন্দা নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ। সে শুধু প্রণয়িনী। সে তো সুনন্দা ব্যানার্জী নয়, সে সুনন্দা প্রিয়দর্শিনী।

সুনন্দারা হিন্দু নয়, খ্রীস্টান। বহু বর্ষ পূর্বে তাঁর পিতামহ এসে স্থায়ী আবাস গড়েছিলেন লাহোরে। সুনন্দা মানুষ হয়েছেন য়ুরোপীয় আবেষ্টনে, বিদ্যাভ্যাস করেছেন শ্বেতাঙ্গদের কন্‌ভেণ্টে, পরিণীতা হয়েছেন খ্রীস্টীয় প্রথায়। তাঁদের সমাজে তরুণীরা অবগুণ্ঠনবতী নয়, স্ত্রীরা নন্ অন্তঃপুরিকা। পুরুষের অবাধ সাহচর্য সেখানে নিন্দনীয় নয়, বাইরে বন্ধুসঙ্গ নয় নিষিদ্ধ। এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহেও সামাজিক অন্তরায় ছিল না সুনন্দার।

কঠোর তিক্ত সত্য হৃদয়ঙ্গম করলেন আধারকার। মোহভঙ্গ হয়েছে সুনন্দার। সুধার পাত্র হয়েছে রিক্ত। মন্থন করলে আর উঠবে না মধু, উঠবে হলাহল।

সে-দিন অপরাহ্ণে বাড়ি ফিরবার উৎসাহ ছিল না আধারকারের। টেলীফোন করে জানিয়ে দিলেন ফিরতে বিলম্ব হবে তাঁর। বহুক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে অবশেষে উপস্থিত হলেন ম্যালের পাশে সিনেমা হলের সম্মুখে। কী যেন কী খেয়াল হলো, টিকিট কিনে প্রবেশ করলেন ভিতরে। ছবি তখন সুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরে টিকিটচেকার বসিয়ে দিয়ে গেল একটি আসনে। নির্বাক চিত্র। কিড়্‌ড়ড় শব্দে প্রজেক্টারের আওয়াজ শোনা যায় স্পষ্ট। দর্শকদের আলাপ, আলোচনা, মন্তব্যেরও বাধা থাকে না।

হঠাৎ নিজের নাম কানে আসতে চমকে উঠলেন আধারকার। সামনের সারিতে কারা বসেছেন অন্ধকারে তা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু তাঁরা যে পুরুষ নন সে বিষয়েও সন্দেহ থাকে না। আধারকার উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন।

"যাই বলিস ভাই, এড্‌মায়ারার-এর সংখ্যা আর বাড়াসনে। আধারকার বেচারা তো মরেছে তোর হাতে, আর কেন?"—চাপা কণ্ঠে বললেন একটি মহিলা।

উত্তর হলো, "হ্যাঁ, বলেছে এসে তোর কানে কানে!"

আধারকার আসন থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন মাটিতে। ভুল

করার সাধ্য কি ও কণ্ঠ? এ কণ্ঠ যে তাঁর জীবন ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে। প্রথম শুনেছিলেন তিন বছর পূর্বে দাদড় স্টেশনে।

সখীদ্বয়ের পরিহাস পরিবাদ চলতে লাগল মৃদুকণ্ঠে, কিন্তু আধারকারের শ্রুতির অগোচর রইল না এক বর্ণও!

প্রশ্নকর্ত্রী বললেন, "কানে কানে বলতে হবে কেন? আমাদের কি চোখ নেই? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আর কোন আশা নেই লোকটার।"

"ইস্, বড় যে দরদ দেখছি। ওগো করুণাময়ি, তবে তুমিই ত্রাণ কর না কেন তাকে!"

"বলিস কী! সইতে পারবি? তা হলে যে তোর মুখচন্দ্রমা অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে যাবে, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে আমার!"

"একটুও না। দিব্যি করে বলছি, আমার তাতে কী আসে যায়? বরং ছাড়া পেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।" কণ্ঠ পরিহাসতরল নয় এবার।

প্রশ্নকর্ত্রী নিজেও বোধ হয় কিছুটা বিস্মিত হলেন। কৌতুক পরিহার করে বললেন, "কেন ভাই, আধারকারকে তো বেশ ভালো লোক মনে হয়। ভদ্র, শিক্ষিত, বিত্তশালী অথচ স্নব নয়,—বেশ সিম্পল্।"

"সিম্পল্ নয়, সিম্পল্টন্। কাণ্ডজ্ঞান নেই এতটুকু। সব জিনিষই অত্যন্ত সীরিয়সলি নেবে। কবে কখন fun করে কী বলেছি, কী করেছি, সেটাকেই মনে করে বসেছে, আমি ওর প্রেমে পড়েছি। ইডিয়ট! সত্যি বলছি তোকে, আমি ক্রমশঃ যেন টায়ার্ড হয়ে উঠেছি।"

হঠাৎ ছবির স্পুল ছিঁড়ে গিয়ে ছবি হলো বন্ধ, আলো জ্বলে উঠল প্রেক্ষাগৃহের। সে আলোতে দেখা গেল আলাপ-আলোচনরতা বান্ধবীদ্বয়কে অদূরবর্তী আসনে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জোড়া-দেওয়া ফিল্ম সুরু হলো। আবার অডিটরিয়মের বাতি দেওয়া হলো নিভিয়ে।

ছবির আখ্যান-ভাগ এক তরুণী শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রণয়কাহিনী। তাঁর দরিদ্র প্রেমাস্পদ চলে যাচ্ছেন দূরদেশে জীবিকার প্রয়োজনে। সন্ধ্যাবেলায় পরিজনের অলক্ষিতে উদ্যান-বাটিকায় তরুণী সাক্ষাৎ করলেন তাঁর সঙ্গে। পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে সঙ্গিনী হতে চাইলেন দয়িতের। কিন্তু তরুণ চায় না ধনিকন্যাকে দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আনতে। বলে, আমাকে ভুলে যেও। মনে করো,—'এক সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতরূপে দু'জনে দেখা হয়েছিল এক পান্থশালায়, রাত্রি প্রভাতে যাত্রীরা চলে গেছে নিজ নিজ বিভিন্ন পথে। আর দেখা হবে না কোন দিন।'

শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রেম গভীর। ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন তাঁর কাছে তুচ্ছ, দৃষ্টি নেই মণি-মুক্তা বিলাসোপকরণ বা ঐশ্বর্যসম্ভারে। যাঁকে প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তাঁর বিহনে প্রাণ ধারণ করবেন কেমন করে? হে নিষ্ঠুর, যদি ফেলে চলে যাও এই অভাগিনীকে, পায়ে দলে যাও কোমল হৃদয়, তবে জেনো মৃত্যু তার অবধারিত!

দর্শকগণ রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় সম্মুখের পর্দায় নিবদ্ধদৃষ্টি।

প্রণয়ব্যাকুলা রমণীর এই আত্মসমর্পণে কী করবে তরুণ নায়ক? প্রচুর পাউডার-প্রলিপ্ত নায়িকার গণ্ডদেশে ঠাস্ করে একটি সবল চপেটাঘাত করলে আধারকার সব চেয়ে খুসী হতেন। কিন্তু তা কেমন করে হবে? ছবিতে দেখা গেল, আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ, মাধবীলতায় ফুটেছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, পরস্পরের চঞ্চুতাড়না দ্বারা প্রণয় নিবেদন করছে তরুশাখে উপবিষ্ট ক্রৌঞ্চমিথুন এবং উদ্যানের সরোবরে দু'টি প্রস্ফুটিত পদ্ম হঠাৎ দু'দিক থেকে ভাসতে ভাসতে এসে মিলল একসঙ্গে। ভারতীয় সিনেমার এই চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকে ছায়াচিত্রের নায়কের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক, তাই করল তরুণ।

বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করল নায়িকাকে। দু'জনে হাত ধরা-ধরি করে রওনা হলো। কোথায়, তা অবশ্য একমাত্র চিত্র-পরিচালকই জানেন! বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দের সঘন করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল প্রেক্ষাগার। শেষ হলো নাটিকার।

সকলের অলক্ষিতে আধারকার নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রেক্ষাগৃহ থেকে। মনে মনে বললেন, একমাত্র নাটকের মধ্যেই সম্ভব এই অবাস্তব কাহিনীর অবতারণা। সেখানে তো সত্যিকার জীবন্ত মানুষের মুখোমুখি হওয়ার দায় নেই। তাই তার কল্পিত নায়িকার পক্ষে কোন অসম্ভব আচরণ বা কোন অস্বাভাবিক উক্তি করতেই বাধা নেই। তা শুনে আমরা বিমুগ্ধ দর্শকরাও 'এঙ্কোর', 'এঙ্কোর' বলে চেঁচিয়ে উঠি। আমরা তো জানিনে শ্রেষ্ঠিকন্যার যে-প্রণয়-নিবেদন দৃশ্য দেখে আমাদের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে তার ষোল আনাই স্টেজ-ম্যানেজেড্, ষোল আনাই ফান্। সমস্তটাই ফাঁকি। হতভাগ্য নায়ক সে-তথ্য জানতে পারে দু'দিন পরে। কিন্তু সে তো দর্শকের দেখার উপায় নেই। রচিত কাব্যের বহির্দেশে, অভিনীত নাটকের নেপথ্যে সে থাকে চিরকাল লোকলোচনের অন্তরালে। নাটকের যেখানে শেষ, জীবনের সেখানেই তো সুরু!

সেই রাত্রেই লাহোর পরিত্যাগ করলেন আধারকার।

রাত বারোটায় ট্রেন। খোয়া-বাঁধানো পথের উপর দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে টাঙ্গা। এপথে কতবার আসা-যাওয়া করেছেন আধারকার। কিন্তু আজকের এ-যাত্রা তো অন্য আর বারের মতো নয়। তখন যাওয়ার মধ্যে থাকতো অদূরবর্তী পুনরাগমনের আশ্বাস, থাকতো পুনর্মিলনের সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা। আজ সে-আশা রইল না একটুকুও। যে-গৃহদ্বার এই মাত্র অতিক্রম করলেন, যে-পথ রাখলেন পশ্চাতে, কদাচ তা পুনশ্চারণের আর সম্ভাবনা রইল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায়, বোমার আঘাতে আহতের একটি বাহু

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে অদূরে, অথচ তার সংজ্ঞা হয়নি বিলুপ্ত। এ্যাম্বুলেন্স-বাহিত সে-আহত স্পষ্ট দেখতে পায়, ফেলে রেখে যাচ্ছে সে আপন খণ্ডিত বাহু। আধারকার অনুভব করলেন সেই অনুভূতি। আপন চোখে দেখতে পেলেন পশ্চাতে ফেলে রেখে যাচ্ছেন,—বাহু নয়, শতধাবিদীর্ণ হৃদয়।

ফান্‌ই বটে! স্নেহ নয়, প্রীতি নয়, শোভা-গন্ধ-বিমণ্ডিত হৃদয়াবেগের বাষ্প মাত্র নয়, শুধু কৌতুক। নিষ্ফল প্রণয়েরও উপশম আছে করুণায়; কিন্তু উপহসিতের নেই সান্ত্বনা। তার লজ্জা দুঃসহ।

এই হৃদয়হীন নারীর ছলনাকেই সত্য কল্পনা করে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন আধারকার,—একথা ভেবে নিজের উপরেই গভীর বিতৃষ্ণা জন্মাল তাঁর। কতদিন প্রমত্ত প্রগল্‌ভতায় হৃদয়ের কত দুর্বলতা ব্যক্ত করেছেন তাঁর কাছে, কত স্বপ্ন গড়েছেন তাঁকে কেন্দ্র করে, সে-সব স্মরণ করে বারংবার নিজেকে ধিক্কার দিলেন আধারকার।

গভীর বেদনা ও অপরিসীম লজ্জা নিয়ে আধারকার ফিরে চললেন স্বস্থানে। অনন্ত আকাশে লক্ষ কোটি যোজন দূরের যে তারকাশ্রেণী অনিমেষ নয়নে এই বিপুলা ধরিত্রীর পানে তাকিয়ে আছে, তারা সাক্ষী রইল আর একটি সকরুণ কাহিনীর। যুগযুগান্ত ধরে এমন কত শত অশ্রুসজল বেদনাবিধুর নাট্য অভিনীত হয়েছে তাদের পলকহীন নয়নের অকম্পিত দৃষ্টির সম্মুখে। কত খেলা গেছে ভেঙে, কত ফুল ঝরেছে ধূলায়, কত বাঁশরী হয়েছে নীরব।

এই স্বল্পপরিসর জীবনের প্রায় সমুদয় অংশ আধারকার কাটিয়েছেন একা। এই তো সে-দিন পর্যন্ত চাকর বেয়ারা মাত্র সম্বল ফ্ল্যাটে আপনাকে নিয়ে আপনি ছিলেন মগ্ন। আজও আবার সেই নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করলেন। অথচ এ দুয়ের মধ্যে কী অপরিসীম প্রভেদ। আকাশ আজ নিঃশেষে শূন্য,

বাতাস আজ নিরর্থক, এই জনাকীর্ণ পৃথিবীর সমাজ ও সংসারের যাবতীয় কর্ম বিস্বাদ ও ক্লান্তিকর।

নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখলেন আধারকার। একটা বিরাট মরুভূমির মতো সর্বত্র ঊষর। কোনখানে নেই একটু ছায়া, একটু শ্যামলিমা, একটু আলোক আঁধার বিজড়িত স্নিগ্ধতার চিহ্ন লেশ।

আধারকার মূর্খই বটে। কাঁচকে ভেবেছিলেন হীরা, সদ্য টাঁকশাল থেকে নির্গত উজ্জ্বল তাম্রখণ্ডকে ভ্রম করেছিলেন গিনি বলে। গান্ধীজির একটি লেখা চোখে পড়ল একদিন, আধুনিকাদের সম্পর্কে। তারা নাকি প্রত্যেকেই নিজেকে ভাবে একটি জুলিয়েট, এক সঙ্গে আধ ডজন রোমিওর প্রণয়িনী। আধারকারের মনে হয়, এতদিনে যেন অর্থ পেলেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না একেবারে। আবার সংশয় জাগে চিত্তে। একাধিক রোমিওর জন্য কি দুর্যোগের রাত্রিতে উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র রজনী যাপন করা যায়? সম্ভব হয় তাদের অসুখের সংবাদে স্বামী সংসার ফেলে একাকী এক হাজার মাইল ছুটে যাওয়া!

বম্বেতে ফিরে মাস কয়েক বিপুল উদ্যমে চেষ্টা করলেন আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে কর্মের মধ্যে। মিলের কাজে খাটতে লাগলেন সকাল থেকে সন্ধ্যা। ভুলতে প্রয়াস করলেন বিগত তিন বৎসরের স্বল্পায়ু স্বপ্নলোক। করতে চাইলেন নতুন করে জীবনারম্ভ। কিন্তু মন তো শিশুদের আঁক কষার শ্লেট নয় যে, ইচ্ছা মতো পেন্সিলের আঁচড় মুছে নতুন করে সংখ্যাপাত করা যাবে। নিজের সঙ্গে দিনের পর দিন অবিরাম যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হলেন আধারকার। তারপর জলের দামে একদিন হঠাৎ মিল দিলেন বিক্রি করে। অন্তর্হিত হলেন বম্বে থেকে।

গেলেন মালয়া, রবারের বাগানে হলেন ম্যানেজার। ভালো লাগল না বেশী দিন। গেলেন সিলোনে এক কফি কোম্পানির কর্তারূপে,

টিকতে পারলেন না দু'বছর। বুয়েনস্ এয়ার্সে কাজ করলেন মদের কারখানায়; সেখানেও বিরক্তি ধরল। পরিব্রাজক হয়ে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করলেন দেশ দেশান্তর। নানকিং, ক্যানবারা, টরোণ্টো, ওয়াশিংটন, লাইপৎসিগ, ব্রাসেলস্। তবু ভুলিল না চিত্ত।

নিউ ক্যাসেলের এক ইংরেজ কোম্পানি থেকে এককালে নিজের মিলের জন্য আধারকার কিনেছিলেন কিছু সাজ-সরঞ্জাম। তাদের ভারতীয় শাখার ম্যানেজাররূপে অবশেষে আধারকার এলেন দিল্লীতে। এখানে আছেন আজ এগারো বছর। যে-মিল তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন কুড়ি বছর আগে, তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আজ কোটিপতি। সেখানে এক ডজন কর্মচারী আছে যারা এখন আধারকারের চাইতে বেশী মাইনে পায়।

বছরের পর বছর হয়েছে গত। জীবনের আজ অপরাহ্নবেলায় এসে পৌছেছেন আধারকার। দেহে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে বার্ধক্যের আক্রমণ-আভাস। হৃদয়াবেগের যে-তীব্রতা যৌবনের লক্ষণ, আজ তা স্তিমিততেজ।

যে-সুনন্দাকে আধারকার ভালোবেসেছিলেন, সে তো শুধু ঐ রক্ত মাংসের মানুষটি নয়। প্রেম আপন গভীরতায় নিজের মধ্যেই একটি মোহাবেশ রচনা করে। সেই মোহের দ্বারা যাকে ভালোবাসি তাকে আমরা নিজের মনে মনে মনোমত করে গঠন করি। যে-সৌন্দর্য তাঁর নেই, সে-সৌন্দর্য তাঁতে আরোপ করি। যে-গুণ তাঁর অভাব, সে-গুণ তাঁর কল্পনা করি। তাই কুরূপা নারীর জন্য রূপবান, বিত্তবান তরুণেরা যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে, অপর লোকেরা অবাক হয়ে ভাবে, "আছে কী ঐ মেয়েতে, কী দেখে ভুলল?" যা আছে সে তো ঐ মেয়েতে নয়,—যে ভুলেছে তার বিমুগ্ধ মনের সৃজনধর্মী কল্পনায়। আছে তার প্রণয়াঞ্জনলিপ্ত নয়নের দৃষ্টিতে। সে যে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছে তাহারে রচনা।

আধারকারের দৃষ্টি থেকে সে-অঞ্জন আজ বিলুপ্ত, মন থেকে সে-মোহাবেশ অপসৃত। একদিন জগতের সমস্ত কবিকুলের কল্পলোক থেকে আহৃত যে-সৌন্দর্য, যে-সুষমা, যে-বর্ণসম্ভার দ্বারা সুনন্দাকে তিনি রচনা করেছিলেন তিলে তিলে, আজ তার লেশমাত্র নেই। প্রবঞ্চিত আধারকারের কাছে সুনন্দা আজ একজন অতি সামান্য রমণী মাত্র। কোনখানে তার আর এতটুকু অনির্বচনীয়তা, এতটুকু বিশেষত্ব অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য মানুষের মন! আজও ক্ষতের মূল রয়েছে গভীরে যদিও চিহ্ন গেছে মিলিয়ে। অসাবধান মুহূর্তে ছোঁয়া লাগলে আজও কেন টন্ টন্ করে ব্যথায়? কেন নিঃশেষ হয় না স্মৃতি?

আধারকারের কাহিনী শেষ হলো। বাক্যহীন নিস্তব্ধতায় বসে রইলেম খানিকক্ষণ।

"হুজুর, টাঙ্গা ল্যানে পড়েগা?"

চমকে চেয়ে দেখি আধারকারের ভৃত্য। কখন আধারকার উঠে চলে গেছেন নিঃশব্দে, টের পাইনি একটুও। আপন জীবনের নিগূঢ় গোপন কাহিনী ব্যক্ত করেছেন আজ এক অতি অল্প দিনের পরিচিত অসমবয়সী বন্ধুর কাছে। যখন বলে' গেছেন, তখন অবগাহন করেছেন স্মৃতির ধারায়। কাহিনী সাঙ্গ হতেই সে-মোহাবেষ্টন ছিন্ন হয়েছে, নেমে এসেছেন বাস্তবের প্রত্যক্ষ ভূমিতে। সঙ্কোচ দেখা দিয়েছে সেই মুহূর্তে, যেই হয়েছে চোখাচোখি। তাই অদৃশ্য হয়েছেন নিঃশব্দে। সুতরাং বিদায় নেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হলেম। ভৃত্যকে টাঙ্গা আনতে করলেম বারণ। পদব্রজে নিষ্ক্রান্ত হলেম পথে।

শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে মেঘশূন্য আকাশে, তার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে দু'পাশের বাংলোগুলির বিস্তীর্ণ অঙ্গনে। পথ জনশূন্য, ধ্বনিবিরল। কাছাকাছি কোথায় যেন হাসনুহানার ঝাড়ে ফুটেছে

ফুল। তার তীব্র মদির সুবাসে বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, রজনী হয়েছে গন্ধবিহ্বল।

চলতে চলতে ভাবছিলেম আধারকারের কথা। কানে বাজতে লাগল সকরুণ স্বীকারোক্তি, "মিনি সাহেব, আমি ইডিয়টই বটে! পরিহাসকে মনে করেছি প্রেম; খেলাকে ভেবেছি সত্য। কিন্তু আমি তো একা নই। জগতে আমার মতো মূর্খেরাই তো জীবনকে করেছে বিচিত্র; সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত। যুগে যুগে এই নির্বোধ হতভাগ্যের দল ভুল করেছে, ভালোবেসেছে, তারপর সারা জীবন-ভোর কেঁদেছে। হৃদয় নিংড়ানো অশ্রুধারায় সংসারকে করেছে রসঘন, পৃথিবীকে করেছে কমনীয়। এদের ভুল, ত্রুটি, বুদ্ধিহীনতা নিয়ে কবি রচনা করেছেন কাব্য, সাধক বেঁধেছেন গান, শিল্পী অঙ্কন করেছেন চিত্র, ভাস্কর পাষাণখণ্ডে উৎকীর্ণ করেছেন অপূর্ব সুষমা। জগতে বুদ্ধিমানেরা করবে চাকরি, বিবাহ, ব্যাঙ্কে জমাবে টাকা, স্যাকরার দোকানে গড়াবে গয়না; স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, কন্যা নিয়ে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করবে স্বচ্ছন্দ সচ্ছলতায়। তবুও আমরা মেধাহীনের দল একথা কোন দিন মানবো না যে, সংসারে যে বঞ্চনা করল, হৃদয় নিয়ে করল ব্যঙ্গ, দুধ বলে দিলো পিটুলী,—তারই হলো জিত, আর ঠকল কেবল সে, যে উপহাসের পরিবর্তে দিলো প্রেম।"

অতি দুর্বল সান্ত্বনা। বুদ্ধি দিয়ে, রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে বলা সহজ—"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা।" কিন্তু জীবন তো রক্তমাংসের সম্পর্ক বিবর্জিত একটা তর্ক মাত্র নয়। শুধু কথা গেঁথে গেঁথে ছন্দ রচনা করা যায়, জীবন ধারণ করা যায় না।

আধারকার হচ্ছেন সেই শ্রেণীর পুরুষ, যাঁরা কিছুই হাতে রাখতে জানেন না। এঁদের কপালে দুঃখ অনিবার্য। পলিটিক্সের মতো মানুষের জীবনও হচ্ছে এ্যাডজাস্টমেণ্ট আর কমপ্রমাইজ। এ

দারুণ ইনফ্লেশনের বাজারেও সংসারে শুধু হৃদয়ের দাম খুব বেশী নয়।

সুনন্দার পক্ষে সম্ভব ছিল না আধারকারের গতিতে তাল রেখে চলা। সে নারী, প্রেম তার পক্ষে একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। আবিষ্কার নয়, যেমন পুরুষের কাছে। মেয়েরা স্বভাবতঃ সাবধানী, তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর বাঁধে। ছেলেরা স্বভাবতঃই বেপরোয়া, তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর ভাঙে। প্রেম মেয়েদের কাছে একটা প্রয়োজন, সেটা আটপৌরে শাড়ীর মতো নিতান্তই সাধারণ ; তাতে না আছে উল্লাস, না আছে বিস্ময়, না আছে উচ্ছলতা। ছেলেদের পক্ষে প্রেম জীবনের দুর্লভ বিলাস, গরীবের ঘরে বেনারসী শাড়ীর মতো ঐশ্বর্যময়, যে পায় সে অনেক দাম দিয়েই পায়। তাই প্রেমে পড়ে একমাত্র পুরুষেরাই করতে পারে দুরূহ ত্যাগ এবং দুঃসাধ্যসাধন।

আধারকার নিজেই একদিন বলেছিলেন, "মিনি সাহেব, জগতে যুগে যুগে কিং এডওয়ার্ডেরাই করেছে মিসেস সিম্পসনের জন্য রাজ্য বর্জন, প্রিন্সেস এলিজাবেথেরা করেনি কোন জন, স্মিথ, বা ম্যাকেঞ্জির জন্য সামান্যতম ত্যাগ। বিবাহিতা নারীকে ভালোবেসে সর্বদেশে সর্বকালে আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে একাধিক পুরুষ ; পরের স্বামীর প্রেমে পড়ে কোন দিন কোন নারী রয়নি চিরকুমারী।"

কোমলহৃদয় বলে আমার খ্যাতি নেই। কিন্তু আধারকারের জন্য সত্যিকার বেদনা বোধ করলেম হৃদয়ে। সুনন্দা ব্যানার্জী আজ কোথায় আছেন জানিনে। অনুমান করছি, এতদিনে তাঁর যৌবন হয়েছে গত, দেহ বিগতশ্রী, দৃষ্টি বিদ্যুদ্‌হীন এবং কপোলের রেখাগুলি প্রচুর প্রসাধনপ্রলেপের দ্বারাও আজ আর কোন মতেই গোপনসাধ্য নয়। কোন দিন, কোন অবকাশ মুহূর্তে বহু বর্ষ আগেকার এক মারাঠী ব্রাহ্মণের চরম নির্বুদ্ধিতার কথা স্মরণ করে ক্ষণেকের জন্যও তাঁর মন উন্মনা হয় কিনা, সে-কথা আজ

জানার উপায় নেই। অথচ তাঁরই জন্য আধারকার দিলেন চরম মূল্য। নিজেকে বঞ্চিত করলেন সাফল্য থেকে, খ্যাতি থেকে, ঐহিকের সর্ববিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে! সব চেয়ে বড় কথা, নিজকে বঞ্চিত করলেন সম্ভবপর উত্তরপুরুষ থেকে, বংশের ধারাকে করলেন বিলুপ্ত।

কোন দিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কুশল কামনা করে তুলসীমঞ্চে কেউ জ্বালবে না দীপ, কোন নারী সীমন্তে ধরবে না তাঁর কল্যাণ-কামনায় সিন্দূরচিহ্ন, প্রবাসে অদর্শন বেদনায় কোন চিত্ত হবে না উদাস উতল। রোগশয্যায় ললাটে ঘটবে না কারও উদ্বেগকাতর হস্তের সুখস্পর্শ, কোন কপোল থেকে গড়িয়ে পড়বে না নয়নের উদ্বেল অশ্রুবিন্দু। সংসার থেকে যেদিন হবেন অপসৃত, কোন পীড়িত হৃদয়ে বাজবে না এতটুকু ব্যথা, কোন মনে রইবে না ক্ষীণতম স্মৃতি।

প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা। কিন্তু প্রবঞ্চিতকে দেয় কী? তাকে দেয় দাহ। যে আগুন আলো দেয় না অথচ দহন করে, সেই দীপ্তিহীন অগ্নির নির্দয় দাহনে পলে পলে দগ্ধ হলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন হতভাগ্য চারুদত্ত আধারকার!